জোড়া পর্ব

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

বিক্রয়-কেন্দ্র : ২১১/১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

শাখা : পাটনা :
অশোক রাজপথ
পাটনা ৪

এলাহাবাদ :
৪৪, নেতাজী সুভাষচন্দ্র মার্গ
এলাহাবাদ-৩

কলিকাতা
১১ই এপ্রিল, ১৯৫৭

জানকীনাথ বসু এম, এ, কর্তৃক বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লি
লেন, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীসুরেশচন্দ্র
৯১/১বি, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মু

দুই

ধীরা এদিকে বড় হচ্ছে। পাড়ায় খেলতে বেরোয়। প্রায়ই খেলনা হোক, পুঁতুল হোক, অন্য কিছু হোক, হাতিয়ে ফেরে। মার নজর এড়ায় না। প্রথম প্রথম জিজ্ঞেস করতেন, "কোথায় পেলি রে?"

ধীরা বলতো, "ঐ একটা মেয়ের।"

মা খুশী হয়ে উপদেশ দিতেন, "নিয়ে বেরুসনি কখনও।" গল্পচ্ছলে স্বামীকে শোনাতেন, "ধীরা আমাদের বেশ টরটরে হয়েছে আজকাল। এটা ওটা নিয়ে আসে কুড়িয়ে।"

রাখাল মুখুজ্জে সগর্বে উত্তর দিতেন, "মেয়ে আমার মুখ রাখবে, গো।"

দশে পা দিতে না-দিতে ধীরা রীতিমত চালাক-চতুর হয়ে উঠলো। রংটা কালো। কিন্তু, নজরে পড়ার মত মেয়ে। টানা ভ্রূর নীচে উজ্জ্বল চোখ, মাথায় একরাশ ঘন কোঁকড়া চুল, টিকোলো নাক, নীচের ঠোঁট ধনুকের মত। কাউকে পরোয়া করতো না। খেলার সাথীরা কেউ তার সঙ্গে পেরে উঠতো না।

ধীরা ঝগড়া করতো, দল পাকাতো, একজনকে মারলে তিনজন তার পক্ষে দাঁড়াতো। তার মা সব খবর রাখতেন। বাবাও শুনতেন অল্পস্বল্প। তাঁদের কাছে ধীরার নামে নালিশ করতে গিয়ে পাল্টা গালাগাল খেত পাড়ার ছেলে-মেয়েরা।

রাখাল মুখুজ্জে ধীরাকে স্কুলে ভর্তি ক'রে দিলেন। সে-ও এক পর্ব। দিনকত হাঁটাহাঁটি। হেডমাষ্টারের কাছে সুপারিশের চিঠি জমা হল একখানার পর একখানা। রাখাল মুখুজ্জের দাবি, তাঁর মেয়েকে নিতে হবে ফ্রী ছাত্রী হিসেবে। মাইনে দিতে তাঁর কোনও

অসুবিধে নেই। কত লোককে কত রকমে সাহায্য ক'রে থাকেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি নিজে শিক্ষাব্রতী, দেশের জন্যে দশের জন্যে খাটেন, সেই হেতু তাঁরও তো একটা হক আছে। এত বড় যুক্তিতে স্কুলের হেডমাষ্টার, সেক্রেটারি, প্রেসিডেণ্ট—সবাই ঘায়েল হলেন। বিনে মাইনেয় ধীরা স্কুলের পড়া আরম্ভ করলো।

একটা মাস কাটতে না-কাটতে স্কুলে ধীরার প্রতিভা দানা বাঁধলো। সে হয়ে দাঁড়ালো পাণ্ডা। পুরোনো মেয়েরা কেউ তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলো না। সব ব্যাপারেই সে আগুয়ান। খুব চটপটে। খেলাধুলোয় ওস্তাদ। পড়ায় মন না-থাকলেও সবার আগে কথা বলে। ক্লাশে বেশীর ভাগ মেয়ে তার অনুগত হয়ে পড়লো।

বই-পত্তর কেনার নাম করলেন না রাখাল মুখুজ্জে। প্রথম পরীক্ষায় ধীরা গর-হাজির রইল। তারপর ওপর ক্লাশের একটা মেয়েকে ধ'রে দু-খানা বই নিয়ে এল। বাবা দেখে উপদেশ দিলেন, "ঠিক আছে। ওই দিয়েই পড়া চালা। পারিস তো আরও খানকত জোগাড় কর।"

বাপের ইঙ্গিত বুঝে নিয়ে ধীরা এর পর একে একে সব বই জুটিয়ে ফেললো।

রাখাল বাবু মেয়ের ওপর কর্তব্যের আওতা বাড়িয়ে তুললেন খুব তাড়াতাড়ি। ধীরাকে তিনি ছেলের মত মানুষ করবেন। একদিন তাকে বললেন—

"পাড়ার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একটা ক্লাব কর দিকিনি।"

ধীরা জানতো না ক্লাব জিনিসটা কি। বাপের অনুজ্ঞায় সে চেয়ে রইলো বোকার মত।

"আরে হাবা মেয়ে। ক্লাব মানে দল। সবাই তাতে নাম লেখাবে, চাঁদা দেবে। তুই সব দেখবি শুনবি, আমি ওপরে

থাকবো। তার মানে, তুই হবি সেক্রেটারি, আমি প্রেসিডেন্ট। চাঁদার পয়সায় খেলার জিনিস কেনা হবে। সরস্বতী পুজোর সময় বাড়ি বাড়ি ঘুরবি। অনেক টাকা উঠবে। ঘটা ক'রে পুজো হবে।"

চাঁদার ব্যাপারটা অজানা নয়। রাখাল মুখুজ্জে ইস্কুলের নামে অল্প-স্বল্প চাঁদা তোলেন। কিন্তু, নাম লেখা টেখা……। নিজের অসুবিধে খেয়াল হয় ধীরার। তাই বাপকে শুধোয়—

"সবাই এসে নাম লেখাবে। চাঁদা নিয়েও রসিদে নাম লিখে দিতে হবে। কিন্তু, আমি……বানান টানান………"

"তোকে নিয়ে আর পারলুম না। তুই সেক্রেটারি হলেও প্রেসিডেন্ট থাকবো তো আমি নিজে। লেখা-পড়ার কাজ নিয়ে ভাবনা কি। আমিই চালিয়ে দেবো। তুই শুধু মাসে মাসে চাঁদা আদায় করবি।"

এই ভাবে পোক্ত তালিম দিয়ে রাখাল মুখুজ্জে মেয়েকে ক্লাব-প্রকল্পে নামালেন। সে-ও কাজ শুরু করলো পুরো দমে।

ক্লাব জমে উঠলো অল্পদিনের মধ্যেই। ধীরা বুঝিয়ে, না-হয় মেরে ধ'রে সমবয়সীদের কাছ থেকে পয়সা উশুল করতে লাগলো। বিকেলে সবাইকে নিয়ে যেত পার্কে। ছেলেরা বশ মানলো গোড়াতেই। কটা মেয়ে বেয়াড়াপনা দেখিয়েছিল। ধীরার দাপটে তারা শায়েস্তা হল। রাখালবাবু ক্লাবের নাম দিলেন সাধনা সমিতি।

ধীরা ক্লাব চালায়, স্কুলে যায়। রাখাল মুখুজ্জে চাঁদার পয়সা হজম করেন। ক্লাবের জন্যে একটা কাঠের বল কেনা হয়েছিল। বাপের পরামর্শে ধীরা হাডুডুডু, খাসৃদা চালু করলো।

*   *   *   *

দেখতে দেখতে বছর গড়ালো। বাৎসরিক পরীক্ষায় ধীরা ডাহা ফেলও করলো। শুনে, মা ঝাঁঝালেন,

"হাড়গিলে মাষ্টারনিরা ষাটের বাছাকে আমার দু-চোখে দেখতে পারে না। সবাই ওকে হিংসে করে।"

বাবা হাঁক পাড়লেন,

"দাঁড়াও না। মজাটা টের পাওয়াচ্ছি। রাখাল মুখুজ্জেকে চেনেনি এখনও।"

তারপরই অভিযান।

নম্বরের কাগজ নিয়ে রাখাল বাবু একেবারে ভোর বেলা গিয়ে হাজির হলেন হেড-মাষ্টারের বাড়ীতে। ভদ্রলোক রীতিমত বৃদ্ধ। আগে সরকারী কলেজে পড়াতেন। অবসর নিয়ে হেডমাষ্টারি করছেন। রাখাল মুখুজ্জে তাঁকে পেয়ে গেলেন রোয়াকের ওপর।

"জানেন? আমার মেয়েকে ফেল করিয়ে পার পাবার উপায় নেই?"

আচমকা রাখাল বাবুর তাড়া খেয়ে হেড-মাষ্টার মশায়ের হাত থেকে খবরের কাগজ প'ড়ে গেল। সেদিকে খেয়াল না ক'রে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ফেল করে অনেকের মেয়ে। কত অভিভাবক এসে ধরে, প্রতিশ্রুতি দেয়, মেয়ের অস্বাস্থ্য বা বাড়িতে অসুখের দোহাই পাড়ে। কিন্তু, রাখাল মুখুজ্জের মত এ'রকম মারমুখো হয়ে আসে না কেউ। লোকটির ধরণ তাঁর একেবারে অজানা নয়। ধীরাকে ভর্তি করার কাহিনী তাঁর মনে ছিল। তবু প্রশ্ন করলেন—

"আপনার মেয়ের নাম কি? কোন ক্লাসে পড়ে?"

"জানেন না? ভুল হয়ে গেল সব? আমি মিটিং ডাকাবো। ইউসিভারসিটিতে লিখবো।"

বিব্রত হেড-মাষ্টার মশায় এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। দু-একজন বাজার-যাত্রী দাঁড়িয়ে গেল। মহা কেলেঙ্কারি। চাপা গলায় তিনি বললেন—

"স্কুলে আসবেন, কথা হবে।"

"উঁহুঁ। স্কুল টুল নয়। নম্বরের কাগজে এখনই লিখে দিন।"

হেড-মাষ্টার কাগজখানা নিলেন। রাখাল মুখুজ্জে পকেট

থেকে ফাউণ্টেন পেন বার ক'রে খুলে ধরলেন। সন্ত্রস্ত হেডমাষ্টারকে রাখাল বাবুর আদেশ পালন করতে হল।

* * * *

বছর না ঘুরতে ধীরা গানের স্কুলেও নাম লেখালো। সাধনা সমিতির গুটি চারেক মেয়েকে নিয়ে রাখাল বাবু সেখানে হাজির হয়েছিলেন। পাকা ব্যবস্থা ক'রে ফেলেন। ঠিক হয়, চারজন ছাত্রীর মধ্যে তিনজন মাইনে দেবে। চতুর্থ ধীরার কিছুই লাগবে না। সে নাচ, গান—তুটোই শিখবে।

এগার, বার, তের, চোদ্দ—চার চারটে বছর কেটে যায় হুস হুস ক'রে। ধীরা পড়াশুনো চালায় চলনসই মত, নাচ শেখে, গান শেখে, দৌড়-ঝাঁপের প্রতিযোগিতায় নামে। পড়ার স্কুলে হেড-মাষ্টার মশায় থেকে শুরু ক'রে গেটের দারোয়ান পর্যন্ত কারুর সাহস হয় না তাকে ঘাঁটাবার। গানের স্কুলে তার ভয়ানক খাতির। সাধনা সমিতি তার কর্মকেন্দ্র।

সমিতিরও উন্নতি হয়। সন্ধ্যায় গানের স্কুলে তার বৈঠক বসে। বাদ যায় শনি-রবিবার। সমিতিতে মেয়ের সংখ্যা কম। ছেলেরা দলে ভারী। সান্ধ্য আড্ডায় কদাচিৎ কোনও মেয়ে যোগ দেয়। ধীরা তাতে মধ্যমণি। আট-দশটি ছেলে। বয়েস তাদের দশ-বার থেকে পনের-ষোলর মধ্যে। তারা ভাগাভাগি ক'রে ক্যারম খেলে, গল্প করে। তাদের অনুরোধে ধীরা নাচ দেখায়। নাচের আগে জমা করতে হয় একখানা কবরেজী কাটলেটের দাম। নাচ শেষ ক'রে ধীরা খায় কাটলেট, বাকীরা চা। নাচ না-হলে শুধু চা—বড় জোর তেলেভাজা। কম হোক, বেশী হোক, ছেলেরা পয়সা যোগায় পাল্লা দিয়ে।

ধীরা সাধনা সমিতির সবাইকে নিয়ে মাঝে মাঝে বন-ভোজনে যায়। সিনেমাও বাদ পড়ে না একেবারে। কিন্তু ওতে তার আকর্ষণ বেশী নয়।

প্রায় দিনই বাবার কাছে কিছু কিছু পয়সা এনে দেয় ধীরা। বাড়িতে তার আদর যথেষ্ট। চার ভাই-বোনের মধ্যে তার জামা-কাপড় ভাল। রাখাল বাবুর সমান খাওয়ার ঘটা তার। তার সাত খুন মাপ। মেঝো রমেন ধীরার সঙ্গে খুনসুটি করে। ধীরা তাকে বেপরোয়া কিল-থাপ্পড় কষায়। মার কাছে নালিশে রমেন পাত্তা পায় না। বাপের সামনে দিদির নাম করলে উল্টে গালাগাল খেতে হয়। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে রমেন ধীরাকে দেখতে পারে না। বাবা-মার একেচোখোমিতে তার মনে স্থায়ী বিতৃষ্ণা। গোপনে গজরায় সে। ধীরার হাতে মার খেলে বা তার জন্যে হেনস্তা হ'লে রাস্তায় বেরিয়ে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে।

রমেনের পর নীরেন। নিতান্ত গোবেচারা। ধীরার সঙ্গে ছাড়া বাড়ির বাইরে পা দেয় না। তাকে পাহারাদার হিসেবে নিয়ে ধীরা যায় গানের স্কুলে, আরও পাঁচ জায়গায়। তাকে এটা ওটা খেতে দেয়। এইজন্যে রমেন নীরেনকেও দেখতে পারে না। সুবিধে পেলে তাকে চড়টা চাপড়টা দেয়, তার গায়ে চিমটি কাটে, তার চুল টানে। নীরেন কাঁদে, কিন্তু কারুর কাছে লাগায় না।

দুবারের বার ধীরা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করলো, শালোয়ার-পাঞ্জাবী ছাড়লো, শাড়ী-ব্লাউজ ধরলো। বাবা কলেজে ভর্তি ক'রে দিলেন তাকে। সে নিজের খরচ নিজেই চালাচ্ছিল। এখানে ওখানে নাচে, ক্লাবের চাঁদা তোলে, সরস্বতী পূজো ছাড়া রবীন্দ্র জয়ন্তী, নববর্ষোৎসবের মত অনেক হুজুগ জুটিয়ে নেয়। চেনা লোক দেখলে রাখাল মুখুজ্জে একগাল হেসে একবার মেয়ের প্রসঙ্গ তুলবেনই —

"অদ্ভুত মাথা ধীরার। শুধু আমার মুখ নয়, ও দেশের মুখ রাখবে। ওকে বিলেত পাঠাবো।"

যারা পঞ্চাশবার এসব শুনেছে, তারাও রাখালবাবুর কথায় বাধা দেয় না। বাধা দিলে তিনি থামবার পাত্র নন।

কলেজে ঢোকার পর থেকে ধীরা একাই ঘুরে বেড়ায়। নীরেনকে সঙ্গে নেয় দু-এক জায়গায়। কিন্তু তা শুধু সখ ক'রে। একা বেরিয়ে ফিরতে বেশি রাত হলে সদরে দুটো টোকা মারে। দরজা খুলে দেন রাখাল মুখুজ্জে নিজের হাতে। স্ত্রীকে ডেকে তোলেন—

"শুনছো, ধীরা এসেছে।"

ধীরার মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন, তাড়াতাড়ি খাবার সাজিয়ে দেন মেয়ের সামনে। ধীরা সামান্য কিছু মুখে তোলে। মা সামনে দাঁড়িয়ে অনুযোগ করেন—

"রোজ রোজ এই রকম না-খেয়ে থাকলে শরীর টিকবে কেন? দেখিস তো আয়না দিয়ে। চোখের কোল বসে গেছে কিরকম।"

ধীরা সাড়া দেয় না।

তিন

ধীরা এতদিন নেচেছে। এবার সে অনেককে রীতিমত নাচাতে আরম্ভ করলো। খেলাধূলো দৌড়ের অভ্যেসে চেহারাটা বেশ আঁট-সাঁট, স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল। হাত রোমবহুল হলেও গা দিয়ে জেল্লা বেরোয়। চোখজোড়া সব সময় চকচক করছে। হাসলে খাসা মানায়। ঝকঝকে দাঁতের সারি একটু বড়, তবে মানানসই। ধীরা নিজে শ্যাম বর্ণে অখুশী নয়। গৌরাঙ্গী হবার চেষ্টা করে না। জামা-কাপড় পরার কায়দা, চলা বলা, চেহারা– সব নিয়ে সে তার উপস্থিতি জানিয়ে দেয় যে কোনও জায়গায়, যে কোনও পরিবেশে। হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা দামী। রিষ্ট ওয়াচ সাদা-মাঠা, কাজ চলার মত। জুতোয় পালিস থাকে না। কিন্তু, তাতে ধীরার কিছু যায় আসে না।

কলেজে ধীরা পেয়েছিল নিজের নতুন কর্মক্ষেত্র। লোকের সঙ্গে পরিচয় হলে সে ছাড়বার পাত্রী নয়। যাকে বেয়াড়া লাগে, তাকেও বরবাদ করে না। গায়ে প'ড়ে আলাপ জমাতে সে ভয়ানক ওস্তাদ। দু-চারবার চোখোচোখির পর কারুর সঙ্গে দেখা হ'লে নিজে উপযাচক হয়ে জিজ্ঞেস করে-

"কি? চিনতে পারলেন তো?"

এই রকম চালাতে চালাতে ধীরা আই-এ পাশ ক'রে বি-এতে ভর্তি হল। খেতে ব'সে দুবেলা রাখাল মুখুজ্জে স্ত্রীকে বলতে লাগলেন,

"আর দুটো বছর। তারপর বিলেতে ধর বছর তিন-চার। বিলেত থেকে এসে হাকিম হবে, সংসারের ভার নেবে। আমার তখন ছুটি।"

দিনের পর দিন একই কথা শুনতে ভদ্রমহিলার একটুও বিরক্তি

লাগতো না। তিনি সগর্বে সায় দিতেন—"বিলেতে পড়ার খরচ ও নিজেই যোগাড় করবে। তোমার দৌড় তো কলেজ পর্যন্ত।"

পরম প্রসন্নতা নিয়ে রাখাল মুখুজ্জে খাওয়া সেরে উঠতেন।

বাপ-মার আলোচনা মাঝে মাঝে ধীরার কানে আসতো। সাহেব-মেমদের দেশে যাওয়ার উৎসাহ ছিল না তার। পরীক্ষার পর নতুন জীবন শুরু করার কল্পনা ঘুরতো মাথায়। পড়াশুনো আর নয়। কলেজ বড় একঘেয়ে। পাশ করলে ভাল। না-করলে আর একটা বছর চালাতে হবে। তারপর? তারপর ভালভাবে থাকা, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা চাই। খুব প্রাচুর্যের দরকার নেই। কিন্তু, দু-চারখানা জড়োয়া গয়না, দামী জামা-কাপড়, নিজেদের একখানা বাড়ি—এ সব না-হলে নয়।

* * *

এতদিন ধীরা শক্ত ভিতের স্তাবক-চক্র গড়ে তোলেনি। এবার সে দিকে মন দিল। বি-এ পরীক্ষার বছরই পর পর তিনজন আটক পড়লো তার বাঁধনে।

ডাক্তারির ভাল এক ছাত্রকে দেখেছিল সে বন্ধু কাজলের বাড়িতে। চেহারাটা সুন্দর, পরণে চোস্ত পোষাক, হাতে দামি ঘড়ি-আংটি, পকেটে জোড়া কলম। কয়েক মিনিটের মধ্যে ধীরা জমিয়ে নিল তার সঙ্গে। তার প্রথম অবতারণা—

"দেখুন, আমি আর্টসের ছাত্রী। কিন্তু, এনাটমি-ফিজিওলজিটা কিছু কিছু জানতে ইচ্ছে করে।"

ছেলেটি কাজলের পিসতুতো ভাই। ঢিলেঢালা এবং ধীরার গুণগ্রাহী হলেও কাজল বিরক্তি দেখালো—

"ক-মাস পরে পরীক্ষা। এখন আবার ও সব দিয়ে কি করবি?"

"তোর যেমন বুদ্ধি। নাচ-গান-খেলায় এনাটমি, ফিজিওলজির মোটমাট ধারণা না-থাকলে চলে?"

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পড়ুয়া পূর্ণবিকাশ শুনলো, মেয়েটি নাচ-গান-

খেলায় পারদর্শিনী। সঙ্গে সঙ্গে মামাতো বোনের দিকে চেয়ে নিজের অজান্তে ওজন করলো দুজনকে।

ধীরা দেখলো, বন্ধুর মুখ-চোখ কিরকম হয়ে গিয়েছে। তাই সামলিয়ে নিল—

"চা আননা, ভাই। তোর দাদা খাবেন। আমারও এ সময় চা না-হলে চলে না।"

কাজল উঠে যাওয়া মাত্র ধীরা ফিসফিসিয়ে বললো, "সতেরোর তিন, দীনু দাসের লেন, লিখে নিন।"

এ যেন শিরোধার্য করার মত হুকুম। পূর্ণবিকাশ হুকুম তামিল করলো।

"কোন দিকে এটা?"

"বৌবাজার—আমাদের স্কুল। নাচ-গানের। শনি-রবিবার ছাড়া যে কোন দিন সন্ধ্যেয় গেলেই পাবেন।"

পাল্টা কিছু শোনবার জন্যে অপেক্ষা না-ক'রে ধীরা উঠে পড়লো। ফিরলো একেবারে কাজলের সঙ্গে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে।

গানের স্কুলে না-গিয়ে উপায় ছিল না পূর্ণবিকাশের। বিচিত্র চাউনি মেয়েটির। ভয়ানক নয়, শান্তও নয়। গ্রে-হ্যালিবার্টনের বইতে এসবের রহস্য নেই। নতুন অভিজ্ঞতা পূর্ণবিকাশের। চোখের বাইরে-ভেতরে কি আছে, জানতে তার বাকি নেই। কিন্তু ধীরার দৃষ্টি অমন ঔজ্জ্বল্য পেলো কোথা থেকে? বেড়ালের চোখ জ্বলে অন্ধকারে। মানুষের চোখ! তাতে তো ওরকম হওয়ার কারণ নেই। ফস্ফরাস? নার্ভ? আইরিসে কেমিক্যাল রি-য়্যাকশান? কলেজে নোট নিতে নিতে, রাস্তায় চলতে চলতে, বাড়িতে পড়তে পড়তে ধীরার চাউনি ফুটে ওঠে মনের পটে—নাচ-গান, খেলা-ধুলোর কথা স্মরণ হয়, আমন্ত্রণের তাগিদ লাগে আপনা-আপনি। পূর্ণবিকাশ ভাবে, যাওয়া যাক একদিন। বেশি নয়, মোটে একটা দিন,

একবার। সামান্য সময়ের জন্যে। পড়াশুনোর কোনও ক্ষতি হবে না।

পূর্ণবিকাশ চৌধুরী গানের স্কুলে প্রথম দিনেই দশটা বাজিয়ে ফেললো। খেয়াল হল তার ধীরার অনুরোধে—

"আমাকে কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন। এত রাতে একা যেতে গা ছম ছম করে।"

পূর্ণবিকাশের জীবনে এ রকম ঘটনা আর ঘটেনি।

* * *

পূর্ণবিকাশ চৌধুরীর পর দেবনারায়ণ দাস—বড় ব্যবসায়ীর ছেলে।

দেবনারায়ণ পড়াশুনোয় আশৈশব পুরোদস্তুর স্থাবর। গণ্ডায় গণ্ডায় মাষ্টার রেখে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়ে, তাবিচ-কবচ পরিয়েও বাবা তাকে এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে ঠেলে দিতে পারেননি। লোহা লক্কড়ের কারবারী। মেজাজটা রুক্ষ। একমাত্র সন্তান। নিজে লেখাপড়া জানেন না। দেবনারায়ণকে ভাল ক'রে পড়িয়ে একটা বড় কারখানা খোলার সাধ ছিল তাঁর। ছেলে তাই বাপের কাছে মিষ্টি কথা শুনতো না, আদর পেত না। মা বলতেন, "লোহা ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে উনি একেবারে কাঠখোট্টা হয়ে গ্যাছেন। বরাবর এরকম ছিলেন না। বিয়ের পর কতদিন লুকিয়ে আমাকে দোকানের পান খাইয়েছেন, শ্বশুর-শাশুড়ী বকলে আমায় সান্ত্বনা দিয়েছেন। আজকাল কথায় কথায় খিঁচিয়ে ওঠেন। কিন্তু, ভেতরটা ওঁর নরম।"

দেবনারায়ণ অতশত বুঝতো না। জ্ঞান হওয়া অবধি সে গালাগাল শুনছে, মারধোরও খায় নিয়মিত। পড়ার বই দেখলেই তার কানে বাজতো বাবার ধমকানি—

"গরু…মাথায় গোবর ভর্তি…কিসৃসু হবে না…চাবুকে লাল ক'রে দোবো। জানোয়ার…কুকুর…দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে…"

ঘুমের ঘোরে দেবনারায়ণ ফুঁপিয়ে উঠতো, "আর করবো না, আর করবো না। মন দিয়ে পড়বো। আর মেরো না আমাকে।"

বাবা না-থাকলে মা হয়তো মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন।

সম্পন্ন ঘরের ছেলে। বয়েসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধু জুটতে লাগলো। দেবনারায়ণ মাকে বুঝিয়ে পয়সা আদায় করতে শিখলো। ফিকির খোঁজায় হাতে খড়ি হল সঙ্গীদের কাছে। ক্রমে নিজেই নানা রাস্তা বার করতো। স্কুলের চাঁদা, খাতা কিনতে হবে, পেন্সিল চাই, কলম হারিয়েছে, ইত্যাদির পর বই বিক্রী শুরু হল। দলের ছেলেরা বেচে দিয়ে আসতো। মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নতুন বই কিনে, রসিদ এনে দেখাতো। সে বই চ'লে যেত, আবার খরিদ হত।

তিন ক্লাশে মোট বার বছর কাটাবার পর দেবনারায়ণ নিষ্কৃতি পেল। ইংরেজীতে চিঠিপত্র লেখা আর সাধারণ হিসেব শেখানোর জন্যে দুজন মাষ্টার ঠিক ক'রে বাবা তাঁর প্রাথমিক কর্তব্যে ইস্তফা দিলেন। মাষ্টার মশায়রা দুপুরে আসতেন পালা ক'রে, পান খেতেন, ঝিমুতেন। দেবনারায়ণ সবদিন বাড়িতে থাকতো না। থাকলেও ওপর থেকে নিচে নামতো না। বিকেলে তার সিনেমায় যাওয়া, খেলা দেখা, না-হয় বাড়ির বৈঠকখানায় তাস পেটা। তারপর, সন্ধ্যেয়, আর কিছু না-হোক, চৌরঙ্গী—বালিগঞ্জ ঘুরে আসা। নধরকান্তি—রংটা ফর্সা না হলেও সাজগোজে মানাতো। মা শোবার ঘরে না থাকলে চট ক'রে খানিকটা ক্রিম মেখে নিত, গরমের দিনে তাঁর সামনেই ঘাড়ে, মুখে পাউডার লাগাতো।

চলছিল এই রকম। এতে খানিকটা পরিবর্তন ঘটালো ধীরা। একদিন রাত্তিরে তাকে এসপ্ল্যানেডের জনবিরল ট্রাম গুমটিতে দেখে দেবনারায়ণের বুকটা কেমন ক'রে উঠলো। এমনিতে সে ভয়ানক রকম ভীতু। বন্ধুরা তাকে ঠাট্টার খোঁচা দিতে ছাড়ে না। কিন্তু, তাদের নানা রকম গল্প শুনেও কিছু করার সাহস পায় না।

তার মনে সব সময় বাবার ভয়—যদি বেয়াড়াপনার খবর জানতে পারে, তাহলে নিশ্চয় তাড়িয়ে দেবে বাড়ি থেকে।

ট্রামের জন্যে অপেক্ষমানা ধীরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেবনারায়ণের দিকে চাইতেই তার বাবার রক্তচক্ষু, বকবকির ভয় বেমালুম তলিয়ে গেল বিস্মৃতির মধ্যে। বুক ঢিপঢিপুনির বদলে নতুন অনাস্বাদিত উত্তেজনায় চঞ্চল দেবনারায়ণ এসে দাঁড়ালো ধীরার খানিকটা দূরে।

"আচ্ছা, এখন কি শেয়ালদার শেষ ট্রাম পাবো? লালবাজারে গিয়ে গাড়ি পাল্টাতে দেরি হয়ে যাবে।"

প্রশ্নটা দেবনারায়ণকে উদ্দেশ্য করে। পাশাপাশি আর কোনও লোক ছিল না। দেবনারায়ণ এগিয়েছিল অজ্ঞাত আকর্ষণে। কিন্তু, সরাসরি আলাপ করা! সে হতভম্ব হয়ে গেল। একটা কিছু না বললে মেয়েটি কি মনে করবে? কিন্তু, কি বলবে? কেমন করে বলবে? দেবনারায়ণ আর একটু কাছে ঘেঁষলো, কেশে গলাটা পরিষ্কার করলো।

ধীরা আচমকা শুধোলো, "আপনি কোথায় যাবেন?"

এরকম সোজাসুজি লক্ষ্যভেদের চোটে বোকার মগজ সাফ হয়ে যায়, হাবার মুখে কথা ফোটে, চাই কি, পঙ্গু গিরি-লঙ্ঘনের প্রেরণা পায়। দেবনারায়ণ তবুও হোঁচট খেতে খেতে উত্তর দিল—

"তা, এই, মাণিকতলা, মাণিকতলা, ঐ, মাণিকতলার দিকে।"

"যাক, ভালই হল। সঙ্গী পেলাম একজন। বড্ড ভয় করছিল আমার।"

হাওড়া থেকে ডালহৌসি হ'য়ে ট্রাম এসে গেল। গাড়িতে ভীড়। খালি লেডিজ-সিটে গিয়ে ব'সে ধীরা দেবনারায়ণকে ডাকলো পাশের জায়গায়।

কিন্তু অচল দেবনারায়ণ দাঁড়িয়ে রইলো দরজার কাছে। যাত্রীদের ধাক্কায় বাবার কথা খেয়াল হয়ে গিয়েছিল তার। একটা

মেয়ের পাশে ব'সে যাবে! যদি বাবা দেখে! যদি বাবার চেনা কারুর চোখে পড়ে!

ট্রাম শেয়ালদা পঁওছালে ধীরা নামলো। দেবনারায়ণকেও ডাকলো, "নামুন এখানে। পরের গাড়ি পাবেন।"

দেবনারায়ণ না-নেমে যায় কোথা। ধীরা আগে, কয়েক হাত পেছনে সে। এই ভাবে চোখের পরিচয় বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে গাঢ়তর বেষ্টনীতে আটক পড়লো।

* * * *

নতুন নাচের স্কুল। চকচকে সাইনবোর্ড ঝুলছে—

নৃত্যকলা-মন্দির
শিক্ষক—বীরেনকুমার

যেতে আসতে সাইন-বোর্ডটা নজরে পড়েছিল বারকত। একদিন ধীরা নৃত্যকলা-মন্দির চড়াও করলো।

বীরেনকুমার যত্ন ক'রে বসালো তাকে। ধীরার সরাসরি প্রস্তাব—মাসখানেকের মধ্যে সে স্কুল ভ'রে দেবে সাধনা সমিতির মেয়ে এনে। বীরেনকুমার তাকে বিনে পয়সায় ভর্তি ক'রে নিল।

লোকটির পুরো নাম বীরেন্দ্রকুমার তলাপাত্র। নাচের সঙ্গে বেমানান ব'লে নামে সংযুক্ত বর্ণ বাদ দিয়েছে, পদবীও বর্জন করেছে। উদয়শঙ্করের কায়দায় চুল, লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী আর শুঁড়তোলা চটিতে মন্দ দেখায় না।

প্রথম পাঠেই ধীরা বুঝে নিল, নাচে নতুন গুরুর দখল কতখানি। তবু সে ইস্কুল ছাড়লো না, মাষ্টারকে ছাড়লো না।

কিন্তু, বীরেনকুমারের গুরুগিরি খতম হল তৃতীয় দিনে। ধীরা বললো—

"জানেন, মাষ্টার মশাই। আমি আপনার থেকে অনেক ভাল নাচতে পারি।"

"বটে? দেখাও তো।"

ঘুঙুর প'রে ধীরা তালে তালে ঘুরপাক খেল ড্রিলের মত পা ফেলতে ফেলতে, কোমরে হাত দিয়ে উর্ধ্বাঙ্গ বেঁকালো ধনুকের মত। তারপর জোড়পায়ে তিনবার হাইজাম্প।

বীরেনকুমার বেওকুফ ব'নে গেল। নাচ শেষ ক'রে ধীরা গিয়ে সামনে দাঁড়াতে শুকনো মুখে মন্তব্য করলো,

"মন্দ নয়। প্রাকটিস করলে, শিখলে, উন্নতি হবে।"

ধীরা কিন্তু অত সহজে রেহাই দিল না তাকে। পাল্‌টা চেপে ধরলো—

"মন্দ নয় শুধু? আপনার থেকে অনেক ভাল। ছ-বছরের তালিম। আমি যখন শুরু করি, আপনি তখন নাচের নাম শুনেছেন কিনা, সন্দেহ।"

বীরেনকুমারের মুখে একটিও কথা যোগালো না। ধীরার এলেম দেখে বেশ ভয় ধ'রে গিয়েছিল তার। এতদিন বাড়িতে বাড়িতে শিখিযে যা রোজগার হত, তাতে কষ্টে-সৃষ্টে চলতো। কোনও রকমে ঘর জোগাড় ক'বে নৃত্যকলা মন্দিরের সাইন বোর্ড ঝুলিয়েছে। দেনা ক'রে পুরোনো তবলা, মাদল, টেবিল, চেয়ার কিনতে হয়েছে। দিনে রাতে মুড়ি-বেগুনির বেশি জোটাতে পারছে না। বিশ্বকর্মা পুজোর মরশুমে দুটো পয়সা পেলে ধার শোধ হতে পারে। বছরে ঐ একবার মওকা আসে। বাজিয়েদের দিয়ে, গাড়ি ভাড়া চালিয়ে ত্রিশ চল্লিশ টাকা থাকে। শো'র নামে ছাত্রীদের খুব উৎসাহ। পাঁচজনের সামনে মেয়ে নাচলে সব বাপ-মা খুশী হয়।

বীরেনকুমার ধীরাকে ভর্তি করেছিল অনেক আশা নিয়ে। তার আগে আরও চারটি মেয়ে এসেছে। সব কজনই বাচ্ছা। ধীরা চটকদার, কলেজে-পড়া। প্রথম দিন তাকে দেখে বীরেনকুমার ভেবেছিল, স্কুল জমতে দেরি লাগবে না। কিন্তু, নতুন ছাত্রীর পরিচয় পেয়ে তার একেবারে আক্কেল গুড়ুম।

বীরেনকুমার আর কখনও ধীরার ওপর মাষ্টারি ফলাতে যায়নি। তবে, তার দুশ্চিন্তাও কাটলো মাসখানেকের মধ্যে। ধীরা নিজেই তাকে জিজ্ঞেস ক'রে বসলো, সে বাইরে নাচ দেখাবার বায়না পায় কিনা।

মাষ্টার লম্বা-চওড়া বক্তৃতা ফাঁদতে যাচ্ছিল। ধীরা বললো,

"ওসব গাল-গপ্প শুনতে চাই না। শো'র ডাক যাতে আসে, তার ব্যবস্থা ক'রে দোবো। অর্কেষ্ট্রা পার্টির সঙ্গে বাঁধা চুক্তি না-হলে চলবে না। বাকী যা লাভ দাঁড়াবে, তার আধাআধি।"

বীরেনকুমার হাঁ ক'রে চেয়ে রইল। ধীরা মনে করলো, আধাআধির তত্ত্ব তার মাথায় ঢোকেনি, অথবা, সে ওতে রাজি নয়। তাই আবার বুঝিয়ে দিল—

"প্রত্যেক শো'র পর, খরচ বাদে যে টাকা থাকবে, তার অর্ধেক আপনার, অর্ধেক আমার। এতে রাজী না হলে ঠকবেন। আমি নিজেই সব ঠিক ক'রে নোবো।"

"না, না। আধাআধি তো খারাপ নয়। কিন্তু, তুমি কোত্থেকে শো'র খবর আনবে?"

বীরেনকুমারের কথায় হেসে উঠে ধীরা তাকে আশ্বস্ত করলো—

"ভয় নেই। ভাঁওতা দিচ্ছি না। আমার বাবার সঙ্গে অনেক লোকের খাতির আছে এর আগে আমি বহু জায়গায় নেচেছি। যে স্কুলে শিখতাম, সেখানকার কর্তারা প্রায় সব টাকা ট্যাঁকে গুঁজতেন। সেই জন্যে আপনার এখানে আসা। বাবার চেষ্টায় এত ডাক আসবে যে, সামলাতে পারবেন না।"

কোনও তরফেই চুক্তির খেলাপ হয়নি। লেখাপড়া রইল না। শুধু মুখের কথা। তবু ধীরা বা বীরেনকুমার আধাআধি বখরা নিয়ে কখনও ঝগড়া করেনি। সরস্বতী পূজো পর্যন্ত সাত মাসে রাখাল মুখুজ্জে পনেরটা শো ঠিক ক'রে দিলেন। বীরেনকুমার ধীরার নিতান্ত অনুগত হয়ে পড়লো।

চার

বয়েস বেড়ে যায়। দিন কাটে, মাস কাটে, বছর কাটে। ধীরা আইনষ্টাইনের সিদ্ধান্ত জানতো না। ফোটনের শক্তিতে হোক, বা অন্য কোনও পন্থায় হোক, আলোর সমান গতিবেগ নিয়ে কোনও রকেট মহাকাশে ছুটতে পারবে কিনা, সে রকেটে কোনও আরোহী থাকবে কিনা, এবং থাকলে, তার বয়োবৃদ্ধির প্রশ্ন লোপ পাবে কিনা —ধীরার মগজে কখনও এসব সমস্যার ছায়া পড়েনি। কিন্তু স্কুল-জীবনেই সে অনুভব করেছিল নিজের পরিপক্কতা। অনেকের পক্ষে ওটা স্বভাবগত। বাল্য-বিবাহের আমলে পনের-ষোল বছরের কত মেয়ে সংসারে গিন্নী হয়ে বসতো। আবার, কত ঘরণী নাতি-নাতনীর মুখ দেখেও কচি খুকি থেকে যায়। কোনও ছেলে দশ-বার বছরেই পয়সা জমানোর অভ্যেস রপ্ত করে; কেনা কাটায় হোক, বাড়ির কোনও ব্যাপারে হোক অনায়াসে পাকা মাতব্বরি, দক্ষ মুরুব্বিয়ানা দেখায়। আবার, কত প্রৌঢ়, কত বৃদ্ধ অগোছালো জীবন নিয়ে ঠকতে ঠকতে, গড়াতে গড়াতে ইহলোকের মায়া কাটান।

পরের ঘরে গেলে ধীরা নিশ্চয় চোস্ত গিন্নী হত, লাগাম ক'ষে ক'ষে স্বামীকে একেবারে রোবটে পরিণত করতো। নয়তো শাশুড়ি-ননদ-শ্বশুর-স্বামীর সঙ্গে লাঠালাঠি বাধিয়ে ফিরে যেতো বাপের বাড়ি।

কিন্তু, আসলে ধীরা বিয়ের কথা ভাবে না। তার মা-বাপও ওটা নিয়ে মাথা ঘামান না। ধীরা জীবনে পুতুল খেলায় ঝোঁকেনি। সঙ্গীদের খেলতে দেখলে খেলনা-পুতুল গায়েব করেছে, কেড়ে নিয়েছে, বাড়িতে এনে রেখে দিয়েছে। পরে আর ছুঁতোনা সেগুলো। খাওয়ার ব্যাপারে সে উদাসীন। বাবা-মা যা যোগাড় করবার করেন। সে খোঁজ নেয় না, নিজের থেকে কিছু ফরমাইসের ধার ধারে না। মাছ-মাংস পছন্দ করে—এই পর্যন্ত। ভাল জামা-কাপড় পরে, কিন্তু, সাজ-গোজের বাড়াবাড়ি করে না। এ যুগের

জন্যে রাখাল মুখুজ্জের মুখে মেয়ের সুখ্যাতি লেগে থাকে। মেয়ের সামনে-অসামনে তাকে সন্ন্যাসিনী বলেন। প্রসঙ্গ পাওয়া মাত্র লোককে শোনান—

"এই আমার বড় মেয়ে ধীরার কথা ধরুন না। কোনও দিকে নজর নেই। একেবারে প্রথম ভাগের গোপাল। যা পায়, তা-ই খায়। যা পায়, তা-ই পরে। অথচ অমন মাথা দেখতে পাবেন না।"

ধীরা বোঝে, তার বয়েস এগিয়ে চলেছে। এতে তার দুঃখ নেই। বি-এ পাশ করার পর সে আর পড়লো না। নামের পেছনে একটা ডিগ্রীই যথেষ্ট। ওর ওপরে ওঠা নিরর্থক। বাবার জপানি সে একদম কানে তুললো না। বিলেত যাওয়ার কথা হেসে উড়িয়ে দিল। থোক দশটি হাজার টাকা লাগবে। আর, বিলেতে গিয়ে সে করবে কি? দেশে থেকেও যথেষ্ট বড় হওয়া যায়।

রাখাল মুখুজ্জে মেয়ের যুক্তি মেনে নিলেন, দমেও গেলেন।

* * *

ধীরা নিজের মনে যথেষ্ট আলোচনা করেছে। টাকা চাই। ভাল বাড়ি চাই। গাড়ি চাই। বড়লোকের ঘরে বিয়ে হলে তো ও সব মিলে যাবে। কিন্তু, যত চেষ্টা কি শুধু নিজের সুখ-সুবিধে, ভাল থাকা-খাওয়া-পরার জন্যে? ধীরা ঠিক ভেবে পায় না। তার কল্পনা, সে কোনওদিন সংসারের জোয়াল কাঁধে নেবে না। জীবনে কারুর তাঁবেদারী পোষাবে না তার। তাকে ঘিরে থাকবে যত স্তাবক। সবাই তার হুকুম তামিল করবে।

একজনের ওপর, একটা নির্দিষ্ট কিছুর ওপর ধীরা বেশি দিন নিজের মনকে আটকিয়ে রাখতে পারে না। রাত্তিরে শোবার সময় সে প্রায়ই জায়গা বদলায়। ঘর পাল্টাতে ইচ্ছে করে অনবরত। পারে না। বাড়িতে, তার খুশীতে এপাশের বাক্স-প্যাঁটরা ওপাশে যায়, এ দেওয়ালের ছবি ও দেওয়ালে ঝোলে। নৃত্যকলা-মন্দিরে তার

সান্ধ্য আসব ঠিক হযে গেছিলো সেখানে মাসে দু চারবার চেয়ার-টেবিল এধার-ওধার হয়। নিজের পক্ষে একটা মানুষকে অবলম্বন করে থাকা বা এক ধরণের জীবন-যাত্রায় দিন কাটানো যে অসম্ভব, এটা ঠিক মেনে না-নিলেও ধীরা অস্পষ্ট বুঝতে পারে। বাবা আগে গেযে বেড়িযেছেন—ধীরা জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবে। আজকাল বলেন, "ও শেষ পর্যন্ত লাট বেলাটের গদিতে বসবে। লর্ড সিংহি পুরুষ ছিলেন। ধীরা মেযে বটে, কিন্তু, তাঁর থেকে কম যায় না। মেয়েদের যুগ বদলিয়েছে। সব কাজে এগুচ্ছে তারা। ধীরাই বা পাবরে না কেন"

পড়ার পাট চুকিযে দিতে ঝামেলা কমলো, একটা অধ্যাযে ছেদও পড়লো। নতুন কিছু চাই। অথচ, ধীরা নিজের রাস্তা ঠিক করতে পাবে না। অবকাশ পেলে তাই আকাশ-পাতাল চিন্তা করে।

আস্তে আস্তে অস্বস্তিও কেটে যায, অনিশ্চিত মানসিকতা দানা বাঁধে লক্ষ্য ধ'রে। এতদিন ধীরা চলেছে নিজের অস্পষ্ট খেয়াল নিয়ে, আবছা প্রবৃত্তি নিযে। ধরাবাঁধা কোনও পরিকল্পনা ছিল না। এবার সে একটার পর একটা করণীয় ছ'কে ফেললো। বাড়িটা বদলাতে হবে। ভাড়া লাগবে অনেক, লাগুক। বালিগঞ্জের দিকে ছোট বাড়ি চাই। গলির রাজ্যে যেন দম আটকিয়ে আসে। এখানে সবাই বড় অনুসন্ধিৎসু। নতুন পাড়াটা ঘিঞ্জি হলে চলবে না। পাড়ার লোকেরা অনবরত উঁকি মারবে সদরে, গাড়ি এলে আগন্তুকের নাম-পরিচয় খোঁজ করবে। বাড়িখানা দোতলা না-হলে অসুবিধে। আব্রু রাখা যাবে না। নীচে খান দুই কামরা। একদম লাগোয়া। মাঝখানে দরজা। ওপরে তার জন্যে চাই আলাদা শোবার ঘর। বাবা-মা-রমেন-নীরেন-মিনু থাকবে একসঙ্গে, আর একখানা ঘরে। ঝী শোবে রান্না ঘরে। চাকর রাখতে হবে একটা। সে যেখানে হোক রাত কাটাবে।

নতুন বাড়ির কথা ভাবতে গিয়ে ধীরার আশ্চর্য লাগে [illegible]

অজানা পরিচয়ে। নিজের ঘর তিন খানা সাজাতে হবে ভাল ক'রে। দামী আসবাব না-হলেও চলবে। তবু টুকিটাকি কত জিনিস আছে। একখানা ইজি চেয়ার, বেতের সাধারণ চেয়ার খানকত, বেতের টেবিল। ছারপোকার জন্যে মাঝে মাঝে গরম জলে ধুয়ে দিতে হবে। প্রত্যেকটা জানলায় পর্দা ঝুলবে। ছোট ছোট মাটির টবে অর্কিড। দেওয়ালে দু-একখানা ছবি—উড়ন্ত পাখি, ছুটন্ত ঘোড়া, না-হয়, সমুদ্র, জলপ্রপাত। সদরে বসাতে হবে কলিং-বেল। গোড়ায় তিন খানা পাখা লাগবে তার। বাবার ঘরে পরে ব্যবস্থা করলেই হবে। বাড়িটা নতুন হলে ভাল। নতুন হোক আর পুরোনো হোক, নিজের ঘর তিনখানায় সে রং করাবে। হলদে নয়, সাদা কালি নয়, নীলও নয়। ফিকে সবুজ।

ধীরা অবাক হয়ে যায়। এর আগে সে নিজের এত পছন্দের সন্ধান রাখতো না। অর্কিড দেখেছে দত্ত বাবুদের বাড়ি। গাড়ি-বারাণ্ডায় চেয়ার-টেবিল আর পেতলের টবে পাতা-বাহারের গাছ সাজানো আছে বীণাদের ওখানে ফিকে সবুজ? নাঃ, ফিকে সবুজ কোথাও নজরে পড়েনি। কিন্তু, নীলাভ সাদা রঙ দেখলেই তার মনে পড়ে সবুজের কথা। সবুজ! সবুজটা কি ভাল! গাঢ় সবুজ রঙের পর্দা ঝুলবে জানলায়। বিছানার চাদর, টেবিলের ঢাকনা—সব হবে সবুজ কাপড়ের।

কিন্তু, বাড়ি বদলানো, আসবাব-পত্র কেনা তো অমনি অমনি হয় না। ধীরা হিসেব কষে মনে মনে। টাকার অঙ্ক ঠিক থাকে না শেষ পর্যন্ত।

নীরেনকে ডাকলো একদিন—

"এই, বসতো চট ক'রে খাতা-পেন্সিল নিয়ে।"

নীরেনের জ্ঞানে দিদির এরকম কদর-মেশানো আদেশ এই প্রথম। বসলো সে। ধীরা বললো—

"একটার পর একটা লেখ। বাঁ দিকে নাম, ডান দিকে টাকা।"

ধীরা শুরু করে বাড়ি-ভাড়া থেকে। ফিরিস্তি খতম হয় টেলিফোনে। লেখাতে গিয়ে মাথায় এল ধীরার—টেলিফোন ছাড়া চলবে না। ফোনে অনেক কাজ হয়।

ধীরা আওড়ায়, নীরেন হাত চালায়। লেখা শেষ হতে ধীরা নিল খাতাখানা।

"আরে রামো! এ যে কিছুই পড়া যাচ্ছে না!"

—দিদির কথায় নীরেন ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

"রমেনকে ডাক।"

নীরেন ছাত থেকে রমেনকে ডেকে আনলো।

"কি করছিলি, রে?"

প্রশ্নের উত্তর দিল নীরেন—

"ছাতে পাঁচিলের ধারে বই নিয়ে বসেছিল।"

"বেশ। লেখ তো।"

রমেন জিজ্ঞেস করলো—

"কি লিখতে হবে আবার? আমার নিজের লেখা বাকি রয়েছে। কাল ইস্কুলে দেখাতে হবে।"

"ও সব শুনতে চাই না। যা বলি, তাই টুকে যাবি।"

"পারবো না। পরীক্ষা সামনে।"

"পরীক্ষা; না ছাই আর পাঁশ। গিলিস শুধু ব'সে ব'সে।"

কোনও প্রত্যুত্তর না-ক'রে রমেন চলে গেল। নিতান্ত বিরক্তিতে ধীরাও উঠে পড়লো তখনকার মত।

যেটা একবার মাথায় আসবে, ধীরা সেটা সহজে ছাড়বে না। বাবার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সে টাকার আন্দাজ পেল। কম সে কম হাজার দুই। বাবা একসঙ্গে পঞ্চাশটা টাকাও দিতে পারবেন কিনা, সন্দেহ। কাজেই, আগে স্লেভো, পরে বাকি সব। পাড়া ছেড়ে বেপাড়ায় গেলে লোকজন আসবে কম, ক্লাবটা উঠে যাবে একদম।

এসব অসুবিধে আছে। কিন্তু, বালিগঞ্জের ছিমছাম বাড়ি আর টেলিফোনের জোরে কত মিঞা ধর্ণা দেবে। নতুন ক্লাব গ'ড়ে তুলতে বা কদিন লাগবে। নৃত্যকলা-মন্দির তো থাকবেই। তার ওপর বাড়িতে স্কুল খোলা যাবে। হপ্তায় দুদিনের ঝঞ্ঝাট বইতো নয়। সদরের মাথায় সাইন-বোর্ড টাঙিয়ে হ্যাণ্ডবিল ছাড়লে ছাত্রীদের ভীড়ে নিচতলাটা ভ'রে যাবে।

রাখাল মুখুজ্জে একদম মোক্ষম আশার কথা শোনালেন—

"এখন দু-হাজার নিয়ে ভাবছিস। দেখবি, তুই যদি উপার্জন করিস, তোর আমার মিলিয়ে মাসের আয় দাঁড়াবে পাঁচ-ছশো টাকা।"

বাবার আশাবাদে ইন্ধন না-দিয়ে ধীরা উল্টো কথা বললো—

"সাধনা সমিতি তো যাবার দশায়। নৃতকলা-মন্দিরও পোষাচ্ছে না আমার। নিজে নাচা আর ভাল লাগে না। বালিগঞ্জে উঠে গেলে তোমাকে তো চাকরি ছাড়তে হবে। রোজ ইস্কুলে আসা—পেরে উঠবে না কিছুতে।"

"না, না। রোজ [illegible]বো কেন। খেয়ে দেয়ে মাঝে মাঝে ঘুরে গেলেই হবে।"

"আমার মুখে শুনলে[illegible], তবে, এখন থেকেই দুশ্চিন্তায় প'ড়ো না যেন।"

রাখাল মুখুজ্জের চোখ-[illegible] নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

* * *

বিশ্রামের সময়, ঘুমোবার আগে নানা ছাঁদের কল্পনা করতে ধীরার বেশ লাগে। তার মধ্যে এল নতুন আমেজ। একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার দরকার নেই। মাঝামাঝি আভিজাত্য চাই। সবাই যেন বুঝতে পারে, এরা গরিব নয়, হা-ঘ'রে নয়।

কিন্তু, সব খরচও তো সামলাতে হবে নিয়মিত। স্বপ্নবিলাসিতার ধার ধারে না ধীরা। তার মনের পটে কল্পনার তুলি দিয়ে ছবি আঁকা হলে, সেটা সহজে মুছে যায় না। ছোট বেলায় আশা-আকাঙ্ক্ষা

ছিল কম। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে। বাসনাকে রূপ দেওয়ার অভিলাষ পেয়ে বসছে এবার।

কাজেই, ভাল বাড়ি, ভাল আসবাব পত্রের চিন্তায় সে নানা সমস্যার কথা মাথায় আনে—সে সবের সমাধানও খোঁজে।

টাকা লাগবে। তাই, একটা কিছু করতে হবে। কি করবে ধীরা? চাকরি? পরের দাসত্ব? ধরাবাঁধা আটক থাকা? মোটেই সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে বি-এ পাশ করা মেয়ের পক্ষে এমন রোজগার হবে না, যাতে চলনসই রকম বনেদিয়ানার খরচ কুলোবে। আবার নাচের স্কুল চালানো, শো-তে টাকা নেওয়া, তার ওপর বাবা প্রাইমারি স্কুলের মাষ্টার—যারা জানবে তারাই নাক সিঁটকোবে। অথচ, সে বা বাবা নিষ্কর্মা বসে থাকবে, এটা ঠিক হবে না। বালিগঞ্জের মত জায়গায়ও পড়শীর দোষ খুঁজতে কত লোক জুটে যাবে। দেশে জমিদারি আছে শুনলে কেউ কেউ হয়তো খবরাখবর জিজ্ঞেস করবে। জমিদারি-মুখো হতে না-দেখলে দুচারজন নানা কথা রটাবে। সব প্যাঁচারূ হিংসুটেরা দলে ভারী। তা ছাড়া, নীরেনটা বোকা, জেরায় পড়লে কি বলতে কি বলবে ঠিক নেই। মিনুর কাজ হল বকবক করা—যে লোক দেখবে, তার কাছেই দুনিয়ার খবর দেবে।

যাই হোক, সবার আগে চাই বাড়ি বদলানোর টাকা। কমপক্ষে একটি হাজার। থোক কে দেবে? জমানোর আশা নেই। একসঙ্গে যোগাড় না হলে কোনও কাজে লাগবে না, আস্তে আস্তে উবে যাবে।

ধীরা সব দিক খুঁটিয়ে বিচার করে। প্রতিবন্ধক যতই মনে আসে, সঙ্কল্পও তত অমোঘ হয়ে দাঁড়ায়। অলস অবকাশের গণ্ডী কাটিয়ে তার চিন্তা চলতে লাগলো দিন-রাত। এটাও ধীরার বস্তুধর্মী প্রকৃতি। বাইরে কথা বলে, কাজ করে, হাসি-ঠাট্টা চালায়। ভেতরে মাথায় ঘোরে নির্দিষ্ট জিনিস। এটা তার স্থায়ী মানসিকতার ধারা।

দেবনারায়ণ দাসের সঙ্গে ধীরা গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়েছিল শুধু পরখ করবার জন্যে, মজা দেখার উদ্দেশ্যও ছিল খানিকটা। পূর্ণবিকাশ চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম আলাপে সে ছিপ ফেলেছিল। এড়িয়ে গেলেও ছেলেটি ছাড়া পেত না। তবে, একেবারে ধরা না-দিলে ধীরা রুখে যেত। এটা এক ধরণ।

ধীরার দ্বিতীয় পদ্ধতি ঘায়েল করেছিল বীরেনকুমারকে। গোড়াতেই ঠিক ক'রে নিয়েছিল আক্রমণের কায়দা। সরাসরি চড়াও হয়ে দেখলো কি ঘটে। হয় হার, নয় জিত। হারলে ধীরা বীরেনকুমারের সংস্রব ছাড়তো। কিন্তু, বীরেনকুমার তার পয়লা চোটই সামলাতে পারেনি।

রাখাল মুখুজ্জের কারবার অনিশ্চিত নিয়ে। নব-নব-উন্মেষ-শালিনী সে রকম চোস্ত বুদ্ধি তাঁর ছিল না। তিনি চলতেন বাঁধা কায়দা, বাঁধা গৎ সম্বল ক'রে। মেয়ের ওপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও তিনি তার ক্ষমতার স্বরূপ ধর[illegible]ত পারতেন না।

ধীরা করণীয় কিছুতে [illegible]গালের ধার ধারে না। এটা তার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের ফল[illegible] যা করবে ভাবে, ক'রে ফেলে। দুনিয়ার সবাইকে সে শিশু [illegible] করে। বাবা তার কাছে সাদাসিধে মানুষ। মা একেবারে গো[illegible]রা। তিনি আছেন শুধু মেয়ের সেবা করতে। কিন্তু, ধীরা [illegible]র কাছে মা-বাবাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। "মা বকবেন, বাবা রাগ করবেন" ব'লে সে অনেক ঝামেলাও কাটায়।

টাকার সমস্যাটা ক'দিন ঘুরলো ধীরার মগজে। তারপরই রাস্তা ঠিক ক'রে সে নেমে পড়লো কাজে।

পাঁচ

একবার এক আসরে নাচের শেষে ধীরার ছবি উঠেছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, সভাপতি ইত্যাদির সঙ্গে। প্রধান অতিথি ছিলেন রায় বাহাদুর নগেন্দ্রলাল রায়—মস্ত বড় এক কাপড়কলের মালিক, নামকরা ব্যবসায়ী।

ধীরা প্রত্যেকটা শোর কাগজ-টাগজ গুছিয়ে রেখে দিত। রায় বাহাদুরের কথাটা তার বেশ খেয়াল ছিল। বয়েস ষাটের মত। বুক চিতিয়ে বসেন, দাঁড়ান। ব্যাকব্রাশ চুল। রোগা, বেঁটে; রংটা মাজা। মুখের চামড়ায় খাঁজ পড়েছে, কিন্তু চকচকে। হাতে-বোতাম-আঁটা পাঞ্জাবি, ধুতি পরেন ঢিলে মালকোঁচা দিয়ে। পায়ে সাদা নাগরা। বক্তৃতা দেন দুলে দুলে। ভদ্রলোক শেষ অবধি নাচ দেখেছিলেন, পদক দেবে বলেছিলেন। উদ্যোক্তারা আর দ্বিতীয় শো নামায়নি। ধীরাও [illegible]ক পায়নি।

অনুষ্ঠান-পত্র খুঁজে বার ক'রে ধীরা টেলিফোনওয়ালা এক বন্ধুর বাড়ি গেল। সেখানে গাইড দেখে ধীরা রায়বাহাদুরের ঠিকানা, ফোন-নম্বর ঠিক ক'রে নিল। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই পাবলিক টেলিফোন থেকে একেবারে ফোন।

বেলা সাড়ে আটটা। ড্রইং-রুমে রায়বাহাদুর সবেমাত্র খবরের কাগজ পড়া শেষ করেছেন। টেলিফোন বেজে উঠলো লাগোয়া ছোট ঘরে। তাঁর সেক্রেটারি দুজন। বাড়িতে যে সকালে বিকেলে হাজির থাকে, দুপুরে সে ছুটি পায়। লোকটি এসে জানালো—

"একটি মেয়ে ফোন করছে। নাম বলছে না। আপনার সঙ্গে নাকি জরুরী দরকার।"

"মেয়ে? অফিসে দেখা করবে।"

—রায় বাহাদুর সাধারণতঃ এই ধরণেরই নির্দেশ দেন।

সেক্রেটারি গিয়ে ফোন ধরলো আবার—"হ্যালো, দেখুন, সায়েবের সঙ্গে দরকার থাকলে অফিসে দেখা করবেন।"

ফোনে ভেসে এল—

"অফিসে! ওরে বাবা! যাব কি করে? ঠিকানা জানিনা যে।"

সেক্রেটারি ঠিকানা দিল।

আবার প্রশ্ন—

"কোন তলা?"

"সদর পেরিয়ে এন্‌কোয়ারি। সেখানে শ্লিপ দিলেই হবে।"

"সে কি? শ্লিপ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো? যারা দেখবে, ভাববে কি? আপনার নামটা কি ভাই? আপনার কাছে যাব। আপনাকে সব ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।"

সেক্রেটারি উত্তর করলো—

"আমি অফিসে যাই না। আমার ডিউটি বাড়িতে।"

"আপনি কি করেন?"

"আমি সায়েবের সেক্রেটারি। অফিসের জন্যে আর একজন আছেন।"

"তিনি নিশ্চয় দেখা করাতে পারবেন। তাঁর নামটা জানতে পারি কি? অবিশ্যি, বাধা থাকলে শুনতে চাই না।"

"বাধা আর কি। তাঁর নাম মিস গোমেস।"

"কোথায় বসেন?"

"দোতলায়।"

ধীরার কথা শেষ হল।

দুপুরে সে ডালহৌসি স্কয়ারে গেল। সেজেছিল মন্দ নয়। জর্জেট শাড়ী, জর্জেটের হাতা-বিহীন চওড়া-গলা ব্লাউজ, ভেল-ভেটের চটি, চোখে সামান্য কাজল, কানে লম্বা দুল, গলায় সরু হার, রিষ্ট-ওয়াচ বাঁ-কব্জিতে, ডান হাতে ভ্যানিটি ব্যাগের সঙ্গে একখানা ফটোর য়্যালবাম।

রায় বাহাদুরের অফিসে গিয়ে দোতলায় উঠে ধীরা মিস গোমেসের ঘর খুঁজে নিল। পাশেই রায় বাহাদুরের খাস কামরা। মিস গোমেস তার স্লিপ নিলো। শুনলো, সকালে সেক্রেটারির সঙ্গে কথা হয়েছে ফোনে। য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট সারা দিনে যে কোনও সময়। ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতরে লাগানো আয়নায় চুলটা দেখে নিয়ে মিস গোমেস লিপষ্টিক ঘষতে লাগলো ঠোঁটে।

"প্লিজ, মিস গোমেস। আই হ্যাভ য়্যানাদার য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট উইথ দা মেয়র অব ক্যালকাটা।"

মেয়রের সঙ্গে যার দেখা করবার কথা আছে, সে বাজে আগন্তুক নয়। মিস গোমেসের রূপচর্চা বন্ধ হল। ছোট দরজা ঠেলে সে ঢুকলো গিয়ে রায় বাহাদুরের কামরায়। ফিরেও এল তাড়াতাড়ি।

ধীরাকে ডেকেছেন রায় বাহাদুর। সে ঘুরে দাঁড়াতে মিস গোমেস আপ্যায়িত করলো—

"নীড নট গো আউট। গো দিস ওয়ে।"

ভেতরের দরজা দিয়েই ধীরা হাজির হল রায় বাহাদুরের সামনে।

"নমস্কার। চিনতে পারছেন না বোধ হয়।"

রায় বাহাদুর মন হাতড়াতে লাগলেন।

ধীরাও তাঁকে খুঁটিয়ে দেখে নিল। একেবারে সায়েব। অফিসে আলাদা বেশ।

"খেয়ালে আসছে না নিশ্চয়। এই ছবিটা দেখুন" ব'লে ধীরা য়্যালবামখানা খুলে টেবিলের ওপর এগিয়ে দিল।

"এতো আমার ছবি দেখছি। আর, আপনার। আপনার মত······

"না, না। আপনি কেন। তুমি। আপনার মুখে আপনি শুনলে লজ্জা পাব খুব, অন্যায়ও হবে। আপনার পাশে আমি। ছবির পেছনে লেখা আছে সব-কিছু।"

রায় বাহাদুর ওল্টালেন, পড়লেন।

ধীরা ঠায় চেয়ে রইলো।

য়্যালবাম বন্ধ ক'রে রায় বাহাদুর বললেন—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়ছে বটে।"

"আমি এসেছি শুধু অটোগ্রাফ নিতে। আপনি ছবির নিচে নিজের নামটা লিখে দিন। আমি বাঁধিয়ে রাখবো।"

"বেশ, ব'সো।"

ধীরা বসলো। ছবিখানা বার করবার জন্যে রায় বাহাদুর আবার য়্যালবাম খুললেন।

ধীরা ঘরের চারদিক দেখতে লাগলো, আর মাঝে মাঝে আড়-চোখের নজর চালাতে শুরু করলো রায় বাহাদুরের ওপর। তাঁর চিবুকটা নিচ-মুখো হতেই ধীরা নিবিষ্ট মনোযোগ দিল দেওয়ালে টাঙানো মানচিত্রের ওপর। ফাউন্টেনপেন তুললেন রায় বাহাদুর। কিন্তু, চোখ-জোড়া তাঁর এঁটে গিয়েছিল য়্যালবামে।

কয়েকটা নাচের পোজ ছাড়া বিশেষ বিশেষ ধরণের আরও অনেক ফটোগ্রাফ ছিল য়্যালবামের মধ্যে। একখানায় ধীরা সাঁতারের কষ্টিউম পরা—কাঁধের ওপর দিয়ে বড় তোয়ালে ঝোলানো, আর একখানায় জিমনাষ্টিকের ভঙ্গিতে সে রিং ধ'রে দোল খাচ্ছে। উল্টিয়ে উল্টিয়ে দেখে নিজের ছবিতে নিচ-বরাবর রায় বাহাদুর নাম সই করলেন।

য়্যালবাম ফেরত নিয়ে ধীরা যেন আকাশ থেকে পড়লো—

"ওমা! শুধু কাঠখোট্টা দস্তখত? একটা কিছু থাকবে তো সঙ্গে।"

"এখন অত মাথায় আসছে না।"

"তাহলে এটা রেখে যাই। আর একদিন নিয়ে যাব।"

"বেশ।"

ধীরা বেরিয়ে গেল। রায় বাহাদুর য়্যালবামখানা খুললেন। সুন্দর স্বাস্থ্য। দৌড়, লাফানো, সাইকেল চালানো, সাঁতার,

জিমন্যাষ্টিক, নাচ-গান—সব জানে। ঠিকানাটা কি? য়্যালবামের গোড়াতেই লেখা—ধীরা মুখার্জি, বি-এ। তাহলে লেখাপড়াও করেছে। বয়েস? বাইশ-তেইশ, বড়জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। রায় বাহাদুর ভাবতে লাগলেন, "কুমারী মেয়েদের বয়েস ধরা যায় না। ওর বছর পঁচিশেকই হবে। আমার একষট্টি। হারুর তিরিশ।"

ধীরার বয়েস আন্দাজ করতে গিয়ে বড় ছেলের কথাও স্মরণ হল রায় বাহাদুরের।

পরের দিন সকালে গোটা নয়েকের সময় আবার ফোন। কোনও ভনিতা না-করেই ধীরা বললো,

"আমি ধীরা মুখার্জি। আমার নাম শুনলে রায় বাহাদুর বুঝতে পারবেন।"

রায় বাহাদুর টেলিফোন ধরলেন নিজের টেবিলে :

সকাল বেলা আপনাকে বিরক্ত করলাম।"—ধীরা মাপ চাইলো।

"না। বিরক্ত হব কেন?"

টুকরো হাসি মিশিয়ে ধীরা বললো,

"আপনি কাজের মানুষ। সব সময় চিন্তা নিয়ে, দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।"

"তাতে কি হয়েছে?"

রায় বাহাদুরের গলায় ছিল আস্কারার আমেজ

"য়্যালবামটা আনতে যাব আজ?"

"এসো।"

"লেখা হয়েছে?

"না। এখনও লিখে উঠতে পারিনি।"

"নিশ্চয় ভুলে গেছেন।"

"এসো তো।"

"আচ্ছা। ছাড়ছি তাহলে। টেলিফোনে আপনার গলাটা ভারী সুন্দর লাগছে।"

রায় বাহাদুর জবাব দেন না আর। ধীরা কথা বাড়ায় না। টেলিফোনটা নামাবার মুখে রায় বাহাদুরের কানে আসে, “চমৎকার লোক।”

* * *

দুপুরে এসে ধীরা মিস গোমেসের মারফৎ খবর পাঠালো। সঙ্গে সঙ্গে ডাকও পড়লো।

ধীরা বসলো চেয়ারে।

য়্যালবামখানা রায় বাহাদুরের সামনে রয়েছে।

“কি ? লিখেছেন ?”

ধীরার প্রশ্নে হাসির ঝলক। উজ্জ্বল জোড়া চোখ কৌতুকে ভরা।

“না। এখন লাঞ্চের সময়। খেয়ে হাত দেবো ভাবছি।”

“তাহলে আমি যাই।”

“কি বিপদ। যাবে কেন। তুমিও কিছু খাও।”

“আবার খাওয়ার নেমন্তন্ন ! বাড়িতে না-খেলে মা বকবেন।”

“এক-আধদিন এরকম বেনিয়মে দোষ হবে না। বল, কি খাবে ? ভাত, না পাঁউরু ।”

“আপনি ?”

“আমি দুপুরে ভাত খাই, মানে, চিকেন-রোষ্ট আর ফিশ-কারি, না-হয় ফাউল-কারি আ ফিশ-ফ্রাই। সঙ্গে রাইস। রাত্তিরে ডিনারে লুচি।”

“আঃ। আমিও দুপুরে ভাত, রাত্তিরে পরোটা।”

কথার মধ্যেই খানসামা নিয়ে এল রায় বাহাদুরের লাঞ্চ।

তিনি আদেশ করলেন, “ওঁর এক আদমিকা।”

ঘরের কোণে ছোট টেবিলে খাবার ব্যবস্থা। রায় বাহাদুর বেল টিপলেন। বেয়ারা আসতে তাকে দুজনের মত ক’রে টেবিলটা সাজাতে নির্দেশ দিলেন।

তারপর খাওয়া।

ফিঙ্গার-বাউলে আঙুল ডোবাতে ডোবাতে ধীরা মন্তব্য করলো—

"ধুতি-পাঞ্জাবিতে আপনাকে মনে হয় একদম ছেলেমানুষ। স্যুট প'রে কিন্তু পাক্কা সায়েব। এরকম আর কাউকে চোখে পড়েনি।"

একটু চুপ করে থেকে রায় বাহাদুর শুধোলেন—

"সত্যি ছেলেমানুষ মনে হয়?"

"ধাপ্পা দিয়ে আমার লাভ?"

চেয়ারের হাতল থেকে তোয়ালে তুলে নিয়ে রায় বাহাদুর হাত মুছলেন, মুখ মুছলেন।

ধীরার কথা এগুতে লাগলো—

"স্বাস্থ্যটা আপনার বেশ ভাল। এক্সারসাইজ করেন বোধ হয়।"

"না, ছোট বয়েসে করতাম।"

"এক্সারসাইজের কি কোনও বয়েস আছে?"

"এখন কি আর করা চলে?"

"খুব চলে।"

"সময় পাওয়া কঠিন।"

"মোটেই কঠিন নয়।"

"কি যে বল! কিছুতেই পারবো না।"

"নিশ্চয় পারবেন। এত কাজের সময় মেলে, আর, দিনে বড়জোর আধঘণ্টা কি পনের মিনিট এক্সারসাইজ করার ফুরসৎ হবে না? ইচ্ছেটা দরকার সবার আগে। ইচ্ছে পূরণের রাস্তা আপনা-আপনি এসে যায়। জানেন তো নেপোলিয়নের গল্প।"

রায় বাহাদুর জেরার জবাব দিলেন না।

মিস গোমেসের ঘর যে পাশে, তার উল্টো দিককার একটা দরজা খুললো। ঢুকলো এসে এক যুবক। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলো ধীরার দিকে।"

"ও আছে, থাক।"

রায় বাহাদুরের কথায় আগন্তুক তার বক্তব্য জানালো—সিটি ইনভেষ্টর্সের মিটিং ডাকা দরকার, সামনের মাসে দিন ঠিক করবে কিনা। ড্রয়ার থেকে ডায়ারি বার ক'রে তার হাতে তুলে দিতে দিতে রায় বাহাদুর বললেন—

"ডাকো সামনের মাসে। আজই তারিখ বেছে নিও।"

যুবকটি চ'লে যেতে ধীরা তার পরিচয় পেলো। রায় বাহাদুরের একমাত্র সন্তান। নাম হরেন্দ্রলাল। বাপের সমস্ত কোম্পানিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ধীরা জের টানলো—

"বাপের মত হবে আর কি।"

"ব্যবসা বোঝে বেশ। বিলেতে ছিল তিন বছর। ফিরেছে বছর তুই। ঘরে বউ এনেছি সবে।"

রায় বাহাদুর থামেন একটু।

অন্যমনস্ক ধীরার মাথায় চিন্তার স্রোত ব'য়ে যায়, "হরেন্দ্রলাল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ওর হাতেই তাহলে সব। আমার থেকে সামান্য বড় হবে।"

রায় বাহাদুর আবার শুরু করেন—

"ছেলেটাকে নিয়ে একটা শুধু বিপদ। খরচের হাত বড় টান।"

উৎকর্ণ ধীরা চট ক'রে ব'লে বসলো,

"আলাপ হল না।"

"হবে, হবে।"

হরেন্দ্রলাল আবার এল। ডায়ারি ফেরত দিয়ে যাচ্ছিল দরজার দিকে। রায়বাহাদুর ডাকলেন—

"দাঁড়াও, হারু।"

হরেন্দ্রলাল দাঁড়িয়ে পড়লো।

"মেয়েটিকে চেনো?"

"নাতো।"

"খুব গুণী, খুব সোশ্যাল। ধীরা—আমার ছেলে হরেন্দ্রলাল, আর, এ হচ্ছে ধীরা মুখার্জি।"

চেয়ার ছেড়ে হাসি মুখে হাত জোড় ক'রে ধীরা নমস্কার জানালো। প্রতি-নমস্কারের পর হরেন্দ্রলাল বেরিয়ে গেল।

ধীরাও ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিল।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন,

"যাচ্ছ? এরই মধ্যে?"

"হ্যাঁ, আপনি কাজ করুন। য়্যালবামটা না হয় কালই নেবো।"

এমন কোনও তাড়া ছিল না ধীরার। কিন্তু, হ্যাংলাপনা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

"আচ্ছা, কালই নিও। লিখে রাখবো।"

রায়বাহাদুরের কথায় জবাব দেওয়ার কিছু ছিল না। ধীরা এগুলো দরজার দিকে। হঠাৎ তার হাত থেকে রুমালখানা পড়ে গেল। ঝুঁকে সেটা তুলতে গিয়ে কাঁধের আঁচলটা মাটিতে লোটালো। রুমাল কুড়িয়ে আঁচলটা ঠিক ক'রে ধীরা মিস গোমেসের খিড়কি খুললো।

একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে রায় বাহাদুর য়্যালবামখানা টেনে নিলেন নিজের সামনে।

ছয়

সেক্রেটারি আসে আটটায়। তার আগে টেলিফোনের ছুটো লাইনের একটা দেওয়া থাকে রায় বাহাদুরের ড্রইংরুমে, আর একটা হরেন্দ্রলালের ঘরে।

ফোন বেজে উঠতে রায় বাহাদুর রিসিভারটা তুললেন—

"কে?"

"বলুন তো?"

"ধীরা।"

"যাক। এক্সারসাইজ করছিলেন বুঝি?"

"না। য়্যালবামটা নিতে এস ছুপুরে।"

"তাতো বুঝলাম। কিন্তু এক্সারসাইজ ধরেননি কেন?"

"একেবারেই সময় নেই। এই তো কতগুলো কাগজ-পত্তর দেখছিলাম।"

"কাজ কমিয়ে এক, নিজের দিকে নজর দিন তো।"

"সহজ নয়। যতটা পারি, দিয়ে থাকি।"

"ওসবে হবে না। কড়াকড়ি চাই।"

"বৌমা, বেয়ারা, খানসামা—সবাই সামলায় আমাকে।"

"তাতে হলে আর রক্ষে ছিল না।"

"উপায় কি।"

"আচ্ছা, উপায় বেরুবে ঠিক। য়্যালবামের জন্যে যাচ্ছি চারটেয়।"

"কেন? লাঞ্চের সময় এসো।"

"আমার একটা নেমন্তন্ন রয়েছে ছুপুরে।"

"বাতিল কর।"

"ছু-হপ্তা আগে কথা দিয়েছি।"

"আচ্ছা, তাহলে খাওয়া সেরেই এস।"

ধীরা এল ঠিক চারটেয়।

মুখপাতের ভদ্রতায় রায়বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন—

"কিরকম ভোজ হল?"

"ভোজ আবার কিসের। একেবারে বাঙালী-খানা।"

"বটে?"

"তা ছাড়া আর কি। শুক্তো, সর্ষে দিয়ে ডাঁটা-চচ্চড়ি, তপসে মাছ ভাজা, ইলিশ-পাতুড়ি, রুইমাছের কালিয়া, চিংড়ির মালাই-কারি, ডিমের অম্বল।"

"এ সব খাওয়া ভুলে গিয়েছি। বাবুর্চিরা লুচিটাও ভাজে বেয়াড়া। কতবার কত হোটেলে গিয়ে চেষ্টা করেছি। কোথাও খাঁটি বাঙালী-খাবার পাইনি।"

"বাড়িতে বৌমা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন।"

"বৌমা বিলেতে মানুষ। দিশী রান্না জানে না।"

"দিশী ডাল-ভাত-মাছ-তরকারি খেতে ইচ্ছে করে আপনার?"

"তা আর বলতে।"

"রোববার দুপুরে বাড়িতেই লাঞ্চের ব্যবস্থা তো?"

"হ্যাঁ। বাবুর্চি, বৌমা মিলে লাঞ্চে দশটা কোর্শ করবে, ডিনারে গোটা পনেরো। আমি একটু একটু চেখে দেখি। তাতেই পেট ভ'রে যায়।"

"যাকগে। ফটোয় লেখা হয়েছে?"

"একটু বস। এখুনই হয়ে যাবে।"

"এখুনই? এক ঘণ্টায়ও হবে না। বাড়ি নিয়ে যান সামনের রোববার ভেবে চিন্তে লিখবেন। আমি মনে করিয়ে দোবো।"

"তাই দিও।"

"যাই তাহলে।"

"পালাবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন। চা খাও।"

"চা? যা খেয়েছি, গলা অবধি ভর্তি রয়েছে।"

"তা হলে কোল্ড ড্রিঙ্ক আসুক।"

লেমনেড এল। আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে ধীরা গ্লাসের আধা-আধি খালি করলো। মুখও কামাই যাচ্ছিল না।

"নিজের দিকটা খেয়াল রাখবেন। কাল আপনাকে খানিকটা কাহিল দেখেছি। আজ আরও বেশি।"

রায় বাহাদুর বললেন--

"তোমার চোখ তো কম নয়। বাড়িতে, অফিসে, যেটা কেউ বুঝতে পারেনি, তুমি সেটা তো বেশ ধরেছো।"

"কার গরজ পড়েছে যে অত খুঁটিয়ে নজর করবে।"

"হুঁ। শরীর একটু খারাপ হবারই কথা। দুটো রাত ঘুমিয়েছি বড্ড কম। আজ ভাবছি ওষুধ খাবো।"

"অমন কাজটি করবেন না। ঘুমের ওষুধ সর্বনেশে জিনিস।"

"অল্পে ক্ষতি হবে না। একটার বেশি দুটো ট্যাবলেট মুখে ফেলছি না।"

"ট্যাবলেটে কাজের কাজ হবে না, দেখবেন। আসল জিনিস —ব্যায়াম। এক্সারসাইজ করলে রক্ত চলাচল বাড়ে, দেহের যত বিষ বেরিয়ে আসে ঘাম দিয়ে, ক্ষিধে পায়, মাথা চলে ভাল, ভেতরকার ক্লান্তিতে ঘুম আসে।"

"তা হবে।"

"তার মানে, আমি বাজে বকছি?"

ধীরার গলায় অভিমানের রেশ পেয়ে রায় বাহাদুর তাকে প্রবোধ দিলেন—

"আহা, চটছো কেন?"

ধীরা চটলো না। উপরন্তু টেনে আনলো নতুন প্রসঙ্গ—

"আচ্ছা, নাচ-গান ভাল লাগে আপনার?"

"গান মন্দ লাগে না। নাচটা আমি ভালবাসি।"

"তা, ভাল যত শো হয়, দেখতে গেলেই পারেন?"

"অত সহজ?"

"মানে, এই নিউ এম্পায়ারে টেম্পায়ারে। ও সব জায়গায় ড্রেস সার্কেল, বক্সের টিকেট কয়েকদিন আগে বুক করলেই হল।"

"আরে বাপু, অত ফিকিরের সুযোগ কোথা। অফিসের কাজ মিটতেই রাত হয়ে যায়। তারপর বাড়ি গিয়ে হাত মুখ ধুতে ধুতে যার নাম আটটা সাড়ে-আটটা। ডিনার মেটে সাড়ে নটায়। তখন আর যাওয়া চলে? বল? বিলিতি ম্যাগাজিনের ছবি দেখি। চোখ জুড়ে এলে ঘুমিয়ে পড়ি।"

"বেশ করেন। কিন্তু, মাঝে মাঝে একটু বাইরে বেরুনো দরকার। এভাবে নিজের দেহটাকে নষ্ট করা চলবে না।"

"তাই নাকি?"

"তাই না কি! সত্যি তো! জোর করবার কিছু নেই। বাচ্ছা ছেলে হলে ধমক দেওয়া চলে, কান মলা যায়।"

"তা ঠিক।"

ধীরার কথাগুলো ভালই লাগছিল রায় বাহাদুরের। নিছক দু-দিনের চেনা। কত লোকই তো আসে। কেউ ব্যবসার কাজে, কেউ সুবিধে আদায় করবার জন্যে। কেউ ধর্ণা দেয় কিছু সাহায্য পাবার আশায়, কেউ চায় চাঁদা। চাকরির উমেদাররা মাথা খেয়ে ফেলে অনবরত। কিন্তু ধীরা প্রার্থী নয়। ওর বৈশিষ্ট্য আছে। মনটা বড় সরল। যা খেয়াল হয়, স্পষ্ট ক'রে বলে। মোসায়েবির ধার ধারে না। সামনের ফাইলগুলো নাড়া-চাড়া করতে করতে রায় বাহাদুর এই সব ভাবতে লাগলেন।

তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়লো ধীরার আওয়াজে—"কি? একেবারে চুপ করে গেলেন যে! স্বাস্থ্যের দিকে নজর-না দিলে, শরীরের যত্ন না-নিলে, শুনছি না আমি।"

"যদি না-নিই ?"

"তাহলে, তাহলে·······তাহলে কি আর করবো। য়্যালবামখানা পেলে আর এমুখো হব না।"

—ধীরার মুখটা কালো হয়ে আসে। তার দিকে চেয়ে রায়বাহাদুর মৃদু হাসেন।

ধীরা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

কদিন আর ধীরার সাড়া-শব্দ মিললো না। একেবারে রবিবার সকালে রায়বাহাদুর টেলিফোন পেলেন।

ধীরা জানালো, দুপুরের সমস্ত খাবার সে নিজের হাতে তৈরি ক'রে পাঠাচ্ছে।

রায়বাহাদুর অবাক হলেন, খুশিও হলেন। তাঁর রুচি-অরুচি নিয়ে মাথা ঘামাতেন হারুর মা। তিনি মারা যাওয়ার পর থেকে খাওয়ার ব্যাপারে একটানা পরাধীনতা চলছে। তবু, তবু···· মেয়েটাতো বড় লজ্জায় ফেললো।

রিসিভার হাতে নিয়ে এত কথা মনে এল। রায় বাহাদুর অনুযোগ করলেন,

"হাঙ্গামার দরকার কি ছিল ?"

'দরকার-অদরকার বুঝবো আমি। ঠিক কটায় খাবেন, শুনতে চাই। ঘড়ি ধ'রে নিয়ে যাবে আমার লোক।"

"তোমার ফোন-নম্বরটা দাও। একটু পরে রিং করবো।"

"আমার ফোন নেই। বাইরে থেকে কথা বলছি।"

"ও। তাহলে ঠিক একটায় পঁওছালেই চলবে। তোমার ঠিকানাটাও লিখে নি-ই। গাড়ি পাঠাবো বারটার সময়।"

"গাড়ি দিয়ে কি হবে? আমার ছোট ভাই নিয়ে যাবে। দারোয়ান-বেয়ারারা যেন তাকে না-আটকায়।"

ধীরা মাকে দিয়ে শুক্তো, পোস্ত-চচ্চড়ি, ইলিশ মাছ পাতুড়ি, পার্সে

মাছ ভাজা, রুই মাছের কালিয়া, গলদা চিংড়ির কারি, ডি মর অম্বল আর সেরা চালের ভাত রাঁধিয়ে নতুন বড় একটা টিফিন-কেরিয়ারে সাজালো। ঘড়ি দেখে, সওয়া বারটায় বাবাকে পাঠালো ট্যাক্সি ডাকবার জন্যে। গাড়ি এলে নীরেনকে নিয়ে টিফিন-কেরিয়ার সমেত উঠলো তাতে। তার পকেটে পুরে দিল নিজের নাম-লেখা স্লিপ।

নীরেনের তালিমও চলতে লাগলো। বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে তাকে নামাবে ধীরা। সেখান থেকে নীরেন এগিয়ে যাবে। বাড়ির গেটে দাবোয়ানের হাতে স্লিপ দেবে। তারপর কেউ এসে টিফিন-কেরিয়ারটা নিয়ে গেলে সে অপেক্ষা করবে। টিফিন কেরিয়ার তখনই ফেরত দিলে ভাল, তা না-হলে দেরি করবে। তারপর সাবধানে ফিরবে।

কলকাতার অধিকাংশ পথ-ঘাট ধীরার জানা। আগে রাস্তা, তারপরে নির্দিষ্ট নম্বরের বাড়ি। গেট পেছনে ফেলে ট্যাক্সি এগিয়ে গেল। গেটটা দেখিয়ে ধীরা নীরেনকে শেষবারের মত শেখালো—

"ঐ ভেতরে দাবোয়ান। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবি না। ডাকবি। এলে কাগজের টুকরোটা দিয়ে বলবি, বড় সায়েবের কাছে নিয়ে যাও।"

ট্যাক্সি ঘুরিয়ে, আর একবার বাড়ি দেখিয়ে, একটা বাজতে দশ মিনিট থাকতে ধীরা নীরেনকে রাস্তায় ছাড়লো। তাকে নির্দেশও দিল—

"টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে, কোথাও দেরি না-ক'রে, বাসে চ'ড়ে ফিরবি।"

বেঁকিয়ে ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীরেন এগুলো। তাকে গেটের সামনে হাজির হতে দেখে ধীরা ট্যাক্সিতে ফিরতি পথ ধরলো।

নীরেনের কোনও অসুবিধে হল না। দারোয়ান যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। স্লিপটা হাতে দিতে সে দাঁড়াতে বললো

নীরেনকে। মস্ত বড় বাড়ি। সামনের খালি জায়গায় নানা রকমের ফুলগাছ। নীরেন দেখতে লাগলো।

"চলো। বড়া সাহাব বুলায়ে হৈঁ।"

নীরেন নড়ছে না দেখে দারোয়ান হাতছানি দিল। সে সামনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই এগিয়ে এল কিরকম আলখাল্লা পরা একটা লোক। নীরেনের হাত থেকে টিফিন-কেরিয়ারটা নিয়ে সে চ'লে গেল। রায়বাহাদুর সামনের ঘরেই ছিলেন। বেরিয়ে এসে নীরেনকে ডাকলেন ভেতরে। নীরেন যেতে তাকে গদি-আঁটা চেয়ারে বসালেন। তারপর, নিজে সামনের চেয়ারে ব'সে জিজ্ঞেস করলেন,

"তুমি ধীরার কিরকম ভাই ?"

"নিজের।"

"বেশ, বেশ। দিদি কি করছে ?"

"এসেছিল ট্যাক্সিতে। আমাকে বাড়ি দেখালো।"

"তাই নাকি ? কোথায় পালালো ?"

"না, পালায়নি। একটু পরে ইস্কুলে যাবে।"

"কেমনতর ইস্কুল ? রবিবারেও ছুটি নেই ?"

"নাচ-গানের ইস্কুল। দিদি শনি-রোববার যায় দুপুরে, অন্য দিন সন্ধ্যেয়।"

"কি হয় ইস্কুলে ?"

"আগে নাচ হত শুধু। এখন গানও হয়।"

"দিদি সেখানে কি করে ?"

"দিদি ?"

—ঘাবড়িয়ে যায় নীরেন। শেষে একটু ভেবে জবাব দেয়—

"দিদি আগে শিখতো, আজকাল এমনি যায়।"

"বাবা কোথায় ?'

'বাবা ফেরেননি এখনও।"

"কি করেন তিনি ?"

"হেডমাষ্টার।"

"খুব ভাল। তোমরা কঁটি ভাই-বোন ?"

"দিদি, আমি, দাদা আর মিনু—এই চারজন।"

"বাঃ" ব'লে রায়বাহাত্বর কলিং-বেলের বোতাম টিপলেন।

বেয়ারা এল।

"চট ক'রে ভাল সন্দেশ কিনে আন। বাক্সে প্যাক করা চাই। সের-খানেক। এর টিফিন-কেরিয়ার বাবুর্চির কাছে কিচেনে রয়েছে। সাফ ক'রে তাতে সন্দেশ ভ'রে এখানে এনে রাখ।"

বেয়ারা গেল। রায়বাহাত্বর আবার নীরেনের সঙ্গে আলাপ জুড়লেন—

"কি পড় খোকা ?"

"ক্লাশ ফাইভ-এ।"

"দাদা কি করে ?"

"দাদা কেবল আমাকে মারে, দিদির সঙ্গে ঝগড়া করে।"

"তা নয়। দাদা কি পড়ে ?"

"ক্লাশ টেন-এ।"

রায়বাহাত্বর উঠে তিনটে ফুল ছিঁড়ে আনলেন। নীরেন ভাবলো তিনি চ'লে যাচ্ছেন। তাঁকে ফুল নিয়ে আসতে দেখে সে নিশ্চিন্ত হল। অত বড় ঘরে একলা ব'সে থাকতে হবে ভাবতে গিয়ে তার ভয় করছিল।

ফুল কটা নীরেনের হাতে দিয়ে রায়বাহাত্বর বললেন,

"পকেটে রাখো। উঁহু। ও ভাবে নয়। মাথা বাইরের দিকে। নইলে নষ্ট হয়ে যাবে।"

বেয়ারা টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে এল। নীরেন উঠতে যাচ্ছিল। রায়বাহাত্বর বাধা দিলেন—

"ব'সো। গাড়িতে যাবে।"

নীরেন বসলো বটে, কিন্তু, তার মুখ শুকিয়ে গেছিলো। রায়বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন,

"গাড়িতে ড্রাইভারের সঙ্গে যাবে, ভয় কি? বাড়ির রাস্তা চেনো না?"

নীরেন ঘাড় নাড়লো।

"তবে আর কি।"

কিন্তু নীরেন এবার মুখ খুললো—

"দিদি বকবে।"

রায়বাহাদুর এর মধ্যেই ধীরাকে খানিকটা চিনেছিলেন। ভয়ানক আত্মসম্মান-জ্ঞান মেয়েটির। ভাই গাড়ি চড়লে হয়তো কড়া শাসন করবে। তিনি তাই নিরস্ত হলেন।

নীরেন বেরিয়ে পড়লো হাতে টিফিন-কেরিয়ার ঝুলিয়ে। ধীরার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বাস-ট্রাম চিনে চড়তে শিখেছিল। ফিরলো তাড়াতাড়ি। বাড়িতে এসে তাকে আগাগোড়া সব কিছু বলতে হল। বকুনি খেল খানিকটা। সন্দেশের বাক্স দেখে খুশি হলেন মা। ধীরা ধমকালো—

"না-নিলেই পারতিস। আর, আমি কি করি, বাবা কি করে, অত গল্পের বা দরকার কি ছিল?"

বিরাট বাড়ির বড় সাহেব জিজ্ঞেস করলে যে চুপ করে থাকা যায় না, এটা নীরেন বোঝাতে পারলো না দিদিকে। অন্যায় হয়েছে ভেবে সন্দেশ চাইতেও সাহস হল না তার। চলে যাচ্ছিল। মা ডাকতে ফিরে এল। তিনি হাতে একটা সন্দেশ তুলে দিতে বুঝলো, বড় বেশি খারাপ কাজ করেনি। হাসতে হাসতে সন্দেশটা মুখে পুরে সে গেল খেলতে।

সোমবার সকালেই রায়বাহাদুর ধীরার সাড়া পেলেন।

"কেমন লাগল রান্না?"

"চমৎকার। ভুলবো না জীবনে।"

"বদহজম হয়নি তো?"

"খিদে বেড়ে গিয়েছে।"

"সে কি? তাহলে তো ভাল কথা নয়।"

—ধীরা হাসে বেশ খানিকটা। রায়বাহাদুরও হাসেন। টেলিফোনের আলাপ শেষ হয়ে যায়।

সেদিন লাঞ্চের সময় থেকে রায়বাহাদুর বারবার মিস গোমেসের দরজাটা নজর করছিলেন। দু-একবার মনে হল, খুলছে যেন। নিজের ভুল বুঝে ভাবতে লাগলেন, "নাঃ, কেউ না। আজ হয়তো আসবে। না-ও আসতে পারে। সকালে টেলিফোনে বেশি কিছু বলেনি। গেরস্ত ঘরের মেয়ে। এই ভাবে খাওয়ালো। কিছু চায় না। লোভ নেই। অদ্ভুত সংযম। সাদাসিধে। কোনও মারপ্যাঁচের ধার ধারে না। কিরকম সুন্দর ব্যবহার। সহজে আপনার জন ক'রে নিতে পারে। ওকে একটা কিছু উপহার দেওয়া দরকার। দিলে ভাল হয়, কিন্তু, নেবে কিনা, কে জানে।"

চিন্তার মধ্যেই রায়বাহাদুর য়্যালবামের ফটো ওল্টাচ্ছিলেন। মিস গোমেস কখন এসে দাঁড়িয়েছে, টের পাননি। তার কথায় চমক ভাঙ্গলো।

"সার। ছ্যাট মিস মুখার্জি...."

রায়বাহাদুর বললেন,

"ইয়েস। লেট হার কাম ইন।"

ধীরা এসে ঢুকলো।

"য়্যালবামটা দেখছি হাতের কাছেই রয়েছে। লিখেছেন তো?"

"না, মানে, সত্যিই সময় পাইনি। বড্ড চাপ চলছে কিনা।"

বেশ লজ্জায় প'ড়ে রায়বাহাদুর পুরোনো কৈফিয়ৎ শোনালেন।

ধীরা রেহাই দিল না তাঁকে। ওজরে বিশ্বাস করারও লক্ষণ দেখালো না।

"ইচ্ছে থাকলেই দু-এক মিনিটের অবকাশ মিলতো।"

ধীরার কথা গায়ে না-মেখে রায়বাহাদুর তুললেন খাওয়ার প্রসঙ্গ—

"তুমি তো আচ্ছা মেয়ে যাহোক। আমি ঠাট্টা করে কি বলেছি। তাই নিয়ে একেবারে নেমন্তন্নের রান্না রেঁধে চালান করলে আমার বাড়িতে। তা-ও ভাই-এর হাত দিয়ে।"

"ঠাট্টা আপনি করেননি। মনের অভিলাষ জানিয়েছিলেন নিজের অজানতে। শুনে আমি চুপচাপ থাকতে পারিনি। কদিন ধ'রে খাওয়ার সময় মনে হয়েছে। রোববার ছাড়া দুপুরে বাড়ির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক থাকে না। তাই, নিজের কর্তব্যও ঠিক ক'রে ফেললাম। না-পাঠালে ভাল লাগতো না একদম।"

"তবু, শুধু শুধু অত ঝঞ্ঝাট।"

"শুনুন। আপনি পুরুষ, আমি মেয়ে। আপনাতে আমাতে প্রভেদ থাকবেই। সামান্য পরিচয়। দেখা হলে ভদ্রতা করেন। চোখের বাইরে গেলে বেমালুম ভুলে যান। ওরকমটা পারলে বেঁচে যেতাম।"

রায়বাহাদুর নির্বাক রইলেন খানিকক্ষণ। ধীরাও তাই। ঘরে এসে ঢুকলো মিস গোমেস।

"মিঃ রে ফ্রম দি মিলস্, সার।"

"আস্ক হিম টু কাম টোমরো।"

রায়বাহাদুরকে বিরক্ত দেখে লোকটিকে পরদিন কখন আসতে বলবে, তা জিজ্ঞেস করার সাহস হল না মিস গোমেসের। সে তাড়াতাড়ি স'রে পড়লো।

রায়বাহাদুর খানিকটা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—

"যত বাজে ঝামেলা।"

"ওর কি দোষ।"

"না, তা নয়। তবে ......"

রায় বাহাদুর থামলেন।

ধীরা অমনি ভাবলেশহীন প্রশ্ন করলো,—

"কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন……"

"বলছিলাম, মানে, বলছিলাম যে, তুমি বড়লোক নও। রেঁধে অত রকমের জিনিস পাঠালে। আমার সঙ্গে তোমার জানাশোনা একেবারেই নতুন। তাই, খেতে খেতে খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম।"

"লজ্জা পেয়ে সব ফেলে দিয়েছেন, কেমন ?"

"ছিঃ! ফেলবো কেন। সমস্ত গিলেছি পেটুকের মত। পেট আঁই-টাঁই করছিল।"

"ফেলে দেননি—এবার থেকে দেবেন। আমিও প্রত্যেক রোববার পাঠাবো। এখানে আর আসছি না।"

ধীরা উঠে সিধে বেরিয়ে গেল।

"শোনো, শোনো" ব'লে ডাকলেন রায় বাহাদুর। সে সাড়া দিল না। হতভম্ব রায় বাহাদুর কলিং-বেলের স্যুইচ টিপে ধরলেন। একটানা আওয়াজে তটস্থ হয়ে বেয়ারা এল দৌড়োতে দৌড়োতে।

কুর্ণিস ক'রে দাঁড়ালো।

রায় বাহাদুর হোঁচট-খাওয়া ফরমাস করলেন তাকে—

"অভী·· হাঁ···দেখো···ঠাণ্ডা পানি····নঁহী····অভী কফী····কফী লে আও····ব্ল্যাক কফী।"

সাত

বাবার সঙ্গে আলোচনা করছিল ধীরা। রমেন-নীরেন-মিনু স্কুলে। মা গড়িয়ে নিচ্ছিলেন।

রাখাল মুখুজ্জের হাতে কলম, সামনে কাগজ। তিনি ব'সে। কনুইতে ভর দিয়ে ধীরা আধশোয়া। সে বুঝিয়ে দিয়ে, ব্যাখ্যা ক'রে সংক্ষেপে লেখাচ্ছিল—

"বাড়িখানা বালিগঞ্জে হলেই ভাল। তা নইলে, টালিগঞ্জ। বালিগঞ্জে অবাঙালী পাড়া আছে কয়েকটা। খোঁজ নেবে।"

রাখালবাবু বললেন,

"আচ্ছা।"

"কই? লিখলে না তো! টুকে নাও সঙ্গে সঙ্গে। পরে সব উল্টো-পাল্টা ক'রে ফেলবে।"

মেয়ের কথামত লিখে রাখালবাবু চোখ তুললেন।

"হ্যাঁ। বাড়িটার সামনে থাকবে ছোট বাগান, নয়তো খালি জমি খানিকটা। রাস্তায় বা গলিতে আলাদা আলাদা ছুটো দরজা হলে ভাল। ছুটো গলির মাঝখানে পেলে জোড়া সদর ক'রে নেওয়া যাবে—একটা দিয়ে খিড়কির কাজ চলবে। বাড়িটা দোতলা হওয়া দরকার। না-মিললে উপায় নেই। দোতলা হলে ওপরে নিচে বাথরুম লাগবে। পাম্প থাকলে সুবিধে। নিচতলায় তিনখানা ঘর রাখতে হবে আমার জন্যে। ওপরে তোমাদেরও দরকার করবে তিনখানা। নিচতলায় প্রত্যেকটা জানলায় সার্শি-খড়খড়ি চাই।"

দ্রুত কলম চালাতে চালাতে রাখাল মুখুজ্জে হাঁফিয়ে পড়লেন। লেখার শেষে একটু প্রতিবাদও করলেন,

"একেবারে মেল। হাতে খিল ধ'রে যাচ্ছে।"

"আর বেশি নয়। শুধু কটা ফার্নিচার। নাও, ফর্দ ধর।"

রাখালবাবু মেয়ের আদেশে আবার কলম উঁচোলেন। বেতের মোড়া, টেবিল, পর্দার কাপড়, চায়ের সেট, কফীর সেট, প্লেট, গ্লাস, ড্রেসিং টেবিল, চারখানা পাখা, দুটো টেব্‌ল-ল্যাম্প, রেফ্রিজারেটর, ইলেক্‌ট্রিক কুকার........

কলিং-বেল পর্যন্ত পঁওছাতে পঁওছাতে রাখাল মুখুজ্জের কপাল কোঁচকালো, চোখ টান হল। তারপর তিনি হাত তুলে একেবারে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন—

"কি সব্বনাশ! এত সব কিনতে হবে নাকি?"

"আরে বাপু, তোমাকে কিনতে ফরমাইস করছে কে? তুমি শুধু বাড়িটা দেখবে, আর, পাঁচটা দোকানে জিনিসগুলোর দাম যাচাই করবে।"

মেয়ের আশ্বাস শুনেও রাখাল মুখুজ্জে স্বস্তি পেলেন না। পাল্টা প্রশ্ন করলেন—

"বাড়ি বদল, এত সব দামী আসবাব, টেলিফোন নিবি। পাঁচ হাজারেও নামবে কিনা, সন্দেহ।"

ধীরা বললো,

"টাকার ভাবনা তোমার নয়, আমার। হিসেবটা ঠিক ক'রে দেখে শুনে রাখো। টাকা পেতে খুব দেরি হবে না। কিন্তু, সব ব্যবস্থা ঠিক থাকা চাই। টাকা হাতে এলেই নতুন বাড়িতে যেতে হবে। গোছগাছ করতে হবে। বাকী থাকবে শুধু টেলিফোনটা। ধর না, পাখা টানাতে, কলিং-বেল লাগাতেই তো একটা দিন কেটে যাবে। ঘর সাজাতে দিন দুই।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। বুঝেছি। দেখবো অখন ঘুরে।"

—বিতর্কে ছেদ টেনে রাখাল মুখুজ্জে উঠে পড়লেন। হাতের ওপর মাথা রেখে, ডান পা বাঁ হাঁটুতে তুলে ধীরা চোখ বুজলো।

এবার চিন্তা—টাকা চাই।—ধীরার মাথা খেলতে লাগলো—

"বীরেনকুমার? ছোঃ! ও দেবে! ওকে কে দেয় ঠিক নেই।

পূর্ণ? ঠেলেঠুলে দু-একশোয় উঠবে। একটা পার্কার পেনের জন্যে দিন পনের আসেনি। শেষে হাজির হল পুরোনো মডেলের কলম নিয়ে। ওর ওপর নির্ভর করা যাবে না। দেবু? দেবু পারে ইচ্ছে করলে। বড়লোকের ছেলে। যখন আসে, এটা-সেটা সঙ্গে আনে। ছোট-খাট অনেক জিনিস দিয়েছে। তবে, বেশি টাকা নিয়ে অসুবিধেয় পড়তে পারে। বাপ রয়েছে। হ্যাঁ। টাকা ছাড়বার মত লোক হল বুড়োটা। সবে জালে আটকাচ্ছে। দোটানায় আছে খানিকটা। ওর কাছে পাঁচ-সাত হাজার কিছুই নয়। কারবারের টাকা ছাড়া নিজের তবিলে কত আছে, ঠিক নেই। কিন্তু ওর সামনে কথা পাড়া শক্ত।”

ধীরা এবার ডান হাতের ওপর মাথা রেখে কাত হল। মনে মনে চুলচেরা বিচার শুরু করলো—

“বুড়োটা ঘায়েল হয়ে এসেছে। তবু, একেবারেই টাকা চেয়ে বসবো! গোড়াতে এতটা খেলো হওয়া কি ভাল? কি মনে করবে? যদি এড়িয়ে যায়? ব্যবসাদাররা কিপ্টে হয়। টাকার কথা গায়ে না-মাখলেই তো বিপদ। তাহলে একেবারে ফসকিয়ে যাবে, ভবিষ্যতের পথ শুদ্ধু বন্ধ হবে। এত অল্পদিনের পরিচয়ে অত টাকার কথা তুললে ভাববে, ওর জন্যেই গায়ে প'ড়ে খাতির জমানো। কত রকম লোকের সঙ্গে দহরম-মহরম। মানুষ চেনে। অথচ, দেবু আর বুড়ো—এরা ছাড়া চেনাশোনার মধ্যে আর কোনও শাঁসালো মক্কেল নেই। দুটোকে দিয়েই চেষ্টা চালাতে হবে। কাউকে হাতছাড়া করলে চলবে না। বুড়োর বেলা বেশ হুঁশিয়ার থাকতে হবে। দেবুটা একদম ক্যাবলা। ওকে নিয়ে ভাবনা নেই……।”

পরিকল্পনা ঠিক হওয়ার আগেই ধীরার তন্দ্রা আসে। পরিবেশ পালটিয়ে যায়। বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে সে শুয়ে আছে। সামনে সার দিয়ে ব'সে রায়বাহাদুর, দেবনারায়ণ, পূর্ণবিকাশ। তাদের পেছনে বীরেনকুমার দাঁড়িয়ে রয়েছে।……পট বদলায়।

....বিরাট বাড়ি—ঠিক যেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। সিংহাসনের মত উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে ব'সে আছে ধীরা। সিঁড়ি বেয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে লোকের ভীড়। হাজারো মানুষের মধ্যে নজরে পড়লো রায়বাহাদুরের মুখ। তারপর দেবনারায়ণের। পূর্ণবিকাশের মাথাটা যেন ভীড়ের মধ্যে উঁচিয়ে উঠলো একবার। বীরেনকুমার নেই এর মধ্যে। বাবা নেই, মা নেই। রমেন-নীরেন-মিনুও নেই।

....আবার পট পরিবর্তন।....ধীরা পাহাড়ের মাথায়। সামনে সমুদ্র। পাহাড়ের পায়ে হুস হুস ক'রে ঢেউ এসে পড়ছে একটার পর একটা। সমুদ্র পার হয়ে যাওয়া....। ধীরা শূন্যে উঠতে লাগলো। ওড়া এত সহজ! হাত-পা নাড়তে হচ্ছে না। শুধু ইচ্ছে। ইচ্ছে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠছে। আরও ওপরে উঠতে চায় ধীরা। মেঘ ছাড়িয়ে চলে গেল সে। নিচে পেঁজা তূলোর মত মেঘের রাশি। ধীরা ডাইনে বাঁয়ে ঘুরছে, সামনে এগুচ্ছে শুধু খুশিতে। এবার নামতে হবে। প'ড়ে যাবে নাতো! সত্যি বুঝি প'ড়ে গেল।

সারা দেহে বেশ ঝাঁকুনি লাগে, ঘুম ভেঙে যায় ধীরার।

কাত হয়েই আছে সে। সামনে দেওয়াল। পাহাড়ের মত উঁচু-নিচু রেখা ধ'রে যেখানটায় চূণের পাৎলা পলস্তারা খ'শে গিয়েছে—হ্যাঁ, ঐখানটা দেখতে দেখতে ঝিম এসেছিল। আ মরণ! এর মধ্যেই স্বপন!

হাত-পা টান ক'রে বড় একটা হাই তুলে ধীরা উঠলো।

মা এলেন।

"ঘুমোচ্ছিস দেখে বালিস দোবো কিনা, ভাবছিলাম। মনে পড়লো, তিনটেয় বেরুবি বলেছিলি সকালে। তাই ষ্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়েছি।"

মার কথায় একটু হাসলো ধীরা। মা চা আনতে গেলে ধীরা আবার শুয়ে পড়লো দু-হাতের ওপর মাথা রেখে।

আট

পরের রবিবারও নীরেন খাবার নিয়ে হাজির হল রায়বাহাদুরের বাড়িতে। হাত থেকে টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে দারোয়ান তাকে পৌঁছিয়ে দিল ড্রয়িং-রুমে।

"শোনো। তুমি আজ আমার সঙ্গে খাবে।"

এ নিমন্ত্রণে নীরেন রীতিমত ঘাবড়িয়ে গেল। বাড়িতেই কোনও আত্মীয়-স্বজনের সামনে সে ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে পারে না। বাবার সঙ্গে কোথাও খেতে গেলে মাথা নিচু করে ব'সে থাকে। আর, এত বড় একটা লোক, এই রকম বাড়ি, দারোয়ান থেকে আরম্ভ ক'রে সবাই ঘুরছে—এদের চোখের ওপর ব'সে খাওয়া। নীরেনের গা ঘামতে লাগলো।

রায়বাহাদুর তার ভাবান্তর লক্ষ্য না-করেই বললেন,

"বাড়িতে বকবে না। দিদি, বাবা, মা—কেউ রাগ করবে না। ভয় নেই।"

নীরেন ঢোঁক গিলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মুখ দিয়ে কয়েকটা কথা বেরোয়—

"আমি, ভাত, সকালে……।

"সকালে ভাত খেয়েছো, তাতে হয়েছে কি। ছেলে মানুষ। বার বার খিধে পায়।"

"না। খাবো না। পেট ভর্ত্তি রয়েছে।"

নীরেনের চোখ ছলছল করছিল। তাকে বসিয়ে রেখে রায়বাহাদুর চলে গেলেন দোতালায় শোওয়ার ঘরে। আগের দিন সন্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার সন্দেশ বা অন্য কোনও মিষ্টি বেমানান দাঁড়াবে। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে রায়বাহাদুর কলমদানি থেকে তুলে নিলেন একটা দামী কলম।

ড্রইং-রুমে একা ব'সে নীরেন দেওয়ালের যত ছবি দেখছিল। গৃহকর্তা ফিরে আসতে মাথা নিচু করলো।

" নাও। এটা তোমার কলম।"

নীরেন হাঁ ক'রে রইল। রায়বাহাদুর তার বুক-পকেটে কলমটা আটকিয়ে দিলেন।

টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে বেরুতে সেদিন একটু দেরি হয়েছিল। বেশ খানিকটা এগুলে তবে বাস পাওয়া যায়। আধাআধি গিয়ে ফুটপাথের ওপর টিফিন কেরিয়ার রেখে নীরেন কলমটা বার করলো। জীবনে সে ফাউন্টেন পেন দিয়ে লেখেনি। চমৎকার চকচকে। মাথাটা খুলে হাতের ওপর নিব চালালো নীরেন। সে জানতো, কলমটা নেবে দিদি। অথচ বড় সায়েব বললো, তারই কলম। কেউ শুনবে না তার কথা। বাবা, মা, দিদি—সবাই মিলে গালাগাল করবে তাকে। কলমটা পকেটে রেখে নীরেন বাসে চড়লো।

বাড়িতে ঢুকতেই ধীরার বকুনি—

"তোর তো আচ্ছা আক্কেল। যেখানে যাবি, শেকড় গজাবে। রাস্তা ভুল করেছিলি ? ডাহা বাঁদর।"

টিফিন-কেরিয়ার নামিয়ে নীরেন কলমটা বার করলো।

"দিলে বুঝি ?"

"হ্যাঁ। বললো, আমার কলম।"

"আচ্ছা, তোর কি কার, দেখবো অখন।"

ধীরা কলমটা নিলো ছোঁ মেরে।

* * *

সোমবার বিকেলে রায়বাহাদুর উঠি উঠি করছেন। খাওয়ার কথাটা অনবরত মনে খোঁচা দিচ্ছিলো। কোনও সম্পর্ক নেই। দয়ার ভিখিরী নয়। নিজের হাতে পরিপাটি ক'রে রেঁধে অত জিনিস পাঁওচাচ্ছে। মানা করলে শুনবে না।

অনেক মানুষ ঘেঁটেছেন রায়বাহাদুর। এ মেয়েটা একেবারে

আশ্চর্য প্রকৃতির। অভিমানও খুব। ওরই বা দোষ কি। রবিবার দুপুরে তো তিনি অপেক্ষাই করছিলেন। তাঁর মন বলছিল, ধীরা খাবার পাঠাবে। খাবার না-এলে কি ভাল লাগতো? কিন্তু, শুধু কি পাঠানো! ছেলেমানুষ ভাইটাকে কষ্ট দেবে। চাকর দিয়ে আনাতে অসুবিধে ছিল না। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে দশ মিনিটে ঘুরে আসতে পারতো। তাতে হবে না। মেয়েটার সবই বিচিত্র!

রবিবারের খাওয়া থেকে রায়বাহাদুরের চিন্তা বার বার কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল ধীরার ওপর। ওর সঙ্গে কারুর মিল নেই।

এইবার উঠতে হবে। রায়বাহাদুর কলিং-বেলের দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু, বেয়ারাকে ডাকা হল না। মিস গোমেস এসে বললো,

"মিস মুখার্জি ওয়েটিং, সার।"

"মিস মুখার্জি? লেট হার কাম, লেট হার কাম।"

রায়বাহাদুর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন।

ধীরা ঢুকলো।

"নিজে না-এসে গোমেসকে দিয়ে খবর পাঠানোর কি দরকার ছিল?"

"দেখা করতে আসিনি কিনা। কলমটা ওর কাছে রেখে যাব, ঠিক করেছিলাম। শেষে মনে হল, ও আবার কি ভাববে।"

আহত রায়বাহাদুর ব'সে প'ড়ে দু-হাতে চেয়ারের হাতল ধরলেন। তাঁর দেওয়া কোনও কিছু কেউ কখনও ফেরত দেয়নি। ধীরা অফিস ব'য়ে অপমান করতে এসেছে নাকি! অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব পেত। কিন্তু, ধীরার চোখে চোখ পড়তে নিজেকে রায়বাহাদুরের ছোট মনে হল। তাই, দোষ কাটাতে গেলেন আমতা-আমতা ক'রে—

"কলমটা উপহার দিয়েছি তোমার ছোট ভাইকে। তাতে খারাপ হবে, ধারণায় আসেনি।"

ধীরা একটুও কুণ্ঠা দেখালো না। জবাব দিল সঙ্গে সঙ্গে—"গরিবের ছেলে, গরিব বোনের ছোট ভাই। অত দামী কলম ব্যবহারের অভ্যেস নেই তার।"

ধীরা কলমটা রাখলো রায়বাহাদুরের সামনে।

"এটা তুলে নাও ধীরা। না-নিলে বড় আঘাত পাব।"

নিজের কাতরতা রায়বাহাদুরের কাণে খুব বেয়াড়া লাগলো। কিন্তু, তিনি নাচার। কড়া কথা শোনালে মেয়েটা চ'লে যাবে।

তাঁর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে ধীরা বললো,

"বেশ। এখন তো থাক। আর একদিন নোবো"

"না, না। এখনই নাও।"

—রায়বাহাদুর কলমটা ধীরার দিকে এগিয়ে দিলেন।

"বাব্বা! একদম ছেলেমানুষের মত বায়না!"

ধীরা কলমটা তুললো।

"আরে! মাথা গরম ক'রে দাঁড়িয়েই আছো। ব'সো।"

ধীরা কিন্তু বসলো না।

"রাগ পড়েনি এখনও? একটু চা খেয়ে যাও।"

"রাগ আবার কি? দুঃখু পেয়েছিলাম। অপমান বোধ হয়েছিল। এখন আর মনে কিছু নেই।"

"তা হলে চা খেতেও দোষ নেই নিশ্চয়।"

"বড্ড জরুরী ব্যাপার আছে একটা। আমিই তো বাড়িতে বড়। যত ঝামেলা পোয়াতে হয় আমাকে।"

"ব'সো না, বাপু। দশ-পনের মিনিটে সর্বনাশ হবে না।"

"বেশ, বসছি।"

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন রায়বাহাদুর। চা, ওমলেট, টোষ্ট এল। টোষ্টে মাখন লাগাতে লাগাতে ধীরা স্বগত আফশোষ করলো—

"খুব অসুবিধেয় পড়বো।"

"অসুবিধেটা কি, শুনি ?"

"না-ই বা শুনলেন।"

"গোপন কিছু হলে শুনতে চাই না।"

"না, গোপন নয়। তবে, আপনাকে জানাতে মন উঠছে না।"

"তা হলে জানানোই ভাল।"

"আপনার তো আবার চিনি বারণ। স্যাকারিনের শিশিটা বার করুন।"

ধীরা নিজের কাপে চিনি মেশালো। তারপর খাওয়া।

বেয়ারা ট্রে, পট, ডিস, কাপ, চামচে, কাঁটা নিয়ে যেতে রায়বাহাদুর প্রশ্ন করলেন,

"কই ? তোমার অসুবিধেটা তো শুনলুম না।"

"একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার কিনা।"

"হোক।"

"একখানা বাড়ি কেনার কথা চলছে। তাই।"

"ভালই তো। সুখবর। তা, চেপে যাচ্ছিলে কেন ?"

"না। দু-হপ্তার মধ্যে পুরো টাকাটা দিতে হবে। নইলে বায়না শুদ্ধু যাবে।"

"কাল দিও।"

"খুব উপদেশ শোনাচ্ছেন। পুরো টাকা হাতে নেই। তাই, মার, আমার সমস্ত গয়না বন্ধক রাখতে হবে। আজকে বাড়ি ফিরে বেলাবেলি বাবাকে নিয়ে এক জায়গায় যাওয়া ঠিক ছিল।"

"ওঃ। এই সমস্যা নিয়ে মুখ গোমড়া ক'রে তাড়াতাড়ি পালাচ্ছিলে।"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি।"

চেয়ার ছেড়ে ধীরা দরজার দিকে পা বাড়ালো।

শশব্যস্ত রায় বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন,

"আরে! দৌড়োচ্ছো যে। শোনো। কত টাকার দরকার ?"

"এই, দশ-বিশ-পঞ্চাশ থেকে দশ-বিশ-পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে।"

"ওটা তো কাজের কথা নয়। ঠিক কত চাই জানতে পারলে কাল ব্যবস্থা ক'রে রাখবো।"

"আপনার কাছ থেকে টাকা নোবো? কিছুতেই না। চললুম।"

ধীরা সত্যিই চ'লে গেল।

* * *

দেবনারায়ণ খবর পেল, সন্ধ্যেয় নাচের স্কুলে যেতে হবে। সংবাদ-বাহক বীরেনকুমারকে সে একপেট চপ-কাটলেট খাইয়ে দিল। এ রকম আহ্বান তার কপালে এই প্রথম। গায়ে প'ড়ে তাকে ধীরার কাছে যেতে হয়। খালি হাতে সে হাজরে দেয় না কখনও। কিন্তু, তার আনা উপহার প'ড়ে থাকে টেবিলের ওপর। ধীরা কোনও আগ্রহ দেখায় না। মামুলি হাসি-ঠাট্টার ওপরে ওঠে না।

দেবনারায়ণ সারা বিকেল ধ'রে সাজগোজ করলো। দাড়ি কামিয়ে, ক্রিম ঘ'সে, মাথায় চিরুণি-ব্রাশ চালিয়ে, বারবার আয়নায় মুখ দেখলো। মোটা চেহারা। আঁট পোষাকে আরও মোটা দেখায়। ঢিলে পাঞ্জাবিতে খানিকটা রোগা মনে হয় বটে, কিন্তু, পেটটা ঠেলে বেরোয়। সার্টে ভুঁড়ি ঢাকা পড়ে। দেবনারায়ণ সাত-আটবার জামা পাল্টালো। শেষপর্যন্ত গায়ে সার্ট চাপিয়ে আর এক কিস্তি কেশচর্চা করলো। আর এক দফা ক্রিম ঘসলো।

সাড়ে ছটা বেজে যায়। ঠিক সাতটায় পঁওছাবে। আর দেরি করা চলে না। দেবনারায়ণ ঘড়ি দেখতে দেখতে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় কিনলো সুন্দর দামী ভ্যানিটি ব্যাগ একটা। তাতে ভ'রে নিল কাজু বাদামের প্যাকেট। ধীরাকে চীনা বাদাম খেতে দেখেছে।

নৃত্যকলা-মন্দিরের সিঁড়ি টপকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দেবনারায়ণ দাঁড়ালো গিয়ে ধীরার সামনে।

"কি মশাই? সময় হল্ল এতক্ষণে? সওয়া সাতটা বেজে গ্যাছে।"

ধীরার মুখে এ রকম আপ্যায়ন দেবনারায়ণের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। সে হাসতে হাসতে কৈফিয়ৎ দিল—

"কটায় আসতে হবে, জানতাম না। সাড়ে ছটায় বেরিয়েছি। রাস্তায় যে ভীড়।"

"বুঝেছি। বসুন।"

দেবনারায়ণ বসলো এতক্ষণে।

"মাষ্টার মশাই। যানতো। মোড়ের দোকান থেকে দু-আনার তেলেভাজা আনুন। আসবার সময় তিনটে চা ব'লে দেবেন।"

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ধীরা একটা টাকা বার করলো। বীরেন-কুমার নিলো না। বুক-পকেটে হাত বুলিয়ে বললো,

"খুচরো আছে আমার কাছে।"

বীরেনকুমার চ'লে গেল। ঘরে তৃতীয় প্রাণী নেই। গভীর প্রত্যাশা নিয়ে, একগাল হেসে, দেবনারায়ণ জিজ্ঞেস করলো,

"ডেকেছেন আমাকে ?"

"তাইতো মনে হচ্ছে।"

"এই ব্যাগটা আনলাম।"

ভ্যানিটি ব্যাগের ওপর নজর বুলিয়ে ধীরা সেটা টেনে নিল নিজের সামনে।

"ভেতরে কিছু আছে, মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ। কাজু বাদাম।"

"ভাল ব্যাগে ভাল জিনিস।"

দেবনারায়ণ ধন্য হয়ে যায়। কিন্তু, প্রকাশ করার ভাষা পায় না খুঁজে।

ব্যাগ খুলে মোড়ক থেকে গোটাকত বাদাম মুখে ফেলে ধীরা কাজের কথা পাড়লো—

"মাষ্টার মশাই এখুনি এসে পড়বেন। তাই, আপনার সঙ্গে পরামর্শটা সেরে নিচ্ছি। বাড়ির একটা ঝামেলায় তিন হাজার টাকা

দরকার। সাত দিনের মেয়াদ। এর মধ্যে চাই। মানে ধার। যখন পারবো, শুধবো। রসিদ দেবো না।"

"তা........"

দেবনারায়ণকে থামিয়ে ধীরা বললো,

" 'তা' আবার কি? বড়লোকের ছেলে। যেখান থেকে পারবেন, আনবেন। আপনার মত বন্ধু থাকতে কার কাছে হাত পাততে যাবো?

বন্ধু! দেবনারায়ণ উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠলো—

"দোবো, নিশ্চয় দোবো।"

"অত তাড়াহুড়োর দরকার নেই। ভেবে-চিন্তে কড়ার করবেন। আমি আসছি একটু।"

ধীরা বাইরে গেল।

এদিকে, টাকার অঙ্কটা তলিয়ে বুঝে দেবনারায়ণের আক্কেল গুড়ুম। তিন হাজারের একটি পয়সা কম করা চলবে না। শোনা মাত্র কবুল না-করলেই হত। পালটিয়ে নিজের অক্ষমতা জানালে ইজ্জৎ থাকবে না, মুখ দেখানো যাবে না। কিন্তু টাকা তো আর কুড়িয়ে পাওয়ার জিনিস নয়।

চিন্তায় তন্ময় দেবনারায়ণ চমকে উঠলো কাঁধে হাতের ছোঁয়াচ পেয়ে। নিঃশব্দে ফিরে এসে ধীরা পেছন থেকে দু-কাঁধে দু-হাত রেখেছে।

"অত ভাববার কি আছে?"

দেবনারায়ণের দেহ, মন অবশ হয়ে আসে, ভাববার সামর্থ্য লোপ পায়।

"কবে দেবেন?"

আবিষ্ট দেবনারায়ণ উত্তর করে—

"সোমবার, না-হয় মঙ্গলবারের মধ্যে।"

"তবে তো ভাল ছেলে।"

ধীরার কোনও খবর নেই। মঙ্গল গেল, বুধ গেল, বৃহস্পতি গেল, শুক্র গেল। রায়বাহাদুর সকাল কাটান উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায়—কখন টেলিফোন আসে। অফিসে বার বার লক্ষ্য করেন মিস গোমেসের দরজা। বিকেলে ভাবেন, ধীরা হয়তো অফিসেই টেলিফোন করবে। আশ্চর্য! কবে দেখেছিলেন, মনে নেই। কিছুদিন আগে মেয়েটার সঙ্গে কোনও রকমের জানাশোনা ছিল না, অথচ, এর মধ্যে অহেতুক কিভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। সমস্ত ঘটনা রায়বাহাদুরের কাছে নিরর্থক মনে হয়। না এলো। না-ই বা টেলিফোন করলো। চেনা-পরিচিত—আগন্তুকের তো অভাব নেই তাঁর। কার জন্যে এত মাথাব্যথা হয়।......তবু, তবু একটা প্রত্যাশা। কিসের প্রত্যাশা? কিসের জন্যে অপেক্ষা? কেন এই প্রতীক্ষা? প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান না রায়বাহাদুর। টাকার দরকার। হয়তো যোগাড় করেছে, না-হয় করছে। সেইজন্যেই চুপচাপ। হয়তো পারেনি। কিন্তু, নিজেকে হেয় করতে চায় না। তাই আসেনি।

প্রতীক্ষা ঘনীভূত হয় অধীরতায়। শনিবার দুপুরে রায়বাহাদুর বড় বেশি অশ্বস্তি বোধ করেন। মনের মধ্যে পাকাতে থাকে, "কাল রবিবার। নিশ্চয়ই রান্না পাঠাবে। কিন্তু, ওর ভাইটা যে গোবেচারা। তাকে জিজ্ঞেস ক'রে লাভ হবে না। বেজায় ঘাবড়িয়ে যায় আমার সামনে।"

রায়বাহাদুর ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন। টেলিফোন ঝনঝনালো। এরকম বিশ বার বেজেছে। মিস গোমেসকে বারণ করতে পারেননি। দরকারী খবর আসে অনবরত। শুধু ধীরার ফোনটা দেবার কথা বলতেও তাঁর লজ্জা হচ্ছিল।

রায়বাহাদুর ছুটে গিয়ে রিসিভারটা তুললেন।

"মিস মুখার্জি ওভার দি লাইন, সার।"

"অল রাইট, অল রাইট। কানেক্ট।"

মিস গোমেস লাইন জুড়ে দিল। ফোনে ফুটে উঠলো ধীরার গলা—

"কাল দুপুরে আমার ভাই যাচ্ছে কিন্তু।"

"তাতো বুঝলুম। কিন্তু, তুমি তো কিছু জানালে না ?"

"কি আর জানাবো। সোমবার আপনার কাছ থেকে বেরুতে দেরি হয়েছিল একটু। সেদিন মিস করেছি। লোকটার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা চালাচ্ছি। বাবাকে নিয়ে ঘুরে এসেছি আর একবার।"

"বেশ মেয়ে তুমি। যাকগে। যা করবার করেছো। এখন আসতে পারবে ?"

"আজ নতুন একজনের কাছে যাওয়ার কথা আছে। পাওয়া যেতে পারে।"

"তাহলে অনিশ্চিত ? ও সব বাদ দিয়ে চ'লে এস।"

"তা কখনও হয়। আমার চাই বেশি। গয়নাগুলোর দাম নাকি তার ডবল না-হলে চলবে না। বাবা অতশত বোঝেন না। আমারও জানা নেই। তাই, যে দেবে বলেছে, তার কাছে ঠিক সময়ে না-গেলে চলবে না।"

"আরে বাপু, বাজে ফন্দী ছেড়ে তুমি এখুনি এসো দেখি।"

"বাজে ফন্দী হলেও উপায় নেই। আজ সময় করতে পারবো না কিছুতেই।"

"না, না।"

"মাপ করবেন। আমি নাচার।"

"তাহলে সোমবার নিশ্চয়।"

"আচ্ছা।"

"আচ্ছা নয়। পাকা কথা। কটায় সুবিধে হবে তোমার ?"

"সামনের হপ্তাটা বাদ দিন না।"

"ওসব শুনছি না। সোমবার দুপুরে, না-হয় বিকেলে। কথার নড়চড় ক'রো না।"

"সে অভ্যেস থাকলে অনেক হাঙ্গাম থেকে রেহাই পেতাম।" ব'লে ধীরা ফোন ছেড়ে দিল।

সোমবার ধীরা এল লাঞ্চের পরে। রবিবারের রান্না কেমন হয়েছে, জিজ্ঞেস করলো সবার আগে। রায়বাহাদুর পঞ্চমুখে প্রশংসা জুড়ে দিলেন—

"আচ্ছা আরম্ভ করেছো যাহোক। এক এক রবিবার এক এক রকম মেনু। কাঁকড়া চচ্চড়ি খেয়েছিলাম সেই ছোটবেলায়। বাবুর্চি বড়া ভাজতে জানে না। তোমার বড়াটা কিসের ছিল?"

"নাম শুনলে হয়তো ঘেন্না করবে।"

"শুনি-ই না।"

"কাদা-চিংড়ি।"

"চমৎকার খেতে। এত সব তোমার মাথায়ও আসে।"

"সারা হপ্তা ধ'রে ভাবি। শনিবার সন্ধ্যে পর্যন্ত ঠিক ক'রে ফেলি। ফর্দ লিখে দি-ই বাবাকে। ভোরে বেরিয়ে, পাঁচটা বাজার ঘুরে তিনি সব কেনেন। জিনিস-পত্র আসার আগেই খানিকটা কাজ এগিয়ে রাখি। এলে ঘোড়দৌড় চালাই। আপনার আবার বেলা না-হয়, সেটা দেখি।"

"এত কষ্টের দরকার কি?"

"আবার? ঐরকম কথা মুখে আনবেন তো চলে যাব।"

"রাগ করো কেন?"

কথার মধ্যে ফ্রুট-স্যালাড এল। রায়বাহাদুরের অনুরোধে ধীরাকে স্যালাড আর আইস-ক্রিম খেতে হল। তারপর সে উঠে পড়লো।

রায় বাহাদুর বাধা দিলেন—

"যাচ্ছো যে? যার জন্যে ডাকলাম, তা-ই তো শুনলাম না।"

"আজকে যে লোকটার কাছে যাচ্ছি, তার খাঁকতি খুব। বড্ড বেশি সুদ চাইছে। গয়নার দাম ডবলের কম হ'লে দেবেই না।"

"আরে, কত টাকা?"

ধীরা চুপ ক'রে রইলো।

গাঢ়-স্বরে, কাতর মুখে রায়বাহাদুর অনুরোধ জানালেন আবার।

শেষ পর্যন্ত ধীরা টাকার অঙ্কটা বললো। তার লাগবে বাইশ হাজার। মধ্যবিত্ত সংসারের গয়না রেখে যে ওর দশ-ভাগের একভাগ টাকা পাওয়া যায় না রায়বাহাদুর তা খেয়ালে আনলেন না। ধীরাকে কপট ভৎ´সনা করলেন—

"এর জন্যে এত কাণ্ড! তুমি তো ভয়ানক গোলমেলে লোক দেখছি। চেক দিচ্ছি, নিয়ে যাও।"

রায়বাহাদুর টেবিলের ড্রয়ার টানলেন। কিন্তু ধীরা রুখে দিল—

"চেকটেক লিখবেন না। গোড়াতেই তো জানিয়ে দিয়েছি, আপনার টাকা নোবো না।"

"কেন?"

"আপনি তো আর গয়না বন্ধক রেখে ধার দেবেন না। সুদও নেবেন না।"

"খুব হয়েছে। বিয়ারার চেক। কাল সকালেই ক্যাশ কোরো। যখন পারবে, শোধ দেবে। বন্ধকী কারবার করি না। গয়না-টয়না আনবে না।"

ধীরা তবুও বললো,

"আজকে দরকার নেই। লেখাপড়ার জন্যে কাল বাবাকে আনবো। তারপর চেক।"

"লেখাপড়া লাগবে না। চুক্তি থাক মনে মনে।"

"আপনার কাছ থেকে টাকা ধার করবো, তা-ও খালি হাতে, একেবারে বিনা লেখাপড়ায়—অসম্ভব।"

"মোটেই নয়।"

চেক সই ক'রে রায়বাহাদুর ধীরার সামনে ধরলেন। ধীরা হাত বাড়ালো না।

রায়বাহাদুর মিনতি করলেন—

"নাও।"

চেকখানা দু-আঙুলে তুলে ধীরা টাকার অঙ্কটা দেখলো। তারপর আর একবার আপত্তি জানালো,

"কম দিলেই পারতেন।"

"বাকীটার জন্যে মহাজনের কাছে ছুটবে, কেমন?"

ধীরা এ প্রশ্নের জবাব না-দিয়ে অন্য কথা পাড়লো—

"এত টাকার চেক। ব্যাঙ্কে আজকাল কত গোলমাল হয়। আপনি ভাঙিয়ে রাখবেন। কাল নিয়ে যাব।"

রায়বাহাদুর এতে আপত্তি করলেন না। ঠিক হল, তিনি ব্যাঙ্ক খোলার সঙ্গে সঙ্গে টাকা তুলিয়ে আনবেন। ধীরার যখন সুবিধে হবে, এসে নিয়ে যাবে।

নয়

ধীরার কাছ থেকে ফিরে দেবনারায়ণ খেতে পারেনি ভাল ক'রে। মাকে বুঝিয়ে, বাবাকে ফাঁকি দিয়ে সে অনবরত টাকা নেয়। কিন্তু, এ পর্যন্ত ছু-একশোর ওপর ওঠেনি। তিন হাজার একসঙ্গে! কি ভাবে যোগাড় হবে!

রাতে দেবনারায়ণের ভাল ক'রে ঘুম হলো না। বেলায় ঘুম ভাঙতেই মনটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো—ধীরাকে টাকা দিতে হবে। তারপর থেকে অনবরত তার একই চিন্তা—কিছু কিছু ক'রে জমাতে গেলে ছু-এক বছরেও ধীরার কথা রাখা যাবে না। ধাপ্পা দিয়ে আর কত টাকা মিলবে। ঘড়ি, আংটি, বোতাম, কলম—সব বেচলেও বড়জোর পাঁচ-সাতশো হবে। বাকীটা?

ছুর্ভাবনায় কাটলো সারা দিন। বিকেলে প্রাণের বন্ধু গোবর্ধনের কাছে দেবনারায়ণ পরামর্শ চাইলো।

তিন হাজার টাকা যোগাড়ের ফিকির! শুনে গোবর্ধন অবাক হল। বললো—

"এত টাকা দিয়ে কি করবি? নতুন কারুর পাল্লায় পড়েছিস নাকি?"

দেবনারায়ণ তার কাছে ভেতরকার কিছু ফাঁস করলো না। টাকাটা পেলে সে বন্ধুদের নিয়ে বড় রকমের কিছু করবে। গোবর্ধন জানতে চাইলো, কি করবে। দেবনারায়ণ বিরক্ত হল তাতে। তাকে চটালে গোবর্ধনের চলবে না। তাই, শেষ পর্যন্ত সে যুক্তি দিল—

"সিন্ধুকের চাবি হাতিয়ে চেষ্টা কর। নগদ পেতে পারিস। সোনাদানা তো মিলবেই।"

এতটা ওঠার মত সাহস ছিল না দেবনারায়ণের। সিন্ধুকে টাকা থাকে। সব বাবার গোণা-গাঁথা। কিন্তু, চাবি নিয়ে, সিন্ধুক খুলে হাতানো! বাবা দেখবে না, মা দেখবে না। ধরা পড়বে না!

গোবর্ধনের কথায় দেবনারায়ণের মন একটুও চাঙ্গা হল না। তবু তার পরামর্শ নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো। রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে সে আগাগোড়া তলিয়ে দেখলো। আসল অসুবিধে বাবাকে নিয়ে। চান করতে যাবার সময়টুকু ছাড়া দিন-রাত তিনি চাবির গোছা নিজের কাছে রাখেন। রোজ সকালে বাজার-খরচ দিয়ে দেন। মার ক্যাশবাক্স আলাদা। তাতে বড় জোর বিশ-পঞ্চাশ টাকা থাকে। চান-টানে বাবার লাগে ঘণ্টাখানেক। কিন্তু, তিনি ওঠেন খুব ভোরে। অত সকালে উঠতে হবে, চাবি নিতে হবে। মা চান করেন বাবার আগে। তারপর ঢোকেন ঠাকুর-ঘরে। পুজো সারতে যায় আধঘণ্টাটাক। তারপর ঘোরাঘুরি করেন। ছোট বয়েসে সে-ও মার সঙ্গে থাকতো। সিন্ধুক খুলতে গেলে তাঁর নজরে পড়তে হবে, ঝি-চাকর-ঠাকুররা দেখে ফেলবে। তা ছাড়া, বাবা যে রকম লোক। রোজ রাত্তিরে সিন্ধুকটা খুলবেন একবার, ভেতরে চোখ বোলাবেন, সব কিছু নেড়েচেড়ে রাখবেন। নোট থাকে তাড়া তাড়া। তিন-হাজারের মত সরালে ঠিক বুঝতে পারবেন।

দেবনারায়ণ ভেবে কূল-কিনারা পেল না। কিন্তু, না-ভেবেও উপায় ছিল না। নিতে যে হবে সিন্ধুক থেকে, এটা সে স্থির ক'রে ফেলেছিল। গোবর্ধন অন্য কিছু বললে সে ভিন্ন রাস্তার কথা মাথায় আনতো। সব রকম বিপদে গোবর্ধন তার কর্ণধার। গোবর্ধন তাকে অনেক জিনিসেই হাতে-খড়ি দিয়েছে।

সিন্ধুকের চাবি পেতে পারে সকালে। সে সময় টাকাটা হাতালে কি ঘটবে, দেবনারায়ণ তা-ও মনে মনে আলোচনা করলো। বাবা সকালে তাড়াহুড়োয় থাকেন। টাকা কমলে তাঁর নজরে আসবে রাত্তির পর্যন্ত। তখন ঝি-চাকরদের ঘাড়ে দোষ পড়বে। তাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু, হাঙ্গামা কম নয়। ভোরে ঘুম ভাঙা দায়। বেলা সাতটার পর বিছানা ছাড়া অভ্যেস। সকাল সকাল উঠলে বাবা দেখবে, খেয়ালও রাখবে হয়তো। চুরির

কথা জানাজানি হলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেই। একেবারে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তারপর? যদি তাকেই সন্দেহ ক'রে বসে?

দেবনারায়ণ ঠিক করলো, আর একবার গোবর্ধনের সঙ্গে আলোচনা করবে। সকালে বাবার দিকে লক্ষ্য রাখা হল না। উঠলো মার ডাকাডাকিতে। বিকেলে বন্ধুকে ভাল-মন্দ সব মন খুলে শোনালো।

পিঠ চাপড়িয়ে গোবর্ধন দেবনারায়ণকে উৎসাহ দিল,

"কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ। সব তো ঠিক ক'রে ফেলেছিস। এখন বাকী শুধু কাজ হাসিল। ভয়ের কি আছে? সন্দেহ করবে, না-হয় ধরা পড়বি, এই তো? একমাত্তর ছেলে। বাবা নিশ্চয়ই পুলিশ ডাকবে না। হাতে নাতে পাকড়াও করলে গালাগাল দেবে, কড়াকড়ি বাড়াবে। কিন্তু, মরবে তো একদিন। কত বয়েস রে, তোর বাবার?"

"পঞ্চাশ হবে।"

"তবে আর কি। টেঁসে যাবে বছর দশেকের মধ্যে। তারপর তো তুই একাই মালিক হবি—একদম রাজা।"

দশ বছর পরে সব হাতে আসবে। কিন্তু, ধীরা ততদিন অপেক্ষা করবে না। দেবনারায়ণ চঞ্চল হয়ে গেল। গোবর্ধনের সঙ্গে বেরুলেও আড্ডায় মন লাগলো না। সিনেমায় যাওয়া হল না। তাড়াতাড়ি ফিরলো। রাত্তিরে খেতে ব'সে মাকে বললো,

"কাল সকাল সকাল উঠতে হবে। ভোর পাঁচটায় ডেকে দিও।"

একটু অবাক হয়ে মা শুধোলেন,

"অত সকালে কি করবি?"

"বড় মাষ্টারের কাজ জ'মে গ্যাছে। কাল শেষ না-করলে চলবে না।"

কথাপ্রসঙ্গে গিন্নী খবরটা কর্তার কানে তুললেন। ছেলের পড়ায় মন হয়েছে—তাঁর কাছে এটা মস্ত বড় ঘটনা।

কর্তা কিন্তু শুনে বিদ্রূপ করলেন,

"ওসব ঢঙের কথা রাখো।"

স্বামীর তাচ্ছিল্যে একটু বেজার হলেন দেবুর মা। প্রতিবাদও করলেন সাধ্যমত—

"ওকে তুমি দুচোখে দেখতে পার না।"

মা ডেকে দিলেন ঠিক পাঁচটায়। বিছানা ছেড়ে দেবনারায়ণ বারান্দার এমুড়ো ওমুড়ো ঘুরতে লাগলো।

দেবনারায়ণ আগে মার কাছে শুতো। এখন তার ঘর আলাদা। লাগোয়া বড় ঘরখানা কর্তা-গিন্নীর। তিনতলার একদিকে ঠাকুর-ঘর, আর একদিকে বাথরুম। বাঁকা চোখে দেবুকে লক্ষ্য ক'রে কর্তা বাথরুমে ঢুকলেন। মা তখন ঠাকুর-ঘরে।

চাবির রিং থাকে আলমারিতে। বাথরুমের পাশে গিয়ে দেবু কান পেতে শুনলো জলের আওয়াজ হচ্ছে কিনা। ঠাকুর-ঘরের সামনে পর্যন্ত এগিয়ে নজর করলো, মা আসনে বসেছেন। চট ক'রে সে ঢুকে পড়লো কর্তা-গিন্নীর ঘরে। তারপর রিং বার ক'রে চাবি নেওয়া, সিন্দুক খোলা, নোটের গোছা পকেটে পোরা, চাবির তোড়া যথাস্থানে রেখে আলমারি বন্ধ করা—পাঁচ মিনিটে কাজ শেষ। হাত কাঁপছিল, বুকটা কেমন করছিল। তবু, দেরি হল না। বাণ্ডিল-বাঁধা নোট নিজের ঘরে গদির নিচে সামলিয়ে আর একবার দেখে নিল ঠাকুর-ঘর, ফের গেল বাথরুমের কাছে।

দেবনারায়ণ হাঁফ ছাড়লো—যাক, দুজনেরই দেরি আছে। খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে একখানা খাতা আর খানকত বই ছড়িয়ে সে বসলো পড়ার টেবিলে।

বাবা বেরুলেন, ঘরে ঢুকলেন। মা তাঁর জল-খাবার আনালেন। দেবনারায়ণের বুক টিপটিপুনি শুরু হল। যদি সিন্ধুক খোলে। সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ হতে তার ধড়ে প্রাণ এল। বাবা দোকানে যাচ্ছেন। দুপুরে আর বাড়ি আসেন না। সেখানেই খেয়ে নেন। ফিরবেন সে-ই রাত্তিরে। তারপর যা হয় হবে।

কিন্তু, টাকা ছেড়ে ঘর থেকে বেরুনো বিপদ। ঝি বিছানা ঝাড়ে, মা মাঝে মাঝে গোছান। সে না-থাকলে ঝি ঢুকবে নিশ্চয়।

অথচ, টাকা নিয়ে বাইরে যাওয়া দায়। ধীরার দেখা মিলতে যার নাম সন্ধ্যে। ততক্ষণ অতগুলো টাকা সঙ্গে রাখা। দুপুরে চান করতে যাওয়ার সময়ই বা কি হবে। বীরেনকুমার নাচের স্কুলে থাকে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে ধীরার হাতে টাকাটা তুলে দেওয়া ভাল।

দেবনারায়ণ বেরিয়ে পড়লো নোটের বাণ্ডিল কাছায় বেঁধে। মা তখন রান্নাঘরে ব্যস্ত।

নৃত্যকলা-মন্দিরের অফিসে ব'সে বীরেনকুমার ভুট্টা চিবুচ্ছিল। দেবনারায়ণের আরজি শুনে বললো,

"যাওয়া সহজ নাকি। বাজার সারবো, উনুন ধরাবো, যোগাড় করবো, রান্না নামাবো। তা-আ-র-প-অ-র।"

"কি সব্বনাশ।"

"বিকেলে আবার টুইশানি আছে।"

"থাক। এখুনই বেরিয়ে পড়ুন।"

"পারবো না, মশাই। উপোস হয়ে যাবে।"

"এখন তো চলুন। ফেরবার পথে ভাল হোটেলে খেয়ে নেবেন।"

"কমসে কম একটা টাকা গ'লে যাবে।"

"এই নিন।"

দেবু দুটো টাকা বার ক'রে দিল পকেট থেকে।

বীরেনকুমার এবার পাঞ্জাবি হাতে নিয়ে চটপট বেরুলো দেবুর সঙ্গে।

ট্যাক্সিতে উঠে দেখতে দেখতে তারা ধীরাদের পাড়ায় হাজির। দেবুকে গাড়িতে রেখে বীরেনকুমার ঢুকলো গলিতে। অনেকক্ষণ পরে এসে খবর দিল, ধীরা ট্যাক্সি রাখতে বলেছে।

ধীরার আসতে দেরি হল না। ট্যাক্সিতে উঠে নৃত্যকলা-মন্দিরের রাস্তা দেখিয়ে দিল।

গাড়ি থেকে নেমে ধীরা অফিসের চাবি চেয়ে নিল বীরেনকুমারের কাছ থেকে। ইঙ্গিতটা বুঝে সে জিজ্ঞেস করলো,

"তাহলে ?"

"মুড়ি-বেগুনি আনুন।"

এরকম নির্দেশের অর্থ বীরেনকুমার জানে। সে গেল তেলে-ভাজার দোকানে।

ওপরে উঠে ধীরা বললো,

"অসময়ে তলব করেছেন। এত তাড়াহুড়ো। তাই বাড়িতে না-বসিয়ে আপনাকে এখানে নিয়ে এলাম। ব্যাপারটা কি, শুনি এখন।"

"ঐ যে, আপনি, আপনার টাকা……"

দেবনারায়ণকে থামিয়ে দিয়ে ধীরা ঠাট্টা আরম্ভ করলো—

"আপনার মত গোবেচারার কম্ম নয়। আপনি যে টাকা যোগাড় করতে পারবেন না, তা আমি গোড়াতেই ধরে নিয়েছি।"

"পেরেছি। এনেছি।"

"কোথায় ?"

ব'সে ব'সেই জামা তুলে, গেঞ্জি তুলে, পেছনে দুহাত চালিয়ে কাছার গিঁট খুলে দেবনারায়ণ নোটের তাড়া বার করলো। ধীরা নিয়ে গুণলো। কুড়িখানা একশো টাকার। বাকী সব দশ টাকার।

একশো টাকার নোট একটা একটা ক'রে আলোয় ধ'রে দেখে ধীরা জানতে চাইলো, সই করা রয়েছে কার।

দেবনারায়ণ জবাব দিল না।

"দেখুন না"—

ধীরা একখানা নোট এগিয়ে দিল। দেবনারায়ণ দেখলো না।

ধীরা আবার প্রশ্ন করলো,

"সইটা চেনেন না আপনি ?"

"কি ক'রে চিনবো।"

"তা বটে" ব'লে ধীরা সমস্ত নোট ঘ'সে ঘ'সে আর একবার গুণলো।

"আরে, এতো একুশশো।"

দেবনারায়ণ চুপ ক'রে থাকে।

"গুণে আনেননি ?"

"না।"

"খাসা। বাকী নশো ?"

"পাবেন দু-চারদিনের মধ্যে।"

উত্তর শুনে ধীরা একসঙ্গে সাজিয়ে সমস্ত নোট ব্যাগে পুরলো। কথাবার্তা আর জমলো না। নশো টাকা কম পড়েছে। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল দেবনারায়ণের। একুশশো দিয়ে তার নিজেকে নেহাৎ অপদার্থ মনে হচ্ছিল।

বীরেনকুমার এল মুড়ি-বেগুনি নিয়ে। দেবনারায়ণ আর বসতে চাইলো না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে। ধীরার ঝুলোঝুলিতে একটা বেগুনি মুখে দিয়ে সে চ'লে গেল।

বাড়িতে ফিরে কোনও রকমে স্নান-খাওয়া সারা। তারপর মাষ্টারের জন্যে অপেক্ষা করা। মাষ্টার এলেন না।

বেলা যত গড়ায়, দেবনারায়ণ ততই ঘাবড়াতে থাকে। বিকেলে বেরুলো না। শুলো গিয়ে নিজের বিছানায়। মা

দেখে ঘরে ঢুকলেন। কপালে হাত দিলেন, বুকে হাত দিলেন।

দেবনারায়ণ কাৎরিয়ে উঠলো,

"শরীর খারাপ।"

মা বললেন,

"গা-টা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে, মনে হচ্ছে। রাত্তিরে ভাত খেয়ে দরকার নেই।"

নিয়মমত কর্তা ফিরলেন রাত নটার পর।

দেবনারায়ণ একবার ওঠে, একবার শোয়, একবার কপাল টেপে, একবার বুকে হাত বোলায়। গা দিয়ে তার ঘাম বেরুচ্ছিল। মিথ্যে কথায় সে ছোটবেলা থেকেই পোক্ত। নানা রকমের ধাপ্পাও দিচ্ছে অনেকদিন ধরে। কিন্তু, চুরি! চুরি তার জীবনে এই প্রথম। না-করলেই হত। নশো কম পড়ছে। সে লজ্জা পেয়েছে খুব। ধীরাতো একদম রাগ করেনি! একশো টাকার সব কখানা নোটে বাবার সই। শুনলে, ধীরা হয়তো নিতো না। একেবারে অত না-হলেও চলতো বোধ হয়। কিছু কিছু ক'রে দিলে সে-ও বেঁচে যেত।

বাবার চেঁচানিতে দেবনারায়ণ চমকে উঠলো। ভয় হতে লাগলো, ফাঁড়া কাটে কি না-কাটে।

মা এসে ডাকলেন,

"দেবু, একবার আয়তো এ ঘরে।"

কঁকিয়ে উঠে দেবনারায়ণ জড়িত স্বরে বললো,

"উঃ। কপালে যন্ত্রনা। মাথা ছিঁড়ে পড়ছে।"

মা ফিরে গেলেন।

দেবুর কানে এল বাবার তর্জন—

"আসতে পারবে না? অসুখ করেছে? পুলিশে খবর দিচ্ছি। দেখবে, কেমন হাজতে যায়। পুলিশের গুঁতোয় রোগের ভূত পালাবে।"

মা এসে আবার অনুরোধ করলেন,

"ওঠ না, বাপু। রাগী মানুষ। না-গেলে কুরুক্ষেত্তর বাধাবে।"

মার পেছনে পেছনে দেবনারায়ণ হাজির হল বাপের সামনে। তাকে দেখেই কর্তা ফেটে পড়লেন—

"টাকা সরিয়েছিস ? এত সাহস বেড়েছে। চোর!"

নির্বাক দেবু ঘাড় নোয়ালো।

"মাথা নিচু ক'রে মুখ বুজে থাকলেই ছেড়ে দোবো ভেবেছিস ? বল, টাকা কোথায় ? কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস ?"

"আমি নিইনি।"

"অত সকালে ওঠা কিসের জন্যে। তখনই আমার মনে হয়েছে, নিশ্চয় একটা কিছু মতলব আছে।"

মা ছেলের হয়ে সাফাই দিলেন—

"ও-তো সারাদিন শুয়ে। সকালে লেখাপড়া করেছে। বেরোয়নি একেবারে।"

একটু সাহস পেয়ে দেবনারায়ণ বললো,

"আমি টাকার কথা কিচ্ছু জানি না। আমার ঘর খুঁজে ছাখো।"

"বাইরে সরিয়েছিস।"

"আজ আমি যাইনি কোথাও"

"কি আমার যুধিষ্ঠির রে। কোথাও যাননি। তুই ছাড়া আর কারুর সাহস হবে না সিন্ধুক খুলতে। হয় তুই, না-হয় তোর মা।"

মা কাঁদতে শুরু করলেন—

"আমাকে চোর সাজাচ্ছো।"

কর্তা তেড়ে উঠলেন—

"চোর, আর না-হয় চোরের মা।"

মা একেবারে চুপ করে গেলেন। দেবনারায়ণের বাবা শাসালেন, "ঠিক আছে। ব্যবস্থা করছি।"

ব্যবস্থা হল। কর্তা রাত-দুপুর অবধি দাপাদাপি করলেন। পুলিশ এল। ঝি-চাকর-ঠাকুর গ্রেপ্তার হল।

*   *   *

দেবনারায়ণ বকেয়া নশো টাকা যোগালো হ্যাণ্ডনোট কেটে। মহাজন খুঁজে দিল গোবর্ধন। সুদে আসলে এক বছরে শোধ করার কড়ারে দু হাজারে সই করতে হল। এদিকে প্রমাণাভাবে ঝি-চাকর-ঠাকুর বেঁচে গেল। বাড়িতে কর্তার জুলুম বাড়লো।

তবুও দেবনারায়ণ খুশী। হপ্তায় অন্ততঃ একটা দিন ধীরা তার সঙ্গে একা ব'সে গল্প করে, চা খায়। তার চেহারার প্রশংসাও করেছে। চুরির গ্লানি মন থেকে মুছে যায়। সে হ্যাণ্ডনোটের কথাও ভাবে না একদম।

দশ

রায়বাহাদুরের বাইশ হাজার আর দেবনারায়ণের তিন হাজার, মোট পঁচিশ হাজার টাকা হাতে পেয়ে ধীরা পরিকল্পনা বদলিয়েছে। ভাড়া নয়। হাজার বারোর মধ্যে পুরোনো বাড়ি কেনা হবে একখানা। মেরামতে হাজার চারেক। আসবাব-পত্রে যাবে চার হাজার। হাতে থাকবে পাঁচ হাজার।

রাখাল মুখুজ্জে দিন-রাত বাড়ির ধান্দায় ঘুরছেন। রোজই দু-চারটে খবর নিয়ে ফেরেন। ধীরা শোনে। সে খারিজ ক'রে দেয় বেশিরভাগ। কালীঘাটে ভার অনিচ্ছে। বাগবাজারে ঘিঞ্জি। বৌবাজারে তো কিছুতেই নয়। ভবানীপুরে মন ওঠে না। এই কটা এলাকার বাইরে হলে দেখতে যায়। কিন্তু, পছন্দ হয় না। রাখালবাবু বলেন,

"তোর বাপু বামুনের গরুটি চাই—খাবে কম, দুধ দেবে বেশি, গুঁতোবে না। সব দিক মিলিয়ে এমনতর আস্তানা কোথায় পাবি ?"

ধীরা বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়,

"আমি নিজে খোঁজাখুঁজি চালালে এতদিনে মিলতো ঠিক।"

বাড়ি দেখারও কসুর হল না। সরু রাস্তা বা গলি একেবারে বাতিল। সামনে দোকান-পাট কিংবা উঁচু বাড়ি থাকলে অচল। লাগোয়া জমি, রাস্তা-ঘাট, পাড়া—সব ঠিকমত হলেও ঘর, দরজা নিয়ে গোলমাল বাধে।

বাড়ির উদ্যোগ-পর্বে ধীরার তৃতীয় সঙ্গী দরকার করে না। শুধু বাবা আর সে। হয়রান হয়ে রাখাল মুখুজ্জের উৎসাহ যত নিভে আসে, ধীরার তাগাদা তত বাড়ে।

শেষতক বালিগঞ্জের সীমানা বরাবর পছন্দমত বাড়ি পাওয়া গেল একখানা। সামনে একটা ভাঙা শিব-মন্দির। ভক্তের আনাগোনা নেই সেখানে। একপাশে বড় মাঠ। প'ড়ে আছে মাথায়-পায়ে

বাঁশের গোলপোষ্ট নিয়ে। বিকেলে সেখানে ছেলেরা খেলতে জোটে, সকালে-দুপুরে গোটাকত গরু-মোষ ঘোরে। বাজার-দোকান বেশি দূরে নয়। কয়েকবার গিয়ে ধীরা ভাল ক'রে সব দেখে এল।

বাড়িখানা অনেকদিনের। ছোট ইটের গাঁথনি। নোনা ধরেছে তাতে। ঘর ছিল পাঁচখানা। তার মধ্যে তিনখানারই ছাত প'ড়ে গিয়েছে। জায়গায় জায়গায় পাঁচিলের গায়ে গর্ত। উঠোনে নিম গাছ। যতটুকু ছাত অবশিষ্ট আছে, তাতে বট-অশ্বত্থের মেলা।

রাখাল মুখুজ্জে 'কিন্তু, কিন্তু' করেছিলেন। তাঁর সব কটা যুক্তি ধীরা উড়িয়ে দিল।

পাড়াটা খালি, বেশি লোকজন থাকে না?

চারপাশে জমি বিক্রি চলছে। দু-চার বছরের মধ্যেই সারা এলাকায় বসতি হয়ে যাবে।

পোড়ো বাড়ি?

পোড়ো বাড়ি না-হলে পাঁচ কাঠা জমিশুদ্ধ দু-হাজারে বেচতো কেউ?

ঘর নেই?

সারিয়ে টারিয়ে তিনখানা ঘর আর রান্নাঘর হলেই যথেষ্ট। বাকীটা ফাঁকা থাকবে।

জল নেই?

উপস্থিত টিউব-ওয়েল বসালে চলবে। এরপর পাম্প।

রাখালবাবুর সমস্যা ছিল, স্কুলে যাওয়া নিয়ে। ধীরা তাঁকে ঠাণ্ডা ক'রে দিল খাঁটি কথা ব'লে—

"হাঁসালে দেখছি। বাসে চ'ড়ে একবার গিয়ে নাম সই ক'রে আসা। তা-ও কি রোজ যাবে? মাসে একটা টাকা বাড়িয়ে দিলে আশুবাবু ভাল ক'রে চালিয়ে নেবে।"

নিমগাছ অলুক্ষুণে?

নিমগাছের হাওয়ায় স্বাস্থ্য ভাল থাকে। নিমপাতা খেলে রক্ত পরিষ্কার হয়।

রমেন-নীরেনের পড়া ?

স্কুল একটু দূরে। সেখানে ভর্তি হবে রমেন। হেঁটে যাবে।

রাখাল মুখুজ্জে শেষ পর্যন্ত মেয়ের কাছে পুরোদস্তুর হার মানলেন।

বাড়ি কেনা হল। তারপর সারাই। ধীরা রোজ একবার আসতো তদারক করতে। রাখালবাবু দাঁড়িয়ে থেকে মিস্ত্রিদের কাজ দেখতে লাগলেন। দুপুরে খেয়ে আসতেন এক ফাঁকে। স্কুলে দর্শন দেওয়া ক'মে গেল। মাসের মাঝামাঝি, মাইনে জমা পড়ার সময় কদিন দৌড়োতেন।

মাস চারেকেই বাড়ি তৈরি হল। আগের কোনও নিশানা রইলো না। দেওয়ালের নিচেটা আগাগোড়া মোজেইক করা। বালির ওপর ফিকে সবুজ রঙের পোঁচ। চারদিকে ঘোরানো চওড়া কার্নিশ।

সামনে, দুপাশে, পেছনে খোলা জায়গা রেখে ঘেরা হল মানুষ-প্রমাণ পাঁচিল দিয়ে। ঢালাই লোহার ফটক বসলো।

সুন্দর ছিমছাম বাড়ি। ফটক থেকে নুড়ি-বিছোনো ফালি পথ। মার্বেল-ধরণের পেটেন্ট পাথরে বাঁধানো দুটো ধাপের পর বাইরের ঘর। দরজায় পেতলের হাতল লাগানো। পাশে কলিং বেলের সুইচ। মাথার ওপর ছোট, আধা-গোল ঝুল-বারাণ্ডা। ঘরের গা দিয়ে আসল সদর। বাইরের ঘরে সাদা-কালো মার্বেল পাথরের মেঝে। দেওয়ালে পঙ্খের কাজ। তার লাগোয়া ঘরখানার মেঝেতে সবুজ রঙ, দেওয়ালে সবুজ-মেশানো মোজেইক। দুঘরের মাঝে দরজা। দরজার গায়ে কলিং বেলের সুইচ। তিন নম্বর কামরা আর রান্নাঘর সাদামাঠা। স্নানের ঘরে বাথ-টাব, বেসিন বসানো হল। বাকী রইল পাম্প। ইলেকট্রিক, টেলিফোনের দরখাস্ত করা হল।

তৈরির পর সাজানোর পালা। খোঁজ করতে করতে ধীরার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। পুরোনো মার্বেল পাথর যোগাড় করার সময় সে টুকিটাকি পাঁচটা জিনিস কিনে রেখেছিল। সব আসবাব, সাজ-সরঞ্জামও এসে গেল। রাখাল মুখুজ্জে ধীরার সঙ্গে ঘুরেছেন, মাল কেনা হয়েছে। তারপর ঠেলা, না-হয় মুটিয়ার সঙ্গে বাপ এসেছেন নতুন বাড়িতে। আগে হাজির হয়ে মেয়ে সব তুলিয়েছে। চাবি বন্ধ করেছে। গাড়ি-ভাড়ার সঙ্গে একবেলার খাওয়া কবলিয়ে রাখাল মুখুজ্জে স্কুলের আশুবাবুকে রাতের পাহারায় রেখেছিলেন।

বাইরের ঘর দুখানা ধীরা নিজের হাতে সাজালো। শুনে মা ঠাট্টা করেছিলেন, "হপ্তায় হপ্তায় সাজাতে গোছাতেই তোর দম বেরিয়ে যাবে।"

ধীরা একথার জবাব দেয়নি। শুধু হেসেছিল একটু।

দু-ঘরের প্রত্যেকটা জানলা-দরজায় পর্দা লাগানো হল ওপরে নিচে আটকাবার বন্দোবস্ত রেখে। বাইরের ঘরে এল চামড়া-ঢাকা মোড়া, ইজিচেয়ার, ছোট কৌচ, ছোট গোল টেবিল। ছোট দুটো বুক-কেস বসলো জোড়া জানালার নিচে। বুককেসের ওপর মোরাদাবাদী ফুলদানি, জয়পুরী পুতুল সাজানো হল। দেওয়ালে ঝুললো সামনা-সামনি বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের ছবি।

পাশের ঘরে বড় খাট, একটা ড্রেসিং টেবিল, এককোণে একটা অর্গ্যান, তার পাশে সেতার আর ছোট একটা কাশ্মীরী টিপয়—এর বেশি কোনও আসবাব রইল না সেখানে। দেওয়ালে টাঙানো হল বিলিতী ছবির ছাপা নকল—জলপ্রপাত আর সাগরের বুকে পাল-তোলা জাহাজ।

সাজানো, গোছানো শেষ হলে রাখাল মুখুজ্জে গৃহ-প্রবেশের কথা তুললেন। প্রস্তাবটা ধীরা উড়িয়ে দিল। খুব বড়লোক আর নিতান্ত গরিবেরা ওসব করে। ধীরার এই যুক্তিতে তার বাবা বুঝতে পারলেন, মেয়ের বাহাদুরিতে তিনি হা-ঘ'রেদের সমাজ থেকে

অনেক ওপরে উঠছেন। বাকী যা আছে, তার জন্যে অপেক্ষা করতে দোষ নেই। বাড়াবাড়িটা মেয়ের অপছন্দ। রাখালবাবুর তাতে আপত্তি ছিল না। স্নেহের সঙ্গে ধীরার ওপর প্রচণ্ড ভক্তি এবং শ্রদ্ধা এসে গিয়েছিল তাঁর। কোথা থেকে সে টাকা যোগাড় করলো, তিনি তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। কত হাতে পেয়েছে, ধারণায় আনতে পারেন না। খরচ ক'রে চলেছে একটার পর একটা। টাকা দিতে বিরক্ত হয় না কখনও। দীর্ঘদিন ধ'রে রাখাল মুখুজ্জে নানা ভাবে সংসারের পুরো মাশুল জুটিয়েছেন। তার জন্যে প্রত্যেকটি দিন দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়েছে তাঁকে, এখানে ওখানে ছুটতে হয়েছে। ধীরা কিন্তু দৌড়-ঝাঁপ করছে না, যা দরকার হচ্ছে, যুগিয়ে যাচ্ছে নির্বিকারে। কথা বলার সময় রাখালবাবু মেয়ের দিকে ফাঁকে ফাঁকে চেয়ে দেখেন।

* * *

তাড়াহুড়ো-ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও কিন্তু ধীরা রায়বাহাদুরের অফিসে যাচ্ছিল হপ্তায় দু-তিন দিন। প্রত্যেক রবিবার দুপুরে খাবার পাঠাচ্ছিল নীরেনের হাত দিয়ে।

নীরেনের লজ্জা ভেঙে গেছিল। সহজ ভাবে রায়বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলতো।

বাড়ির কতদূর কি হচ্ছে না-হচ্ছে, রায়বাহাদুর জানতেন না। শুধোলে ধীরা এড়িয়ে যেত, নীরেন আদবে কোনও খবর রাখতো না।

এক রবিবার রায়বাহাদুর এমনিই নীরেনকে জিজ্ঞেস করলেন—"কলমে লিখছো তো?"

"কলম?"—নীরেন আচমকা প্রশ্নটা বুঝতে পারলো না।

"আরে, ঐ আমি যেটা তোমার হাতে দিয়েছিলাম। হারিয়ে ফেলেছো?"

নীরেনের খেয়াল হল। ধীরার হুকুম স্মরণ করে সামলিয়েও নিল সঙ্গে সঙ্গে—

"ও। সেই কলমটা? দিদির কাছে।"

"সে লেখে?"

"না। তার তো আলাদা কলম রয়েছে। আপনারটা তুলে রেখেছে বাক্সে। "মাঝে মাঝে বার ক'রে দেখে।"

রায়বাহাদুর মনে মনে আওড়ালেন—

"মাঝে মাঝে বার ক'রে দেখে।"

নীরেন ভাবতে লাগলো, দিদি যেমনটি শিখিয়েছে, উত্তরটা ঠিক তেমন হল কিনা।

রায়বাহাদুর কলম নিয়ে আর কিছু শুধোলেন না।

কয়েকদিন পরে ধীরা অফিসে গিয়ে হাজির হল ঠিক লাঞ্চের আগে। রায়বাহাদুর খেতে বললেন। সে মাথা নেড়ে তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলো—

"সায়েবী খানা বারবার কি আমাদের মত লোকের মুখে রোচে? এর আগে আপনার কথা শুনেছি ভদ্রতার খাতিরে। এখন আর ওসবের ধার ধারছি না।"

রায়বাহাদুর প্রতিবাদ করলেন—

"কেন? বিলিতী খাবারে দোষটা কি?"

"দোষ? তাহলে রোববার রোববার সামান্য যা পাঠাই, তা-ই মুখে দিয়ে অত তারিফ করেন কেন?"

"যদি বলি, সেটাও ভদ্রতার খাতিরে।"

"তা পারবেন না। বলুন তো দেখি।"

"যাক, বাবা। হার মানলাম।"

"বেশ। তাহলে স্বীকার করুন, রোজ রোজ সুপ, রোষ্ট, পাঁউরুটি, বিরিয়ানি—আপনার মোটেই ভাল লাগে না। কোনও রকমে রাইস-কারি দিয়ে পেট ভরান।"

"তাই নাকি? কি ক'রে জানলে?"

"হুঁ-হুঁ-উ। ধরতে পারলেন না তো।"

রায়বাহাত্বর সত্যিই ধরতে পারেন না। চেয়ে থাকেন জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি নিয়ে।

ধীরা তাঁকে মনে করিয়ে দেয়—

"নিজের মুখে কবুল করেছিলেন একদিন।"

বিস্মিত রায়বাহাত্বর শুধোন—

"কবে?"

"সে-এ-ই-ই আমি যেদিন নেমন্তন্ন সেরে এখানে এসেছিলাম বিকেলের দিকে। কি কি খেয়েছি, জানতে চাইলেন। শুক্তো, ইলিশ-পাতুড়ি, ডিমের অম্বল—এই সবের ফিরিস্তি শুনলেন। তারপর, মুখ দিয়ে পেটের কথা, মনের কথা, বেরিয়ে এসেছিল। দেখুন, স্মরণ হয় কিনা।"

"আশ্চর্য! এই সামান্য জিনিসও ভোলো নি!"

—রায়বাহাত্বর ধীরার ওপর মেলে ধরলেন বিস্মিত, সপ্রশংস দৃষ্টি।

সেটা গ্রাহ্যের মধ্যে না-এনে ধীরা জের টানতে লাগলো—

"অথচ, কাল বাড়িতে ত্ব-বেলা কি খেয়েছি জিজ্ঞেস করলেই বোকা বানিয়ে ছাড়বেন।"

"তাহলে শুক্তো-টুক্তোর কথা খেয়াল রেখেছো কি ক'রে?"

"কেন? শুনবেন?"

"শুনতে দোষ কি।"

"খাওয়ার ফর্দ দিতে দিতে আপনার মুখে একটা অসহায় ভাব লক্ষ্য করলাম। কথায় কথায় ধ'রে ফেললাম, আপনার মন কি চায়। তাই, সেদিনকার সব খুঁটিনাটি পর্যন্ত মাথায় আছে। তাই, প্রত্যেক রোববারের জন্যে ব'সে থাকি। যেটা অন্তরে দাগ টেনে দেয়, কখনও সেটা বিস্মরণ হয় না।"

রায়বাহাত্বর মাথা নিচু করলেন। বেরিয়ে এল বুকভরা নিঃশ্বাস। টেবিলের কাগজগুলো নাড়া-চাড়া করতে লাগলেন তিনি।

"কি হল? একটা কথা মনে করিয়ে দিয়ে লজ্জায় ফেললাম নাকি? ভয় পাচ্ছেন, যদি আর একটা তুলি।"

রায়বাহাদুর বুঝতে পারলেন না, ধীরা আবার কোন প্রসঙ্গ তুলবে। তবু বললেন—

"ভয় আবার কিসের।"

"বটে? য়্যালবামখানা? লেখা হয়েছে?"

রায়বাহাদুর নিরুত্তর রইলেন।

"শুনুন। আপনার কাছে আমার ছবি আর বাজে কাগজে কোনও তফাৎ নেই। সেই জন্যেই গোটা য়্যালবাম হারিয়ে গিয়েছে।"

"না, না। হারায়নি।"

"তবে ফেরৎ দিন।"

"কি ক'রে দোবো। বাড়িতে নিয়ে গেছিলাম। আনা হয়নি।"

ব্যবসার খাতিরে অনেক সময় মিথ্যে চালাতে হয়। কিন্তু ধীরার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে রায়বাহাদুরের ভয়ানক বাধো বাধো ঠেকছিল। সেটা লক্ষ্য করলো ধীরা। তারপরই টেনে আনলো নতুন প্রসঙ্গ—

"কি? এক্সারসাইজ চলছে তো?"

"না। এখনও আরম্ভ করতে পারিনি।"

রায়বাহাদুরের অস্বস্তি রীতিমত ঘনীভূত হয়।

"সময় পান না?"

"ঠিক ধরেছো।"

"ঠিক ধরেছি?"

রায়বাহাদুরের চোখে চোখ রাখে ধীরা। রায়বাহাদুর মাথা নোয়ান। একটু থেমে ধীরা যেন তিরস্কার করে—

"ইচ্ছে থাকলেই সময় পেতেন।"

"দেখবো চেষ্টা ক'রে।"

"চেষ্টা করবেন আমি মরলে।"

"এঃ। যা-তা মুখে আনো কেন?"

"আনবো না? সামান্য একটা অনুরোধ। দিনে আধঘণ্টা কি তিন-কোয়ার্টার লাগবে। তার জন্যে যত বাজে ওজর।"

রায়বাহাদুর মাথা হেঁট ক'রে রইলেন।

বেয়ারা এসে লাঞ্চের কথা জিজ্ঞেস করলো।

"আমি যাচ্ছি। আপনি খেয়ে নিন। দেরি হচ্ছে আপনার।"

ধীরা চ'লে গেল। রায়বাহাদুর লাঞ্চ আনতে হুকুম করলেন। কিন্তু খেতে পারলেন না। একটার পর একটা যত ঘটনা মনে আসতে লাগলো। কলমটা তুলে রেখেছে। দেখে মাঝে মাঝে। ফী রবিবার পাঁচ রকম রেঁধে পাঠায়। রাইস-কারির কথা ভোলেনি এতদিনে। এক্সারসাইজ না-করিয়ে ছাড়বে না। হারুর মা এইরকম খুন্‌সুটি ধরতো। কাজের তাড়ায় খাওয়ার সময় না-হলে কুরুক্ষেত্র বাধাতো। অবস্থা তখন স্বচ্ছল ছিল না। ব্যবসার তাগিদে রাত দুপুর অবধি ঘুরতে হত। কিন্তু, হারুর মা কখনও ক্লান্তি দেখাতো না। হাসিমুখে ষ্টোভ জ্বালিয়ে সব রান্না গরম ক'রে দিত। সামনে ব'সে খাওয়াতো। কটায় ওঠার দরকার শুনে সকালে সময় মত ডেকে দিত।

মৃতা স্ত্রীর কথা ভাবতে ভাবতে রায়বাহাদুরের চোখ দুটো ভিজে উঠলো। অনেক কষ্টে সংসার চালাতো সে। দিনের পর দিন তিনি খরচা দিতে পারতেন না। কিন্তু, কোনও অসুবিধের কথা তাঁর কানে আসতো না। বেরুনোর আগে দরকার মত পয়সা পেতেন। খেতে বসলেই সামনে পরিপাটি রান্না। সংসারের কোনও চিন্তা ছিল না। অবিশ্যি হারুর মা যাওয়ার পর চিন্তা আর করতে হয়নি, হবেও না। ঘরে বাইরে শুধু প্রাচুর্য।

কম খেলে কেউ অনুযোগ করে না। না-খেলে কারুর মাথা খারাপ হয় না। রাতে না-ঘুমোলে চোখ-মুখ দেখে শুধোবার মানুষ

নেই। অথচ, বিছানা নিলে হৈ-চৈ প'ড়ে যায়। সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জায় দুটো ডাক্তার, তিনটে নার্স এসেছিল। সকালে, বিকেলে দলে দলে লোক হাজির হত দেখতে। কিন্তু হারুর মা সারারাত জেগে যে ভাবে রোগের সেবা করতো, তা আর জীবনে জুটবে না।

চোখ-মুখ রুমাল দিয়ে মুছে রায়বাহাদুর ঘণ্টা বাজালেন। বেয়ারা আসতে বললেন,

"হঠাও।"

লাঞ্চের খাবার প্রায় সবই প'ড়ে ছিল। বেয়ারা হাত লাগালো না। রায়বাহাদুর আবার বললেন,

"হঠাও, লে যাও। খানা হো গয়া।"

বেয়ারা সব তুলে নিয়ে গেল।

রায়বাহাদুর ফের ঘণ্টা বাজালেন।

বেয়ারা এসে দাঁড়িয়ে রইল। রায়বাহাদুর একদম অন্যমনস্ক।

"হুজুর—"

বেয়ারার সাড়া পেয়ে চমকে উঠলেন।

"হুজুর—"

"কফি।"

এসে ঢুকলো হরেন্দ্রলাল। হাতে তার ছোট একখানা ফাইল। সেটা খুলে ধরলো রায়বাহাদুরের সামনে—

"দেখুন তো, টেণ্ডারের এই হিসেবটা ঠিক হয়েছে কি না?"

"আঃ! এসব তুমিই করবে। আমাকে জিজ্ঞেসার দরকার কি? ছুটি দেবে না আমাকে?"

হরেন্দ্রলাল ফাইল বন্ধ ক'রে চ'লে যাচ্ছিল। তাকে ডাকলেন পেছন থেকে—

"বাইশ হাজার টাকা নিয়ে তুমি তো আর কিছু জানতে চাইলে না।"

"কি আর জানবো। আপনার বাল্যবন্ধুকে দিয়েছেন যখন।"

"হ্যাঁ। ফেরতও পাওয়া যাবে তাড়াতাড়ি।"

বাবার হিসেব-পত্র হরেন্দ্রলালের জিম্মায়। অতগুলো টাকা। তাই তাঁর বাল্যবন্ধুর নাম-ঠিকানা লিখে রাখতে চেয়েছিল। রায়-বাহাদুর তার কথা কানে তোলেননি। খরচ-খরচার দিকে হরেন্দ্রলাল কড়া চোখ রাখে। ওটা তার অভ্যেস। বরাদ্দের বাইরে গেলে বৌকেও রেহাই দেয় না। তাই বাইশ হাজারের দাদন নিয়ে তার মন খুঁৎ খুঁৎ করে। বাবা এর আগে কখনও কাউকে এভাবে ধার দেননি। বয়েসের দোষে যদি দানছত্র খোলেন, ফতুর হতে কতদিন। তা ছাড়া, নাম-ঠিকানা সমেত ঠিকমত হিসেব রাখতে কি দোষ ছিল। তাগাদা করার পথ রইলো না। উনি চোখ বুজলে টাকাটা একদম মারা যাবে।

রায়বাহাত্বর নিজের থেকে টাকার কথা তুলেছিলেন ছেলের মন হাল্কা ক'রে দেওয়ার জন্যে। ক্ষুণ্ণ হরেন্দ্রলাল কিন্তু খুশী হল না।

* * *

ছেলেকে মনমরা দেখে রায়বাহাত্বরের বেয়াড়া লাগছিল খুব। বৌমাকে হয়তো বাইশ হাজারের কথা বলেছে। সে কি ভাবছে, কে জানে। রবিবার ত্বপুরে খাওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই হারু জানে, বৌমাতো জানে-ই। হারু বুদ্ধিমান। টাকা দেওয়ার সঙ্গে খাবার আসার একটা সম্পর্কও খুঁজে বার করেছে হয়তো। ধীরার পাত্তা নেই। দেখা হলে ব'লে দিতে হবে, নীরেনকে যেন সামলায়। ত্ব-একদিনের মধ্যে না-এলে বিপদ। ধীরার বাবা আর তিনি ছোট-বেলায় একসাথে পড়েছেন—এটা মুখস্ত না-করালে নীরেন গুলিয়ে ফেলবে সব। বড্ড সাদাসিধে ছেলেটা।

কাজের তাড়ায় রায়বাহাত্বর এত কথা ভুলে যান। ফাঁক পেলে মনে পড়ে। ধীরা দেখা দিচ্ছে না। কিন্তু, টেলিফোন করতে পারতো। তাহলে সব কথা গুছিয়ে ব'লে দেওয়া যেত।

হঠাৎ একদিন অফিসে ফোন এল।

"হ্যালো। ধীরা মুখার্জিকে চিনতে পারছেন?"

"না-চিনে উপায় আছে? আসছো না কেন?"

"আজকে আমাদের বাড়িতে টেলিফোন এলো। এখন. থেকে যখন খুশী ফোন করতে পারবো।"

"নিশ্চয়। তোমাদের নম্বরটা বল তো, লিখে নি-ই।"

ধীরা একটার পর একটা সংখ্যা আউড়িয়ে গেল। রায়বাহাদুর লিখে নিলেন।

তারপর ধীরার প্রশ্ন —

"কি? রাইস-কারি চলছে তো রোজ?"

"হ্যাঁ।"

"এক্সারসাইজের সময় পাচ্ছেন না?"

"দেখি।"

"আচ্ছা। আপনি দেখবেন ভাল ক'রে। আমি লাইন কেটে দিচ্ছি।"

রায়বাহাদুর ডিরেক্ট লাইন চেয়ে নিলেন। তারপরই ধীরাদের ফোন বেজে উঠলো।

হাসতে হাসতে রিসিভারটা কানে তুললো ধীরা।

"হ্যালো, ধীরা?"

"হ্যাঁ।"

"একটা জরুরী ব্যাপার ভুল হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে তোমার বাবা আমার বাল্য-বন্ধু। তোমাকে, নীরেনকে কেউ জিজ্ঞেস করলে এই পরিচয়ই দেবে। নীরেন নেহাৎ গোবেচারা। ওকে ঠিকমত শিখিও, বুঝলে?"

"আচ্ছা। বাবার নামটা আপনার মনে আছে তো?"

"তা আছে। কিন্তু. আমার কাছে কেউ জানতে চাইবে না।"

"বুঝেছি।"

রায়বাহাদুর রিসিভারটা নামালেন। বেশ হাল্কা বোধ করছিলেন।

ধীরার বাবা অনায়াসে তাঁর বাল্যবন্ধু হতে পারে। লাখ লাখ টাকা যার কারবারে খাটছে, সে ছোটবেলার সঙ্গীকে বিনা সুদে, বিনা লেখা-পড়ায় বাইশ হাজার টাকা দিয়েছে। এটা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়।

কিন্তু, ধীরাদের ঠিকানাটা জানা থাকা দরকার। রায়বাহাদুর আবার ডাইরেক্ট লাইন নিলেন, আবার ফোন করলেন। ধীরা আবার ফোন ধরলো, ঠিকানা লেখালো।

রায়বাহাদুর এবার পুরো নিশ্চিন্ত। হিসেবের খাতায় লেখবার জন্যে হারুর কাছে রাখাল বাবুর নাম-ঠিকানা দিতেও অসুবিধে রইলো না। তবে, তার যা অভ্যেস। বারণ না-করলে দু-এক মাস না-যেতেই হয়তো তাগাদা লাগাবে।

এগার

রাখাল মুখুজ্জেরা উঠে গিয়েছেন নতুন বাড়িতে। বাইরের ঘরে ধীরার বৈঠক চলে। পরের খানা তার শোবার ঘর। বাড়িতে একটা বাচ্ছা চাকর বাহাল হয়েছে। সে রমেনের সঙ্গে রাত্তিরে রান্নাঘরে আশ্রয় নেয়। রাখালবাবু, তাঁর স্ত্রী, নীরেন আর মিনুর জন্যে বাকী ঘরখানা। পুরোনো সব জিনিস তাতে ঠাসা।

রমেন পড়ে রান্নাঘরের সামনে ব'সে। শীত এসে গিয়েছে। গায়ে একখানা মোটা চাদর চাপিয়ে নেয়। সদরটা ঢাকা। কিন্তু, সেখানে বসবার উপায় নেই। বাবা যাওয়া-আসা করেন, নীরেন অনবরত ভেতর-বাইরে দৌড়োয়, মিনুর লাফালাফি লেগেই আছে, বাচ্ছা চাকরটাও আনাগোনা করে। বাবার ঘরে নীরেন-মিনুর উপদ্রব।

দিনে-রাতে রমেনের সঙ্গে ধীরার দেখা হয় না। দুজনেই দুজনকে এড়িয়ে চলে। নতুন বাড়িতে একমাত্র রমেনেরই খারাপ ঠেকছে। দুটো মহল এখানে। বাইরেরটি বড়লোকের মত। ভেতরে গরিবের আস্তানা। এক স্নান-টানের সময় ছাড়া ধীরা ভেতরে ঢোকে না। খায় নিজের ঘরে।

টাকা লেগেছে যথেষ্ট। বাবা গরিব। দিদি কোনও চাকরি করে না। তাই ভাবে, কোথা থেকে সে এত টাকা পেল। জ্ঞান হওয়া অবধি বাবার আদব-কায়দা তার ভাল লাগেনি। কিন্তু, দিদিকে সে একদম বরদাস্ত করতে পারে না। ধীরার ঘর দুখানায় উঁকি মেরে দেখেছে সে। মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "অত সব জিনিস দিয়ে কি হবে?" মার বকুনি খেয়ে অবধি সে আর কিছু নিয়ে কৌতূহল দেখায়নি। আগের স্কুলেই পড়ছে। বেরুতে হয় নটায়। মার কাছ থেকে যা বাসের ভাড়া পায়, তাতে পুরো রাস্তা কুলোয় না। তাই আধাআধি পথ হাঁটতে হয়। এর জন্যে দায়ী তার দিদি। কিন্তু, অভিযোগের উপায় নেই।

নীরেন খুব মজায় আছে। স্কুলে যেতে হচ্ছে না। দিদির ফুট-ফরমাস খাটে, খায়-দায়, মিনুর সঙ্গে খেলাধূলো করে।

রাখালবাবু একটু অসুবিধেয় পড়েছেন। নতুন পাড়ায় কাছাকাছি চায়ের দোকান নেই। ধীরা মানা করেছে, বাড়িতে লোক আনা চলবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তায়ও মেয়ের আপত্তি। বসবার ঘরে তাঁর প্রবেশ-নিষেধ। ভেতরে কাটিয়ে দেন সকালটা। খেতে হয় তাড়াতাড়ি। তারপর একটু গড়িয়ে নেওয়া। দুপুরের পূর্ব বেরুনো, স্কুলে যাওয়া। রোজ বাংলা খবরের কাগজ কেনার ব্যবস্থা হয়েছে। রাখালবাবু কাগজ পড়েন, শুয়ে শুয়ে নানা কথা চিন্তা করেন, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মিল খোঁজেন।

নতুন বাড়িতে দেবনারায়ণের খাতির বাড়ে। কোনও কাজ নেই তার। তাই রোজ আসতে আরম্ভ করে।

একদিন রাত্তিরে ধীরা ধরলো, খেয়ে যেতে হবে। দেবনারায়ণের আপত্তি টিকলো না।

বাইরের ঘরে ছোট টেবিলটার ওপর থালা বাটি সাজিয়ে দিল ধীরা।

খেতে খেতে অনর্গল ব'কে যাচ্ছিল দেবনারায়ণ।

ধীরা মাঝখানে বললো—

"জানেন, ইচ্ছে করে, আপনাদের মত অতিথির জন্যে একসেট রূপোর থালা-বাটি-গেলাস তৈরি করাই। কিন্তু, পেরে উঠছি না। বড্ড সখ আমার।"

ধীরার কথায় সাড়া না-দিয়ে দেবনারায়ণ পর পর তিনখানা লুচি মুখে পুরলো।

"আরে, অত তাড়াহুড়ো কেন। বিষম খাবেন যে।"

জবাব দিতে গিয়ে দেবনারায়ণ সত্যিই বিষম খেল। জলের

গেলাস হাতে নিয়ে প্রচণ্ড কাসি। গেলাসটা পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো।

ধীরা মন্তব্য করলো,

"এই জন্যেই তো রূপোর বাসন-পত্র দরকার। কদিন আগে হাতে লেগে ছিটকে পড়লো কাঁসার বাটি—তুলতে গিয়ে দেখি ফেটে চৌচির। যাক্‌গে, ব্যস্ত হবেন না। জল আনছি।"

ধীরা আর একটা গেলাসে জল নিয়ে এল।

বিষম সামলিয়ে দেবনারায়ণ ভেবে দেখছিল পূর্বাপর। বাচ্ছা চাকরটা এসে কাচের টুকরোগুলো সরিয়ে মেঝেটা ঝাঁট দিয়ে দিল, থালা-বাটি-গেলাস নিয়ে গেল। ধীরা ভেতর থেকে ঘুরে এল ছোট ডিসে সুপুরি-লবঙ্গ নিয়ে।

এর মধ্যে দেবনারায়ণও নিজের কর্তব্য ঠিক ক'রে ফেলেছিল। বেফাঁস করবে পরে, সময়-মত। বাবা সব চাবি সঙ্গে সঙ্গে রাখছেন। টাকা যোগাড় করতে সময় লাগবে। একেবারে পাঁচ সেট রূপোর বাসন নিয়ে হাজির হলেই তাক লেগে যাবে।

আর আলাপ জমলো না। কটা লবঙ্গ তুলে নিয়ে দেবনারায়ণ উঠে পড়লো।

দুদিন না-যেতেই দেবনারায়ণ ছুটলো সোনা-রূপোর দোকানে। দর যাচাই ক'রে দেখলো। একপ্রস্থ রূপোর বাসনে শ-ছয়েক টাকা লাগবে!

টাকা সংগ্রহের কোনও পথ নেই। অথচ, রূপোর বাসন নিয়ে ধীরার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। মুখ ফুটে বলেনি সে। কিন্তু, তার দরকার, আর, দেবনারায়ণ দিতে পারবে না!

গোবর্ধনের পরামর্শ নেবে? নিজে থেকে ঠিক করাই ভাল। তা নইলে গোবর্ধন খোঁজ করবে, রূপোর বাসন কার জন্যে। ধীরার কাছে যাওয়া বন্ধ ক'রে দেবনারায়ণ ফিকির খুঁজতে লাগলো।

বাসন হাতে না-নিয়ে সেখানে যাওয়া যায়? ধীরা কিছুই বলবে না, ঠিক। কিন্তু, সে-ই বা কোন লজ্জায় মুখ দেখাবে?

মাথা খেলিয়ে খেলিয়ে যখন কোনও হদিশ পেল না, দেবনারায়ণ তখন হাল ছেড়ে দিয়ে সহজ রাস্তার কথা ভাবতে লাগলো। সে কখনও সঞ্চয়ের ধার ধারে না। কিন্তু, খরচ কমালে কিছু কিছু ক'রে পাঁচ-ছ মাসে পাঁচ-ছশো টাকা হয়ে যাবে। টাকা বাড়িতে রাখা অসম্ভব। নিজের হাতে থাকলে উবে যাবে। তাই, জমাতে হবে গোবর্ধনের কাছে। তাহলে, একদিকে নতুন নতুন ফন্দীতে টাকা আদায় করা, আর একদিকে লাগাম কষা—দুটোই দরকার। প্রথমটা বেশি ঝামেলার নয়। বাবা যত দিনকে দিন গরম হচ্ছেন, মা ততই নরম হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। দ্বিতীয়টাও না-করলেই নয়। টাকা বাঁচাতেই হবে।

ভাল মাষ্টারের বাড়িতে গিয়ে পড়বার নাম ক'রে দেবনারায়ণ টাকা নিল। মা খুশী মনে দিলেও, জানতে পেরে বাবা মাষ্টারের রসিদ চেয়ে বসলেন। গোটা মাস ধ'রে তাঁর তাগাদা চললো। মাস-কাবারের মুখে দেবনারায়ণ মাকে ব'লে দিল, নতুন মাষ্টার কিছুই পড়ায় না, সে আর যাবে না তার কাছে। নেওয়া টাকা তিন দিনে ফুঁকে না-গেলে সে মাষ্টার-কাহিনী জীইয়ে রাখার চেষ্টা করতো। গোটা এক মাসে একটা পয়সাও সে জমাতে পারে নি।

হঠাৎ একদিন ডাক এল বীরেনকুমারের মারফৎ। না-গিয়ে উপায় ছিল না। জরুরী দরকার থাকতে পারে, না-ও পারে। কিন্তু, না-গেলে ওমুখো হওয়ার রাস্তা ঘুচে যাবে। দেবনারায়ণ তাই সেজেগুজে উপস্থিত হল ধীরার কাছে।

"কলিং-বেল শুনেই বুঝেছি, আপনি। ওরকম একবার আলতো একটু টিপে আর কেউ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে না।"

ধীরার কথায় দেবনারায়ণ পায়ের দিকে চাইলো। ভীষণ লজ্জা করছিল তার।

"বসুন, আসছি" ব'লে ধীরা চ'লে গেল পাশের ঘরে।

রুমালে মুখ মুছে দেবনারায়ণ চাইলো দরজার দিকে। ভেজানো কবাটের আড়ালে কি রহস্য আছে, সে জানে না। খাটখানা একদিন নজরে পড়েছিল। এর বেশি কিছু দেখবার সুযোগ হয়নি কখনও।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ধীরা এসে গেল। হাতে মস্ত বড় একটা কাগজের বাক্স—কাগজে মোড়া, দড়ি দিয়ে বাঁধা।

দেবনারায়ণ রীতিমত বিস্মিত হয়। তাকে বসিয়ে বাক্স আনার উদ্দেশ্য কি?

"আপনি তো একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমি হা-পিত্যেশ ক'রে আছি, কবে আসবেন। আপনাকে দেখাবার জন্যে আনকোরা রেখে দিয়েছি, কদর বুঝবেন।"

দড়ি খুলে, কাগজ সরিয়ে, ডালা তুলে ধীরা একটু থামে। তারপর বার করে একটার পর একটা—পাৎলা কাগজে জড়ানো রূপোর থালা-গেলাস, কয়েকখানা রেকাব, গোছা-ভর্তি বাটি, গোটা-কত কাঁটা-চামচে। সাজিয়ে রাখে টেবিলের ওপর।

দেবনারায়ণের মাথা পাক খেতে থাকে। পেটের ভেতর মোচড় দিচ্ছে যেন। বুকটা বেজায় ভারী। দম আটকিয়ে আসছে।

"কেমন জিনিস?"

দেবনারায়ণের মুখে উত্তর যোগায় না।

"মোড়ক থেকে বার ক'রে দেখুন। খাঁটি চাঁদির তৈরি।"

ঘাড়ে হাত বুলিয়ে, মাথা চুলকিয়ে, দাঁতের পেছনে জিভ ঘসে দেবনারায়ণ মুখ খোলে—

"সু....সু....সুন্দর।"

"ওমা! শুধু সুন্দর ব'লেই খালাস! কত ঘুরে কিনেছি।"

দেবনারায়ণ মনে মনে আবৃত্তি করে, "কিনেছি, কিনেছি।"

ধীরা এবার জোর খোঁচা দেয়—

"ভাবছেন বুঝি, আমার মত গরীবের বাড়িতে এসব কেন?"

"না, না। চমৎকার। আপনার পছন্দ কখনও খারাপ হতে পারে।"

"ভদ্রলোকের সামনে বার করা চলবে তো?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

ধীরা বাসনগুলো গোছায়, আর, আড়চোখে দেখে, দেবনারায়ণ ব'সে আছে কণ্ঠায় চিবুক ঠেকিয়ে।

বাক্সটা বেঁধে সে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

নিজেই কিনেছে। ডাকিয়ে এনে দেখালো। এরপর কি করবে, ঠিক নেই। দেবনারায়ণ পালাতে পারলে বাঁচে।

ঘুরে এসে ধীরা বসলো সামনাসামনি। তারপর শুরু করলো বাসন-কাহিনী—

"আপনার মনে আছে নিশ্চয়। একদিন রূপোর বাসনের কথা তুলেছিলাম। তখন থেকে রোজই ভাবতাম, কি ক'রে কিনবো। আমার এক নতুন বন্ধুর কাছেও বোকার মত ব'লে ফেলেছিলাম। শুনে সে কিছুতেই ছাড়বে না। নিয়ে গেল টেনে। কত দোকান যে ঘুরিয়েছে, তার ঠিক নেই। আমার পছন্দ হয় তো তার হয় না, তার চোখে লাগে তো আমার লাগে না।"

দেবনারায়ণের মাথায় ভীমরুলের ভনভনানি আরম্ভ হয়ে গেল। নতুন বন্ধু—ছাড়েনি—সঙ্গে ক'রে ঘুরেছে। তার মানে, সে-ই দামটা দিয়েছে।"

"চা খাবেন নাকি?"

নতুন বাড়িতে আসার পর থেকে ধীরা এরকম ভাবে চা-প্রসঙ্গ তোলেনি কখনও। নিজে হাতে ক'রে এনেছে, না-হয় চাকরের হাত দিয়ে আনিয়েছে কিছু জিজ্ঞেস না-করেই।

আহত দেবনারায়ণ জবাব দিল—

"না। একটু আগেই রেষ্টুরেন্টে ঢুকেছিলাম।"

ধীরা কৌচ ছাড়লো।

দেবনারায়ণ বুঝতে পারছিল না, কি করবে। উঠতে চায়। কিন্তু, ধীরা না-বললে যাবে কি ক'রে। তার দোটানা কেটে গেল ধীরার কথায়—

"তাহলে নীরেনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। গল্প-সল্প করুন। আমার একটু কাজ আছে ভেতরে।"

"না, আমি যাই এখন। আমারও একটু কাজ আছে।"

দেবনারায়ণ বেরিয়ে পড়লো আস্তে আস্তে। তার পৌরুষে ঘা লেগেছিল। রাস্তায় যেতে যেতে ঠিক ক'রে ফেললো, "পাঁচ-ছ'শো টাকার জিনিস দিয়েছে তো মাথা কিনেছে নাকি। আমি হাজার টাকার মাল আনবো, ফোতো কাপ্তেনের গুমর ভাঙবো। একটা নেকলেস। মার মত নাহোক, ওর কাছাকাছি। তা-হলেই ধীরার তাক লেগে যাবে, ওর নতুন বন্ধুর চোখ চড়ক গাছ হবে।"

বার

এক শনিবার বেলা বারটায় ধীরা গেল রায়বাহাদুরের কাছে। তিনি বললেন,

"ভালই হয়েছে। সায়েবী খানা খেয়ে যাও।"

"উঁহু। আমি খাচ্ছি না মোটেই। আপনাকে শুদ্ধু খেতে দেবো না।"

"আজ তাহলে উপোস?"

"তা হতে পারে। আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব আপনাকে। তাই লাঞ্চের আগে এসেছি।"

"হঠাৎ এ দুর্বুদ্ধি?"

"আজ আমার জন্মদিন।"

"আরে! জন্মদিন? তা, আগে জানাওনি কেন?"

"আমার নিজেরই খেয়াল ছিল না। আজ সকালে মা মনে করিয়ে দিলেন।"

"তারপর সাত-তাড়াতাড়ি যত যোগাড়, নেমন্তন্ন। তোমার যেমন কাণ্ড!"

"আমার আবার কি কাণ্ড। অতিথি শুধু আপনি।"

"তার মানে?"

"মানে, একা আপনি যাচ্ছেন। আর কেউ নয়।"

রায়বাহাদুর বড় বিব্রত বোধ করেন। জন্মদিন—যাওয়া উচিত। না গেলে অভদ্রতা হবে, ধীরা মনে খুব কষ্ট পাবে, ভয়ানক চটবে। উপহার লাগবে। বাড়ি চেনেন না। ওকে সঙ্গে নিতে হবে। একটা কিছু কেনা দরকার। ও যা মেয়ে, সঙ্গে থাকলে দোকানে ঢুকতে দেবে না। হয়তো রাস্তার ওপরই গণ্ডগোল বাধাবে।

"যাচ্ছেন তাহলে?"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি বৈকি। তা, কটায়?"

"এখন বারটা। শনিবার তো। একটু আগে বেরিয়ে একটায় পঁওছাবেন। মোটেই দেরি করবেন না। খুব সামান্য আয়োজন।"

"তাহলে তো তোমাকে সাড়ে বারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এর আগে অফিস ছেড়ে বেরুনো উচিত নয়।"

"বেশ। সাড়ে বারটায় গাড়িতে চাপলেই চলবে। আমি থাকছি না কিন্তু।"

মনে একটু স্বস্তি পেলেও রায়বাহাদুর শুধোলেন—

"তুমি চ'লে গেলে বাড়ি চেনাবে কে ?"

ধীরা জবাব দিল—

"কেন ? ঠিকানা রয়েছে তো।"

"খুঁজে বার করা হ্যাঙ্গাম।"

"আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কাগজ দেখি একটুকরো।"

কাগজ নিয়ে, লাইন টেনে ধীরা একেবারে মানচিত্র এঁকে ফেললো একখানা। রায়বাহাদুরের পাশে গিয়ে নক্সা ধ'রে ভাল ক'রে রাস্তা চেনালো। আঁচল লুটিয়ে পড়লো তাঁর হাতের ওপর। সেটা তোলার সময় হাতে হাত ঠেকলো। যাবার সময় ধীরা ব'লে গেল—

"দেরি হলে শুনবো না।"

দেরি কিন্তু এড়ানো গেল না। কি উপহার দেওয়া যায় চিন্তা করতে করতে, অফিসের কাগজে সই দিতে দিতে সাড়ে বারটা বাজলো। শেষ অবধি আংটির কথা ঠিক ক'রে রায়বাহাদুর দোকানে ছুটলেন। আঙুলের মাপ জানা নেই। আন্দাজের ওপর কিনে, বাড়ি খুঁজে পঁওছাতে প্রায় দেড়টা হল।

ধীরা দাঁড়িয়েছিল ফটকে। গাড়ি থামতে দরজা খুলে রায়-বাহাদুরকে নিয়ে বসালো বাইরের ঘরে। অনুযোগও শুরু করলো—

"এত দেরি! আমি ভাবছিলাম, আসবেন না। না-এলে না-খেয়ে থাকতাম।"

রায়বাহাদুর সংক্ষেপে জবাবদিহি সারলেন—

"যাক। তাড়াতাড়ি খাবার ব্যবস্থা কর। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে।"

"একটু জিরিয়ে নিন।"

ধীরা কলিং-বেলের বোতাম টিপলো। সঙ্গে সঙ্গে প্লেটের ওপর গেলাস নিয়ে বাচ্ছা চাকর হাজির।

"কি আছে ওতে?"

"আনারস আর আদার রস মেশানো। সামান্য একটু। ভাল হজম হবে।"

রায়বাহাদুর গেলাসটা তুলে নিলেন।

"আসছি" ব'লে ধীরাও গেল পাশের ঘরে।

গেলাস নামিয়ে রেখে মুখ মুছতে মুছতে রায়বাহাদুর চোখ বোলাতে লাগালেন ঘরের চারিদিকে। অল্পের ওপর সাজানো। ধীরার পছন্দ ও রুচির তারিফ করলেন মনে মনে।

ধীরা ঢুকলো গরদের নতুন সাড়ি প'রে। এলো চুলে মানিয়েছিল বেশ। কপালে চন্দনের ফোঁটা।

"কি ব্যাপার?"

প্রশ্নের জবাব দিল ধীরা একেবারে রায়বাহাদুরের সামনে হাঁটু গেড়ে।

অবাক হয়ে রায়বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন,

"এ আবার কি?"

"কিছু নয়। পা দুটো দেখি।"

"পা দিয়ে কি হবে?"

"সামান্য একটু ধুলো চাই।"

"ছিঃ। তোমরা ব্রাহ্মণ। পায়ে হাত দিতে আছে?'

ঘাড় বেঁকিয়ে, পিঠের চুল এক হাতে সরিয়ে ধীরা বললো,

"আমার কাছে আপনি বামুনের চেয়ে অনেক বড়। জুতো খুলে পা দুটো বাড়ান।"

রায়বাহাদুর পা বাড়ালেন না, জুতো খুললেন না। ধীরা মোজার ওপর হাত বুলিয়ে মাথায় ঠেকালো।

"বড় অন্যায় করলে। আমার খুব খারাপ লাগছে।"

"আমারও খারাপ ঠেকছে।"

"স্বাভাবিক।"

"স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক। আমি সকালে খবর দিইনি। আপনি একেবারে ধরাচূড়ো প'রে হাজির। পা ঢাকা।"

ধীরা উঠে দাঁড়ালো।

"দেখি বাঁ হাতটা।"

ধীরা হাত বাড়ালো।

ছোট্ট ভেলভেটের বাক্স পকেট থেকে নিয়ে রায়বাহাদুর আংটি বার করলেন। অনামিকায় একটু আঁট। ধীরা হাত সরিয়ে নিল যন্ত্রণার অস্পষ্ট আওয়াজ ক'রে। আবার হাতটা টেনে নিয়ে রায়-বাহাদুর কড়ে আঙুলে আংটিটা পরিয়ে দিলেন। তারপর শুধোলেন—

"খুব লেগেছে তো?"

"নাঃ। জ্বালা করছে সামান্য।"

ধীরার বাঁ হাতটা আর একবার টেনে নিয়ে রায়বাহাদুর অনামিকায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

এর পর খাওয়া।

চাকর নিয়ে এল ছোট মোরাদাবাদী জাগ আর কাঁচের বড় বাউল। ধীরা এগিয়ে দিল সাবান-তোয়ালে। রায়বাহাদুর হাত ধুলেন।

রূপোর থালায় ভাত, রূপোর গেলাসে জল। রূপোর রেকাব-বাটিতে বাকি সব জিনিস। রায়বাহাদুর লক্ষ্য করলেন। ধীরা বললো,

"আপনার জন্যে আনানো।"

"আমার জন্যে রূপোর বাসন কিনেছো?"

"হ্যাঁ।"

"একদম মাথা খারাপ।"

রায়বাহাদুর খেতে আরম্ভ করলেন। গল্পও চলতে লাগলো।

খাওয়া শেষ হল ঘণ্টাখানেক পরে।

ধীরা জানতে চাইলো, রান্না-বান্না কেমন হয়েছে।

ঢেঁকুর তুলতে তুলতে রায়বাহাদুর তারিফ করলেন—

"বছর কুড়ির মধ্যে এ রকম খাওয়া হয়নি, এত রকম একসঙ্গে মুখেও ওঠেনি।

ধীরার পেড়াপেড়িতে রায়বাহাদুর পান নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—

"তোমার বাবাকে দেখলাম না?"

"তিনি বেরিয়ে গেছেন। ফিরবেন সন্ধ্যের পর।"

"অত দেরি?"

"ইস্কুল থেকে কোথায় কোথায় যাবেন যেন।"

"ভাই-বোনেরা?"

"নীরেন তো জল নিয়ে এল ক-বার। রমেন এখনও ইস্কুল থেকে আসেনি। মিনুকে ডেকে দিচ্ছি।"

মিনু এল।

ধীরা, নীরেন, মিনু—তিনজনে রায়বাহাদুরকে গাড়িতে তুলে দিল।

গাড়িতে ব'সে রায়বাহাদুর বললেন,

"যেও। বেশি খেয়ে অসুখ করলো কিনা, ফোনে জেনে নিও।"

* * *

রবিবার সকালে ধীরা ফোন ক'রে খবর নিল। দুপুরে নীরেন খাবার নিয়ে গেল। তারপর কদিন একেবারে চুপচাপ। শনিবার সকালে আবার ফোন—দুপুরে আসবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ।

রায়বাহাদুর এড়াবার চেষ্টা করলেন, বিশেষ জরুরী কাজের অজুহাত দেখালেন।

ধীরা কড়া জবাব দিল—

"আচ্ছা, আমি গিয়ে দেখছি, সত্যিই ঠেকা আছে কিনা।"

ধীরা বারটায় হাজির হল। রায়বাহাদুর অনেক বোঝালেন তাকে। সে কোনও ওজর শুনতে চাইলো না। আগের শনিবার সব পাতে প'ড়েছিল। সেই জন্যে অল্প কয়েকটা পদ করেছে। মা-ও বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন।

রায়বাহাদুর সময় মত অফিস ছেড়ে বেরুলেন। ধীরার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ড্রাইভারকে খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল। তাই নিজেই গাড়ি চালিয়ে গেলেন।

ড্রাইভারকে না-দেখে ধীরা জিজ্ঞেস করলো,

"নিজেই ড্রাইভ ক'রে এলেন?"

"হ্যাঁ। ড্রাইভার বেচারীকে আটকে রেখে লাভ কি। "বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"তবে তো আজ আর তাড়া নেই।"

"আছে বৈকি। বিকেলে কতগুলো কাগজ-পত্তর দেখতে হবে।"

"বাবা। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। আপনার দিনরাতই কাজ।"

ধীরার মন্তব্যে রায়বাহাদুর হাসলেন একটু।

কিন্তু, খাওয়া সেরে চটপট বেরিয়ে পড়া হল না।

"আসছে শনিবার আসতে হবে। খেয়াল থাকবে তো?"

ধীরার আমন্ত্রণে রায় বাহাদুর সম্মতি দিলেন না। মৃদু আপত্তি জানালেন—

"সর্বনাশ! হপ্তায় হপ্তায় এইরকম নেমন্তন্ন খাওয়া যায়?"

"হপ্তায় হপ্তায় মানে সাতদিনে একদিন। আর, খাওয়া তো শুধু ডাল-ভাত।"

"কিন্তু........"

"তাহলে আসবেন না?"

"এখন থাক। পরে দেখবো অখন।"

মুখ বুজে ধীরা চলে গেল ঘর থেকে।

রায়বাহাদুর একা ব'সে। এক মিনিট কাটে, দু-মিনিট কাটে, তিন মিনিট কাটে। রায়বাহাদুর ঘড়ি দেখেন। ধীরার সাড়া-শব্দ নেই। কি হল আবার! রায়বাহাদুর উসখুস করেন।

নীরেন ঢুকলো ঘরে। রায়বাহাদুর ডাকবার আগেই সে কাছে এগিয়ে বললো—

"দিদির অসুখ করেছে। আসতে পারবে না।"

রায়বাহাদুর আকাশ থেকে পড়লেন। অসুখ? হঠাৎ? নীরেনকে জিজ্ঞেস করলেন,

"কি অসুখ হল এর মধ্যে? এইতো ছিল এখানে।"

নীরেন উত্তর দিল—

"শুয়ে আছে। খুব অসুখ করেছে।"

"উঠতে পারছে না?"

'না।'

"তাহলে আমাকে নিয়ে চল তার কাছে।"

সাড়া না-দিয়ে নীরেন ঢুকলো গিয়ে পাশের ঘরে।

রায়বাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন। ছেলেটা আসতে দেরি করছে কেন? কখন কার শরীর খারাপ হয়, ঠিক কি। কিন্তু, ধীরার মত স্বাস্থ্যবতী মেয়ে আচমকা অসুখে পড়লো!—রায়বাহাদুর বসলেন আবার।

নীরেন ফিরলো।

"চল" ব'লে রায়বাহাদুর উঠতে যাচ্ছিলেন। বাধা পেলেন নীরেনের কথায়—

"যেতে হবে না। দিদি আসছে।"

দরজার কপাট খুলে ধীরা আসে আস্তে আস্তে। নীরেন চ'লে যায়। ধীরার চুল উস্‌কো-খুস্‌কো। চোখ দুটো লাল।

"কি হল তোমার?"

রায়বাহাদুরের উৎকণ্ঠিত প্রশ্নে ধীরার ঠোঁট দুটো ন'ড়ে ওঠে শুধু।

"কি অসুখ ?"

সামনের ইজিচেয়ারে ব'সে ধীরা চেয়ে থাকে মাটির দিকে। অসুস্থ হয়েছে, চোখ লাল, উঠে যখন এল, তেমন অসুখ নয় নিশ্চয়— রায়বাহাদুর সঠিক বুঝতে পারেন না।

নীরবতা ভাঙলো ধীরা—

"যান। কাজের ক্ষতি হবে।"

"এই যাই। কিন্তু, তোমার কি হয়েছে ?"

"কি হয়েছে ?"

ধীরার গলা আটকিয়ে গেল।

রায়বাহাদুর শুধোলেন—

"বলতে বাধা আছে ?"

"বলবো না, বলবো না। কিছুতেই বলবো না। আপনি যান। আর আসবেন না কখনও।"

রায়বাহাদুর এতক্ষণে যেন আন্দাজ করতে পারেন ব্যাপারটা। অস্পষ্ট প্রশ্ন করেন—

"আমি আসবো না শুনে রাগ করেছো ?"

ধীরা ফোঁস ক'রে উঠল—

"রাগ ? রাগ করবো কার ওপর ? নিজের দুর্ভাগ্যে চোখে জল এসেছিল আমার।"

"ছি! সামান্য কথায় এরকম মনে করে ?"

'আপনি যান, যা-আ-আন"—

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ধীরা আবার উঠে গেল।

আবার একা ব'সে রইলেন রায়বাহাদুর। নিজেকে তাঁর ভয়ানক অপরাধী মনে হচ্ছিল। খেতে আসবেন না শুনে মেয়েটা কান্নাকাটি করেছে। নিতান্ত মানসিক আঘাত ছাড়া চোখে জল আসবে কেন ? আঘাতটা কিসের ? ভাবতে গিয়ে একটু আত্মপ্রসাদও আসছিল

রায়বাহাদুরের মনে। তিনি নিমন্ত্রণ র'ক্ষে না-করলে অনেকে দুঃখিত হয়, অনেকে চ'টে যায়। কেঁদে ভাসায় কি কেউ? প্রত্যেক শনিবারে খেতে আসা মানে এদের কষ্ট দেওয়া। ধীরা কত রকম রান্নার যোগাড় করে। কিন্তু, কষ্টই পেতে চায়। মেয়েদের নিয়ম এই। হারুর মা রাত দুপুরে গরম ভাত বেড়ে দিত। মানা করলে শোনেনি কখনও।........মরুকগে। শনিবার দুপুরে খেতে বড় রকমের কোনও বাধা যখন নেই, আসতে দোষ কি? বাড়িতে বা অফিসে কেউ জানছে না। জানলেও মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। তাছাড়া, কারুর মনে করবার কি থাকতে পারে এতে।

রায়বাহাদুর কর্তব্য স্থির ক'রে ফেললেন। বাকি শুধু ধীরাকে জানানো। নীরেন ঘরে ঢুকতে তিনি হাঁফ ছাড়লেন।

"ডাকো তো দিদিকে।"

রায়বাহাদুরের আন্তরিক আগ্রহ বোঝার মত বুদ্ধি ছিল না নীরেনের। সে তোতাপাখির মত আওড়ালো—

"আপনি যান। দিদি আর আসবে না।"

"ডাকো না তুমি একবারটি।"

ডাকতে হল না।

ধীরা এসে দাঁড়ালো।

রায়বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন,

"আসছে শনিবার গরম খিচুড়ি আর ডিমের বড়া কিন্তু।"

ফিক ক'রে হেসে ফেললো ধীরা।

"আজ তবে যাই?"

"হ্যাঁ। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।"

ধীরাকে প্রসন্ন দেখে রায়বাহাদুর উঠলেন।

ধীরা এগিয়ে দিল গাড়ি পর্যন্ত।

রায়বাহাদুর হাল্কা মনে বাড়ির দিকে গাড়ি হাঁকালেন।

তের

পূর্ণবিকাশ এল একদিন সকালে।

ধীরা অভ্যর্থনা জানালো—

"আজকাল একেবারে তুর্লভ-দর্শন। দেখাই মেলে না।"

পূর্ণবিকাশ কৈফিয়ৎ দিল,

"পরীক্ষা এসে গেছে।"

"কবে ?"

"মাস চারেক মোটে বাকি।"

"তাতেই টিকিটি মিলছে না।"

"দেখা করবো মাঝে মাঝে।"

"কদিন ধ'রে ভাবছি, বীরেন বাবুকে পাঠাবো, আপনি কেমন আছেন, খোঁজ নেবার জন্যে।"

"বীরেনবাবুকে পাঠাবেন ভাবছিলেন ?"

"সেই জন্যেই টেলিপ্যাথির মত একটা কিছু হয়েছে। নইলে, আপনি নিজে থেকে আসবার পাত্র নাকি ?"

"বিশ্বাস করুন। আজ আসবো ঠিক করেছি এক হপ্তা আগে।"

"আরও তু'চার হপ্তা পরে এখানে পায়ের ধূলো দিলেই বা দোষ কি ছিল ?"

"এইটে এনেছি আপনার জন্যে।"

পূর্ণবিকাশ পাঞ্জাবির পকেট থেকে বার করলো ছোট্ট একখানা ডায়েরি। পছন্দ হওয়ার মত। ধীরার সামনে রেখে বললো,

"কাল পাবার কথা ছিল। কালই পেয়েছি।"

"সুন্দর জিনিস। আমার নাম-ঠিকানাটা লিখে দিন।"

ডায়েরি নিয়ে তার প্রথম পাতায় পূর্ণবিকাশ ধ'রে ধ'রে লিখতে লাগলো। ধীরা তার মোড়াটা টেনে নিয়ে গেল পূর্ণবিকাশের পাশে।

"ওমা। মুখোপাধ্যায় কি! বুড়ো ভাববে লোকে।"

ধীরার মন্তব্যে পূর্ণবিকাশের মুখ শুকিয়ে গেল। অপরাধীর মত জিজ্ঞেস করলো—

"কেটে দোবো? একটা ইরেজার পেলেও হত। ঘ'ষে তুলে ফেলতাম।"

"থাক। অত কেরামতির দরকার নেই। ভাল চেহারা হলে, ভাল ছাত্র হলেই বুঝি সব? ঘটে একটু বুদ্ধি থাকা চাই।"

ধীরার কথায় পূর্ণবিকাশের বুক ফুলে উঠলো। ডায়েরিখানা ধীরার কোলের ওপর আলতো রেখে বললো,

"পরীক্ষা এগিয়ে এলেও আপনি হুকুম করলেই হাজির হব।"

"না। দরকার নেই, বাবা। ক্ষতি হবে আপনার।"

"মোটেই নয়। আদেশ পেলে রোজ আসবো।"

"রোজ সম্ভব হবে না। পরীক্ষা গোল্লায় যাবে। যদি হপ্তায় ছুটো দিন সকালে এসে নীরেন-মিনুর পড়াটা দেখে দিতেন।"

"সকালে? ঘুমোতে রাত হয়। উঠি বেলায়। একটু দেরি হবে মাঝে মাঝে।"

"তা হোক। সকালেই আসবেন। বাড়িতে কোনও ভীড় থাকে না।

দেবনারায়ণের খাওয়া-ঘুম ঘুচে গেছিলো। চব্বিশ ঘণ্টা মাথায় ঘুরতো ধীরার কথা—নতুন বন্ধু রূপোর বাসন দিয়েছে, আরও কত কি দিচ্ছে, দেবে। আর সে? বাবার শাসনে অতিষ্ঠ। কিছুই করতে পারছে না। মা ভালো। কিন্তু, বাবার জ্বালায় তাঁর কি কিছু করবার উপায় আছে? এত পয়সা। একমাত্র ছেলে সে। তার হাতে তুলে দেবে না কিছু। স্নেহ-মমতা নেই, দয়া-মায়া নেই। বাবার কাছে কারবারই সব। এরকম লোকের সঙ্গে টেকা দায়। এভাবে বেঁচে থাকা ঝকমারি।

টাকা-পয়সা সরানোর পথ নেই। গয়না-টয়না হাতে পাবার উপায় নেই। তবু, ভাবনার কড়া পাকে দেবনারায়ণের মাথা খেলে যায়। ঠাকুরের গায়ে গয়না রয়েছে। জড়োয়া জিনিস সব। রাধার গলায় একখানা বড় লকেট। গোবিন্দের বাঁশিটায় পাথর বসানো। মুকুট দুখানায়ও তাই। ঠাকুরের গয়না দিয়ে ইজ্জৎ বাঁচাতে হবে।

সিন্ধুক থেকে টাকা সরাবার আগে ভয় ধরেছিল ভয়ানক। এবার দেবনারায়ণ আর তত ঘাবড়ালো না, তত খারাপও লাগলো না। গয়না হাতিয়ে বেমালুম চুপচাপ থাকা, না-হয় মেকি জিনিস তৈরি করিয়ে পাল্টে দেওয়া। পাল্টাতে পারলে একদম নিশ্চিন্তি।

দেবনারায়ণ দেহ-মনে পুরো-দস্তুর আলসে। কাজেই দ্বিতীয় পথে এগুতে পারলো না। যা করবার, একদিনে করবে, সব ঝুঁকি একদিনে খতম হবে। সকালে একদম অসম্ভব। দুপুরের দিকে মা খেতে যান নীচে। তখন নিতে পারলে বিক্রি, না-হয় বদল। বদল ক'রে একটা ভাল নেকলেস নিলে দোকানদারও কিছু বুঝতে পারবে না।

নেকলেসটা হাতে দিলে ধীরা অবাক হবে, খুশীও হবে খুব। এ আর রূপোর বাসন নয়। নতুন বন্ধুটি ভেগে পড়বে ঠিক।

দেবনারায়ণ মনে মনে পঞ্চাশ বার ভেঁজে নিল কিসের পর কি করবে। মা খেতে নামলেই দরজা খোলা চলবে না। তাড়াহুড়ো বাদ দিয়ে, একটু দেরি ক'রে শেকলটা নামাতে হবে আস্তে আস্তে। গয়না নেবার পরও শিকলি তুলে লাগাতে হবে সাবধানে, তারপর ঘরে ঢুকে কাগজে মুড়ে সব পকেটে রাখা। দু-পকেটে আধাআধি ক'রে।

দিন দুই মনে মনে রিহার্সাল চালিয়ে, দুপুরে একবার ক'রে দেখে নিয়ে, খানকত গয়নার দোকান যাচাই ক'রে দেবনারায়ণ তৈরি হল। প্রথম প্রথম বই, কলম দিতো গোবর্ধনের হাতে। সে বেচতো।

তারপর সরাসরি নিজে কাজে নামে। সামনে যে দোকান পেতো, ঢুকে প'ড়ে কোনও রকমে বই দিয়ে টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তো। তারপর, অভিজ্ঞতার গুণে শিখলো, পাঁচ জায়গা ঘুরে বেচলে বেশি দাম মেলে। গয়না-বদলের খোঁজে সবার আগে গেল রূপোর বাসন যেখানে দেখেছিল, সেই দোকানে। তার কথা খেয়াল না-থাকলেও দোকানদার খাতির করলো। পুরো সেট রূপোর বাসন কেনার মত খদ্দের। জড়োয়া নেকলেস নিতে চায়। বদলে গয়না দেবে, দিক।

দেবনারায়ণ পাঁচটা দেখে একটা নেকলেস পছন্দ করলো। বললো, "দিদির জিনিস। দূরে থাকে। নিয়ে চলে যাবে।"

বাড়ি ফিরে রাত্তিরে দেবনারায়ণের অনবরত মনে হতে লাগলো —আর একটা দিন। শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগলো।

* * *

একটুও অসুবিধে হল না। গয়না নিয়ে দেবনারায়ণ সাজগোজ সেরে বেরুলো। আর বাড়ি ফেরা হবে না। সিধে ধীরার ওখানে যেতে হবে।

বিকেলে নেকলেসের কেসটা হাতে দিতে ধীরা তাকে প্রশ্ন করলো—

"এতে আবার কি এনেছেন?"

গদগদ স্বরে দেবনারায়ণ তাকে খুলে দেখতে অনুরোধ করলো।

কেসটা খুলে ধীরা আবার নিস্পৃহ ভাবে শুধোলো,

"কার জিনিস?"

"আন্দাজ করুন।"

"আমি কি গুণতে জানি? বিয়ে করছেন নাকি?

মুখ রাঙিয়ে দেবনারায়ণ উত্তর দিল—

"ধ্যেৎ। আপনাকে দেখাতে এনেছি।"

"এ রকম দামী নেকলেস। আমি দেখে কি করবো। আমার মত লোকের পক্ষে কেনা অসম্ভব।"

"কি বিপদ। আপনিই তো পরবেন।"

"দাম দিতে হবে না?"

"কিনে আনলাম আপনার জন্যে।"

"ও। তবে দেখি।"

নেকলেস তুলে গলায় ঝুলিয়ে ধীরা ভেতরের ঘরে গেল। প্রত্যাশায় দেবনারায়ণের বুকে হাতুড়ি-পেটা চলতে লাগলো। ইচ্ছে ছিল, পরিয়ে দেবে নিজের হাতে। তা হল না। না হোক। অমন গয়না। মনে ধরবে।

ধীরা ঘুরে আসতেই উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে জিজ্ঞেস করলো—

"পছন্দ হয়েছে তো?"

"মন্দ নয়।"

দেবনারায়ণ মুশড়িয়ে পড়লো শুধু চাঁছা-ছোলা "মন্দ নয়" শুনে। সে ধুপ ক'রে কৌচে বসতেই ধীরা জানতে চাইলো, দাম কত।

"কত মনে হয়?"

"কত আর হবে। আপনি যে কিপ্‌টে। শ'চার-পাঁচের বেশি নয়।"

"আজ্ঞে না। বারোশো।"

"গুল দিচ্ছেন বীরেনবাবুর মত।"

"রসিদ দেখাতে পারি।"

ক্ষুব্ধ দেবনারায়ণকে ধীরা ঠাণ্ডা করলো—

"না, না। রসিদ দেখাবেন কেন। নেকলেসটা সত্যিই চমৎকার।"

আহ্লাদে আটখানা দেবনারায়ণ কৌচের মধ্যে নড়-চড়া শুরু করলো। নতুন বন্ধুটির কথা তুলতে হবে এক ফাঁকে। তার বারোটা না-বাজালে চলবে না।

গলা থেকে নেকলেসটা খুলে ধীরা ডাকলো—

"আসুন তো দেখি।"

এই মওকায় নতুন বন্ধুর দফা নিকেশ করতে হবে। পরম উৎসাহে দেবনারায়ণ গিয়ে দাঁড়ালো ধীরার সামনে।

"গলাটা নীচু করুন।"

দেবনারায়ণ মেঝের ওপর উবু হয়ে বসলো।

ধীরা মোলায়েম হাতে তার গলায় নেকলেসটা পরিয়ে দিল।

দেবনারায়ণের সর্বাঙ্গ বিবশ হয়ে আসে। চোখের পাতা জুড়ে যায়।

ধীরা চুল ধ'রে না-নাড়লে কতক্ষণ ঐভাবে থাকতো, ঠিক নেই। ধীরায় কথায় তার মাথায় শুরু হল চরকিবাজি—

"চমৎকার মানিয়েছে। উঠুন এবার।"

নতুন বন্ধুর কথা তোলা গেল না। না যাক। দেবনারায়ণ ধন্য হয়ে কৌচে ফিরলো। তার জীবন সার্থক। অনাস্বাদিত অনুভূতিতে সে কাঁপছিল।

"কি? ওটা প'রেই বাড়ি যাবেন নাকি?"

ধীরার ঠাট্টায় ধাতস্থ হয়ে স্মিত হাসিতে মুখ ভরিয়ে দেবনারায়ণ নেকলেস খুলতে গেল। পারলো না।

"ও আপনার কম্ম নয়" ব'লে ধীরা উঠলো। নেকলেস খুলে নেবার সময় তার আঁচলটা পড়লো দেবনারায়ণের গায়ে।

নেকলেস কেসের মধ্যে পুরে ধীরা ফের ভেতরে গেল। ফিরে এল রূপোর থালায় কয়েকটা সন্দেশ নিয়ে। রূপোর গেলাসে জল।

"আপনি সন্দেশ-রসগোল্লা পছন্দ করেন না। তবুও আজ মিষ্টি মুখ করুন।"

সন্দেশ কটা মুখে পুরতে পুরতে দেবনারায়ণ গুছিয়ে আনলো তার নিবেদন। আবেগে আর সন্দেশ-রসগোল্লার চাপে গলা বুজে এসেছিল।

"নতুন……নতুন……"

—সাফ ক'রে আর বলা হল না। ধীরা যবনিকা টেনে দিল মুখপাতেই—

"বাবা এসে পড়বেন এখুনি। আমারও একটু ভেতরে কাজ রয়েছে। বাড়ি যান। আর একদিন গল্প হবে অনেকক্ষণ ধ'রে।"

মনটা দ'মে গেল দেবনারায়ণের। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যা করেছে, একটার পর একটা সব ভেসে উঠলো চোখের সামনে। বিদায় নিয়ে একপায়ে দুপায়ে এগুতে লাগলো বাস-রাস্তার দিকে।

বাড়ি ঢোকবার সময় দেবনারায়ণের ভয় ধরলো খুব। হয়তো নিচে থেকেই বাবার তর্জন-গর্জন কানে আসবে। কিন্তু আতঙ্ক কাটলো তার দোতলায় উঠে।

খাওয়ার সময় মা এসে বসলেন সামনে। বললেন—

"তুই বাড়ি নেই দুপুর থেকে। শুনে কর্তার কি মাথা গরম—"

কান খাড়া করে দেবনারায়ণ, বুক ধড়ফড়ানি শুরু হয়, বমি আসে। কিন্তু, হাঁফ ছাড়ে সে সঙ্গে সঙ্গে। পরদিন কর্তার কি বড় মামলা আছে। সকাল সকাল বেরুবেন। সঙ্গে নিয়ে যাবেন দেবনারায়ণকে। না-দেখতে পেয়ে বকাবকি করেছেন।

নিশ্চিন্তি বটে। তবু দেবনারায়ণ খেতে পারলো না। মা অনুযোগ করলেন—

"আজকাল খাস না পেট ভ'রে। শরীর খারাপ হচ্ছে। চোখের কোল ব'সে যাচ্ছে।"

নিশ্চুপ দেবনারায়ণ উঠে পড়লো।

বেরুবার তাড়ায় বাবা ব্যস্ত, মারও ছুটি নেই—পরদিন সকালে বিছানায় পাশ ফিরতে ফিরতে, হাই তুলতে তুলতে সে মনকে প্রবোধ দিতে লাগলো।

বাবার নজরে পড়বে না, মা দেখলেও বাবাকে জানাবে না। বকবে, বকুক। শরীর খারাপ ব'লে শুয়ে থাকাই ভাল। বাবা চ'লে গেলে উঠবে। দেবনারায়ণ বুদ্ধি ঠিক ক'রে চোখ বুজলো।

কিন্তু, বেশিক্ষণ কাটলো না। মা এসে ডাকলেন—

"উনি খেতে বসবেন এখুনি। তুই এর মধ্যে নেয়ে-ধুয়ে নে! এখন জল খেয়ে যাবি। দুপুরে এসে ভাত খাস।"

দেবনারায়ণ উঠলো, চোখ-মুখে জল দিয়ে এল। খেতে ব'সে কর্তা বকছিলেন—

"নবাবপুত্তুর। এতক্ষণে মাথায় জল দেবারও সময় পাননি। ওকে নিয়ে যেতে গেলে মামলার দফা নিকেশ হবে।"

বাথরুমের দিকে এগুতে এগুতে বাবার তিরস্কার কানে এল। তবু দেবনারায়ণের মন খানিকটা প্রসন্ন। ফাঁড়া কেটে আসছে। বাথরুমে ভাল ক'রে সাবান ঘসতে লাগলো গায়ে। কোর্টে কত লোক আছে। আরও কয়েকবার সে গেছে বাবার সঙ্গে। আনমনে গুণগুণিয়ে সে সিনেমার গান ধরলো একখানা।

সময়ের খেয়াল ছিল না। গান থামিয়ে কখন ধীরার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছে। হাত চলছে আস্তে আস্তে। দেবনারায়ণ চমকে উঠলো মার আর্ত চীৎকারে—

"ও দেবু, বেরো শীগ্‌গির।"

"দাঁড়াও। গায়ে সাবান রয়েছে।"

"সাবান? সাবান রয়েছে গায়ে? দেখাচ্ছি মজা। সাবান মাখবি গিয়ে হাজতে।"

দেবনারায়ণ কাঁপতে কাঁপতে বাথরুমের কলটা ধরলো দুহাতে। তার কানে এল মার গলা—

"তোমার পায়ে পড়ি, কিছু কোরো না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কোর্টে যাও। দোহাই তোমার। কোর্ট থেকে এসে যা করবার করবে।"

কিন্তু, বাথরুমের দরজায় লাথি পড়লো গোটাকত। দেবনারায়ণকে তাই বেরুতে হল। সিঁড়ির মাথায় ঝি, চাকর, ঠাকুর—সবাই এসে জড় হয়েছিল। তাদের দিকে এক নজর দেখে বাবা-মাকে এড়িয়ে সে তাড়াতাড়ি যাচ্ছিল নিজের ঘরে।

দাঁড়াতে হল কর্তার হুঙ্কারে—

"পালাচ্ছিস কোথা? চোর! শূয়োর!"

দাঁড়ানো মাত্র তেড়ে এসে তিনি এক ঘা জুতো কসালেন মুখে। মা সামনে গিয়ে হাত না-ধরলে আরও কয়েক ঘা পড়তো। ঝি-চাকর-ঠাকুর এগিয়ে মিনতি শুরু করলো—

"ছেড়ে দিন, বাবু, আজকের মত।"

কর্তা চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকলেন। দেবনারায়ণ মাথা নিচু ক'রে স'রে গেল সেখান থেকে।

দরজায় খিল দিয়ে মুখের কাদা মুছতে মুছতে সে চাপা গলায় বললো—

"আচ্ছা, আমিও দেখে নোবো।"

গালের ওপর মস্ত দাগ। জ্বলছিল, ফুলে উঠেছিল। আয়নায় নজর করতে করতে ধীরার মুখখানা যেন চোখের ওপর ভেসে উঠলো। তার কাছে যাবে কি ক'রে! রাস্তায় পা বাড়োনোই দায়! লোকে দেখে কি ভাববে! দেবনারায়ণ মনে মনে গজরাতে লাগলো, "বুড়ো ক্ষেপে উঠেছে একেবারে। এমন শোধ তুলতে হবে, যাতে সারা জীবনে ভুলবে না।"

দুপুর পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে দেবনারায়ণ শুধু একই কথা ভাবতে লাগলো—চাকর-বাকরের সামনে অপমান! ঠিক ঐ রকম ক'রে ওদের দেখিয়ে পাল্টা অপমান দরকার!

কিন্তু, আক্রোশ মেটানো সম্ভব হলেও শেষে গিয়ে দাঁড়াতে হবে রাস্তায়। তাড়িয়ে দেবে। এমনিতেও বিকেলে ফিরে আবার কি করবে, ঠিক নেই। রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো। কোথায় খাবে, কোথায় শোবে! খেতে দেবে কে?—দেবনারায়ণের মাথা খেলছিল না। বাপের ওপর নিষ্ফল, চরম বিদ্বেষে ফুঁসছিল।

দরজায় ঠুক ঠুক ক'রে টোকা পড়লো। দেবনারায়ণ সাড়া দিল না।

আওয়াজটা থামলো না। শেষে মা-র গলা শোনা গেল—

"দেবু, ও দেবু। বাইরে আয়। কত বেলা হয়ে গেল।"

ক্ষিধে লেগেছিল। রাগ ক'রে না-খেয়ে থাকার অভ্যেসও নেই। দেবনারায়ণ তাই দরজা খুললো।

"খাবি চ।"

"না। তোমাদের বাড়িতে আমি আর খাব না।"

—রাগ দেখিয়ে দেবনারায়ণ ফিরে যাচ্ছিল বিছানার দিকে। মা এসে হাত ধরলেন।

দেবু হাত ছাড়াতে গেল। মা বোঝাতে লাগলেন—

"গুরুজন। শাসন করবে বইকি। একমাত্র ছেলে তুই। ঠাকুর নমস্কার করতে ঢুকেই রেগে আগুন। সব দিকে নজর। তুই বলতো সত্যি ক'রে, ঠাকুরের গয়না নিয়েছিস কিনা।"

"তোমাদের ঝি-চাকরকে জিজ্ঞেস কর।"

"কর্তা তো কিছুতেই মানতে চায়নি যে, ওরা নিয়েছে। টাকা চুরি হল সিন্ধুক থেকে। তারপর গয়না। কি জানি, কাকে দোষ দেবো। আগের বার তো পুলিশ ঝি-চাকর-ঠাকুরকে পুরো একটা দিনও আটক রাখেনি।"

"আমার ঘাড়েই সব দোষ চাপাও। আমি বিদেয় নিচ্ছি।"

"বালাই ষাট। না-খেয়ে ভরদুপুরে এরকম অলুক্ষুণে কথা মুখে আনিসনি। নিচে যেতে ভাল না-লাগে, এইখানে আনিয়ে দিচ্ছি।"

দেবনারায়ণ চুপ ক'রে রইলো।

ভাত এল। সামনে ব'সে থেকে মা খাওয়ালেন।

থালায় আঁচানো সেরে দেবনারায়ণ গায়ে জামা চাপাচ্ছিল। মা বেরুতে বারণ করলেন। সে আবার শুয়ে পড়লো দরজা বন্ধ ক'রে।

বাপের ওপর রাগটা তখনও পাকাচ্ছে। বিকেলে এসে জুতো

মারলে সে-ও ছেড়ে দেবে না। হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাওয়াই ভাল। মনে মনে গজরাতে গজরাতে দেবনারায়ণের তন্দ্রা এল।

সদরের দিকে কি রকম একটা পাঁচ-মিশেলি গোলমাল হচ্ছিল। ঘুমের আমেজ ছুটে গেল। দেবনারায়ণ তবু উঠলো না। কিন্তু, ওপরেও যেন কারা এল। অনেকে একসঙ্গে কথা বলছে। কর্তার গলা কানে আসছে না। ভাল ক'রে শুনে সে দরজা খুললো।

তিনতলার বারাণ্ডায় ভীড়। কালো কোট গায়ে উকিল। কোট-প্যাণ্ট-পরা কয়েকজন। ম্যানেজারবাবু। আরও লোক জমা হয়েছে। ব্যাপার কি?—বাবা নেই তাদের মধ্যে। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে দেবনারায়ণ ম্যানেজারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

তাকে দেখে ম্যানেজারবাবু সবাইকে বললেন—

"কর্তার ছেলে এসেছেন।"

দেবনারায়ণ উঁকি মারলো বাবার ঘরে। তিনি শুয়ে আছেন খাটে। মা মাথার ধারে ব'সে। ঘোমটা নেই মাথায়। চোখে জল। ডাক্তার বুক পরীক্ষা করছেন।

দেবনারায়ণ ভাবলো, চোখ বুজে রয়েছে যখন, দেখতে পাবে না। গিয়ে দাঁড়ালো ডাক্তারের পেছনে।

নাড়ি টিপে, বুক দেখে, চিন্তিত মুখে ডাক্তার ম্যানেজারকে নিয়ে বেরুলেন ঘর থেকে। ম্যানেজার ডাকলেন দেবনারায়ণকে। দেবনারায়ণ শুনলো রোগের কথা। সবটা বুঝলো না। অজ্ঞান হয়ে যান কোর্টে। পুরো জ্ঞান ফিরে আসেনি। কোনও রকমের উত্তেজনা চলবে না। ওষুধ, পথ্য লিখে দিয়ে ডাক্তার বিদায় নিলেন।

দেবনারায়ণ মনে বল পেল বেশ খানিকটা। অসুখ হয়েছে। সেরে উঠতে দেরি হবে। উপস্থিত কিছুদিন বাঁচোয়া।

ওষুধ-পত্র এনে ম্যানেজার সব বুঝিয়ে দিলেন। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে দেবনারায়ণের মা চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। শেষে ব্যাকুল ভাবে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

"কোনও ভয় নেই তো?"

ম্যানেজার পুরোনো লোক। বয়েসে কর্তার থেকে কিছু বড়। সংসারের সব কাজে দায়িত্ব নেন। সান্ত্বনা দিলেন,

"ভাল-মন্দ ভগবানের হাত। তবে তেমন কিছু খারাপ নয়।"

পাশে দাঁড়িয়ে দেবনারায়ণ ম্যানেজারের কথা কটা গিললো। তিনি চ'লে যেতে ঢুকলো গিয়ে নিজের ঘরে। তার কানে বাজছিল গোবর্ধনের হাসি—"টেঁসে যাবে আর বছর দশেকের মধ্যে। তারপর তো তুই রাজা রে।"

রাতে পেট ভ'রে খেয়ে, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে, সকালে মার কাছে খবর নিল দেবনারায়ণ। সারারাত জেগে ছিলেন তিনি। জ্ঞান হয়নি।

ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ম্যানেজার এলেন। ডাক্তার দিন-রাতের জন্যে নার্স রাখতে বললেন। দেবনারায়ণের কোনও মতামত ছিল না। তার মা কিন্তু সায় দিলেন না। নিজেই স্বামীর সমস্ত সেবা করবেন তিনি।

বাপের শুশ্রূষা নিয়ে, ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না দেবনারায়ণের। গালের দাগটা মিলিয়ে এসেছিল। ঠিক করলো, বাবা পটল না-তুললে সন্ধ্যের মুখে ধীরার ওখানে যাবে।

বিকেলের দিকে কর্তার একবার জ্ঞান হয়েছিল। চারদিক চেয়ে দেখেছিলেন। মার কাছে শুনে, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে দেবনারায়ণ বেরিয়ে পড়লো। ধীরার কাছে বেশি দেরি করা ঠিক হবে না। ম্যানেজারটা আসবে। ওর বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। না-দেখলে কাল ভাল ক'রে শোনাবে।

ধীরা বাড়িতে ছিল না। বসতে হল অনেকক্ষণ। ঢুকেই তার একগাল হাসি আর প্রশস্তি,—

"দেখুন, আপনার নেকলেস পরে একটা ফাংশনে গেছিলাম। সবাই তারিফ করলো—একেবারে হালফ্যাশানের জিনিস।"

সঙ্গে সঙ্গে দেবনারায়ণ খোশমেজাজে জুড়ে দিল—

"নেকলেসের মত হাতের গয়নাও তো চাই।"

ধীরা বেজায় খুশী। তালে তালে পা ফেলতে ফেলতে কৌচে বসলো।

দেবনারায়ণ বারবার চায় তার দিকে। সে-ও দৃষ্টি মেলে রাখে দেবনারায়ণের ওপর। হঠাৎ যেন আকাশ থেকে পড়ে—

"ওমা! গালে কি হল? কেউ থাপ্পড় মেরেছে বুঝি?"

"না।"

"তাহলে? নিশ্চয় কেউ বেশি রকম আদর করেছে।"

দেবনারায়ণের পক্ষে এর পর আর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই, আসল কাহিনী বেফাঁস না-ক'রে সে শুধু বাবার জুলুমের কথাটুকু জানালো।

ধীরা রেহাই দিল না। প্রশ্ন করলো—

"শুধু শুধু গালের ওপর থাপ্পড়? এত বড় ছেলেকে ধ'রে মারা! নেশা করেন নাকি?"

"ভয়ানক বদরাগী। আমার ওপর অত্যাচারের ফলও পেয়েছে হাতে হাতে।"

"কি রকম?"

"কাল একটা মামলা ছিল। কোর্টে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।"

"জ্ঞান হয়েছে?"

"একবার চোখ চেয়েছে। কিন্তু, মুখ দিয়ে টুঁ-শব্দটি বেরুচ্ছে না।"

"ভাল ডাক্তার দেখান। ওষুধ-বিষুধ খেলেই সুস্থ হবেন।"

"এখন কিছুদিন জ্ঞান ফিরে না-পেলে বেঁচে যাই।"

"সে কি?"

"সত্যি কথা। মুখ চালাতে পারলেই যা-তা বকতে শুরু করবে।"

"ঘুমের ওষুধ খাওয়ান।"

"কোথায় পাব?"

"ডাক্তার প্রেসক্রিপসান লিখে দিলে ওষুধের ভাবনা কি।"

"ডাক্তার আমার কথা শুনবে না।"

"তা হলে কাল রাত্তির পর্যন্ত ব্যবস্থা হতে পারে। আমি প্রেসক্রিপ্‌সান আনিয়ে রাখবো।"

পরের দিন সকালে পূর্ণবিকাশ আসতেই ধীরা ফরমাইস করলো—

"ঘুমের জন্যে কড়া ওষুধের প্রেসক্রিপসান দরকার। চট ক'রে। আজ আর পড়াতে হবে না। দুপুর নাগাৎ পাওয়া চাই।"

ধীরার আদেশ। পূর্ণবিকাশ ছুটলো আগের বছর পাশ-করা এক ডাক্তারের কাছে। কলেজে খাতির ছিল তার সঙ্গে।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করতে মনে পড়লো, রুগীর পরিচয়টা জানা হয়নি। ধীরার বাবা হতে পারেন। বেশি চিন্তা করার সময় ছিল না। পূর্ণবিকাশ ওষুধ লেখালো রাখাল মুখুজ্জের নামে।

ধীরার বাবা হলে ওষুধটা কিনে দেওয়াই উচিত। দামও খুব বেশি নয়। দু-ঘণ্টা ক্লাশ কামাই ক'রে পূর্ণবিকাশ ঘুমের ট্যাবলেট পঁওছালো। ধীরাকে সাবধান ক'রে দিল—"কড়া জিনিস। এক রাতে একটার বেশি দুটো নয়।"

সন্ধ্যে না-হতে দেবনারায়ণ এল। ধীরা আঙুল নেড়ে বললো, "আমি এক কথার মানুষ। ওষুধ আনিয়ে রেখেছি দশটার মধ্যে।"

ট্যাবলেট হাতে নিয়ে দেবনারায়ণ জিজ্ঞেস করলো—

"কি রকম ভাবে খাওয়াবো?"

"দুটো বড়ি একসঙ্গে। তাতে না-হলে আরও বেশি।"

বাড়ি ফিরে দেবনারায়ণ হাল্কা হতে পারলো না। মা সব সময় বাবার শিয়রে ব'সে। সে কি ক'রে খাওয়াবে। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না। ভগবানের ইচ্ছেয় বাবা বিছানা নিয়েছে। বাকিটা নিশ্চয় হবে।

দেবনারায়ণ শুয়ে শুয়ে ফন্দি ঠিক করলো। মা স্নান ক'রে ঠাকুর ঘরে ঢোকেন। তাঁকে ব'লে সেই সময়টা মাথার ধারে বসতে হবে। তারপর গোটা চার-পাঁচ ট্যাবলেট মুখের ভেতর দিয়ে দিলেই হল। কাজটা জটিল নয়।

দেবনারায়ণ সারারাত প্রায় একটানা ঘুমোলো। স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙেছিল একবার। অদ্ভুত স্বপ্ন—বাড়িটা ভেঙে পড়ছে, সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, মা ছাতে। হুড়মুড় ক'রে ধ্বসে যাচ্ছে পাঁচিল, ছাত।

সকালে মা-র অনুমতি মিললো এক কথায়। বললেন, "দেখলি তো! রাগ ক'রে থাকতে পারলি কি! হাজার হোক, বাপ-ছেলের সম্পর্ক।"

দেবনারায়ণ বসলো গিয়ে বাপের বিছানায়। তারপর সময় বুঝে তাঁর মুখে পাঁচটা ট্যাবলেট একসঙ্গে পুরে দিল। সামান্য জ্ঞান ছিল। চোখ টান করলেন খানিকটা। নিঃশ্বাস পড়ছিল জোরে জোরে, ঘনঘন। মুখটা সামান্য ন'ড়ে উঠল। মা-র যেন আর হয় না। কাজ শেষ। দেবনারায়ণ স'রে পড়তে পারলে বাঁচে।

ছেলে আছে রুগী নিয়ে। মা ঠাকুর-ঘরে কাটিয়ে এলেন অনেকক্ষণ। ঘরে ঢুক ছেলেকে শোনালেন আত্মপ্রসাদের কথা—

"ম্যানেজারবাবু নার্স রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তুই-আমি যা করবো, তা-কি ভাড়াটে লোক পারবে? সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যেয় তুই একটু ক'রে বসবি। তাহলেই চলবে।"

অত আদিখ্যেতা পোষাবে না। দেবনারায়ণ তাই ওজর দেখালো—

"কাল রাত্তিরে একদম ঘুমোইনি। দুপুরে একটু ঘুমোবো। এক বন্ধুর টাইফয়েড হয়েছে। তাকে দেখতে যাব সন্ধ্যের পর।"

মা ছুটি দিলেন ছেলেকে—

"আচ্ছা। আমি একাই পারবো।"

দেবনারায়ণ সন্ধ্যেয় হাজির হল ধীরাদের বাড়ি।

ধীরা জিজ্ঞেস করলো—

"বাবার ঘুম হয়েছে তো?"

"হ্যাঁ। বিকেল অবধি চোখ বোজা। চায়নি একবারও।"

"কাল আবার দেবেন। তিনটে, চারটে—যা হয়।"

কিন্তু, আর ট্যাবলেট দরকার করলো না। শেষ রাতে মা-র কান্নায় দেবনারায়ণের ঘুম ছুটে গেল। হুড়মুড়িয়ে দরজা খুলে সে তিন লাফে হাজির হল পাশের ঘরে। বাবার পায়ে মুখ গুঁজে মা আর্তনাদ করছেন—

"আমাকে, দেবুকে ফেলে তুমি কোথায় গেলে গো"......ঝি কাঁদছে দাঁড়িয়ে। ঠাকুর-চাকর চোখ মুছছে।

দেবনারায়ণও চেঁচিয়ে উঠলো—

"বাবাগো......"

চোদ্দ

রায়বাহাদুর পালা ক'রে খিচুড়ি খেলেন, মুড়িঘণ্ট খেলেন। প্রত্যেক শনিবার দুপুরে ধীরাদের বাড়িতে তাঁর বাঁধা-বরাদ্দ নেমন্তন্ন দাঁড়িয়ে গেল। অনেক অনুনয় ক'রে, অনেক বুঝিয়ে, বদহজমের অজুহাতে তিনি রবিবারের পালাটা বন্ধ করলেন।

খাওয়ার পর গল্প। গল্প থেকে বিশ্রাম। এঁটো থালা-গেলাস-বাটি ধীরা নিজের হাতে ভেতরে নিয়ে যায়। রায়বাহাদুর একদিন জিজ্ঞেস করতে ভারিক্কি জবাব দিয়েছিল—

"আপনার প্রসাদ পাই।"

"তোমার সবই অদ্ভুত। তোমরা ব্রাহ্মণ। আমার সংস্কারে বাধে। এ সবের কোনও মানে হয় না।"

রায়বাহাদুরের কথায় ধীরা বলেছিল—

"অত বুঝবেন না আপনি।"

* * *

কয়েক দিন পরে, নিতান্ত জরুরী কাজের জন্যে রায়বাহাদুরকে দিন দশেকের মত বাইরে যেতে হয়।

ফিরে এসেই ধীরাকে ফোন করলেন। কে কেমন আছে, খোঁজ নিলেন। ধীরা রাত্তিরে খাওয়ার অনুরোধ করলো। রায়বাহাদুর রাজী হলেন এক কথায়।

পূর্ণবিকাশ সেদিন সকালে আসতে পারেনি। ঠিক করেছিল, রাত্তিরে পড়ানো সারবে।

সে এসে কলিং-বেলের সুইচ টিপলো। ঘরের জানলায় পর্দা টানা। আলো দেখা যাচ্ছে। ভেতর থেকে টুকরো টুকরো আলাপও ভেসে আসছে।

"........মোটেই মন কেমন করেনি ......আমি........ব'য়ে গেল আপনার .. ....''

গলাটা ধীরার।

পাল্টা পুরুষের আওয়াজ। বেশ ভরাটী—

"বিশ্বাস কর। শনিবার দুপুরে কিরকম লাগছিল······অনবরত তোমার কথা ভেবেছি·······"

না-পড়িয়ে ফিরে গেলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হবে। ধীরা কি মনে করবে। পূর্ণব্রত তাই বেশ খানিকক্ষণ একটানা কলিং-বেল বাজালো।

বাইরের ঘর বন্ধ রইলো। ধীরা বেরুলো পাশের সদর খুলে।

"রাত্তিরে কি মনে ক'রে?"

কথার ঢঙে পূর্ণবিকাশ একটু অবাক হল। তবুও বললো—

"সকালে পড়াতে আসিনি, কিনা।"

"ঠিক আছে। আজ আর পড়াতে হবে না।"

ধূলো-পায়ে বিদেয় নেবার নির্দেশ পেয়েও পূর্ণবিকাশ দাঁড়িয়ে রইলো। ভাবলো, একটু ব'সে তারপর যাবে। সকালে দেখা মেলে কদাচিৎ। কথার সুযোগ পায় না মোটে।

"যান, তাহলে। একটু ব্যস্ত রয়েছি।"

ব্যস্ত আছে, মানে, একজনের সঙ্গে গল্প করছে। তাড়াতে চায়।—

পূর্ণবিকাশ আর দাঁড়ালো না।

রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করানো। নিজেকে বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করলো—

"হয়তো কোনও বড়লোক আত্মীয় এসেছে।"

মনটা তবু খচ্‌খচ্‌ করতে লাগলো—"দু-মিনিট বাইরে দাঁড়াতে পারতো।"

বাড়ি ফিরে ক্ষোভের মাথায় পূর্ণবিকাশ ভাবলো, নীরেন-মিনুকে আর পড়াতে যাবে না। কিন্তু, পারলো না। রাত পোয়াতেই ছুটলো।

পড়াবার সময় ধীরা দু-একবার সামনে দিয়ে ঘুরে গেল। পূর্ণবিকাশ দেখেও দেখলো না। কোনও রকমে পড়ানো সেরে বেরিয়ে পড়লো। সে হপ্তায় তার সঙ্গে ধীরার বাক্যালাপ হল না।

পরের হপ্তায় ধীরা এসে দাঁড়ালো নীরেন-মিনুর সামনে। পূর্ণবিকাশ গভীর অভিনিবেশে মাষ্টারি চালাচ্ছিল।

ধীরা বললো—

"এত খাটছেন ওদের পেছনে। নাম রাখতে পারবে তো?"

মাষ্টারিতে নাম করবার জন্যে পড়াতে এসেছে? প্রশংসাটা চাবুকের মত গায়ে লাগলো। তবু পূর্ণবিকাশ সাড়া দিল না।

"কি? মেজাজ বোধ হয় ভাল নেই?"

পূর্ণবিকাশ তবুও নির্বাক রইলো।

"কাজ-অকাজ, সময়-অসময় না-বুঝে মাথা গরম করলে পরের আর কি দোষ।"

নীরেন বোকা। মিনুটা চালাক। তার কাছে নিজের দুর্বলতা ধরা প'ড়ে যাবে। পূর্ণবিকাশের ইচ্ছে করছিল জবাব দেয়। মিনু না-থাকলে দুটো কড়া কথা শোনাতো। কে এসেছিল বাড়িতে, যার জন্যে তাকে দু-মিনিটের সৌজন্য দেখানো গেল না? কে সে সম্মানিত, গাড়ি-চড়া অতিথি, দরজায় খিল লাগিয়ে, জানলায় পর্দা টেনে যাকে খাতির করতে হয়? কিন্তু, এ ধরণের প্রশ্ন মুখে আনার অভ্যেসই নেই পূর্ণবিকাশের। সে ঘাড় গুঁজে রইলো।

ধীরাও নড়লো না। তার ইসারায় নীরেন-মিনু উঠে চ'লে গেল বই-পত্র নিয়ে। বারাণ্ডা খালি। রমেন সদরে পড়ছে। রাখালবাবু চাকর নিয়ে বাজারে গেছেন।

ধীরা মাদুরের এক কোণে বসলো। পূর্ণবিকাশ বুঝলো, সে কিছু বলবে।

"শুনুন। জরুরী কথা আছে।"

পূর্ণবিকাশ মুখ তুললো।

"কি ওষুধ এনে দিয়েছিলেন ?

"ওষুধ ?"

পূর্ণবিকাশ মন হাতড়াতে থাকে। ধীরাদের বাড়িতে সব ওষুধের ব্যবস্থা করতে হয় তাকে। মিনুর সর্দি, নীরেনের পেট-কামড়ানি, রাখালবাবুর বদহজম—কত কিছুর জন্যে কত কি এনে দেয়। কোনটার প্রসঙ্গ তুলছে ধীরা ?

পূর্ণবিকাশ জিজ্ঞেস করলো—

"কার জন্যে এনেছিলাম ? কি অসুখে ?"

"দেবনারায়ণের জন্যে।"

"দেবনারায়ণের জন্যে আমি আবার কবে ওষুধ আনলাম ? ওরা অনেক পয়সার মালিক। ওদের কত ডাক্তার রয়েছে।"

"তা থাক। আপনার হাত দিয়েই এসেছিল। ঘুমের ওষুধ। এই তো গত হপ্তার আগের হপ্তায়।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। খেয়াল হয়েছে। কিন্তু, আপনি তো আমার কাছে দেবনারায়ণের নাম করেননি। আমি ভেবেছিলাম, আপনার মা কিংবা বাবার দরকার।"

"তারপর ?"

"তারপর আবার কি ? আপনার বাবার নামে প্রেসক্রিপসান করিয়ে ভাল দোকান থেকে নিয়ে এলাম।"

"কার প্রেসক্রিপসান ?"

"আমার চেনা এক ডাক্তারের।"

"তাতো হবেই। নামটা কি ?"

পূর্ণবিকাশ নাম বললো।

"যান, আপনার ডাক্তারকে কানে ধ'রে নিয়ে আসুন এখানে।"

"কেন ?"

"কেন ? না-এলে দুজনের হাতেই পুলিশ হাতকড়া পরাবে।"

"হাতকড়া ?"

পূর্ণবিকাশের চোখ কপালে ওঠে। মুখ একদম ফ্যাকাশে। থানা-পুলিশকে তার ভয়ানক ভয়। স্কুলে পড়বার আমলে একবার একটানা ধর্মঘট হয়েছিল। বই হাতে নিয়ে রাস্তায় হৈ-চৈ করার সময় পুলিশ তেড়ে আসে লাঠি নিয়ে। একটা ডাষ্টবিন ছিল সামনে গলির ভেতর। দৌড়িয়ে গলিতে ঢুকে পালাবার জায়গা পেল না পূর্ণবিকাশ। বড় রাস্তায় ধুপধাপ আওয়াজ হচ্ছিল খুব। এক হাতে ডাষ্টবিনের কিনারায় ভর দিয়ে সে বই-খাতা সমেত লাফিয়ে পড়লো ভেতরে। কতক্ষণ ঐ ভাবে ছিল, ঠিক নেই। কাছাকাছি কোনও বাড়ি থেকে একটা বুড়ি ময়লা ফেলতে এসে তাকে দেখতে পায়। বুড়ির গালাগালি না-খেলে সে সন্ধ্যের আগে বাইরে আসতো না। সেই থেকে পুলিশের নামে তার আতঙ্ক। রাস্তায় পাহারাওয়ালা দেখলে দূরে স'রে যায়।

পূর্ণবিকাশের প্রশ্নে যে কৌতূহল ছিল না, এটা বুঝলো ধীরা। বললো—

"হাতকড়ার পর কোর্ট। বিচারে হয় ফাঁসী, না-হয় কালাপানি। আপনার দেওয়া ওষুধ খেয়ে দেবনারায়ণের বাবা ইহলোকের মায়া কাটিয়েছেন।"

পূর্ণবিকাশ হাঁউ-মাউ ক'রে উঠলো একেবারে—

"ফাঁসি? য়্যাঁ? কালাপানি? মারা গেছেন? য়্যাঁ? তাহলে কি করবো আমি? হায় ভগবান! আমার এই নিয়তি!"

"ভগবান তো আর আপনাকে বাঁচাচ্ছে না। আমার বাবার নামে ঐ রকম সব্বনেশে জিনিস আনবার দরকার কি ছিল? চেয়েছিলাম শুধু প্রেসক্রিপ্সান। পেলে দেখতাম, আমার বাবাকে শুদ্ধু জড়িয়েছেন। শোধরাবার রাস্তা হত। এখন আর কোনও উপায় নেই।"

"শুনলাম, তাড়াতাড়ি চাই। কলেজে না-গিয়ে তাই ট্যাবলেট শুদ্ধু এনে দিলাম।"

"এখন বুঝুন ঠেলা।"

"কি করবো? এমন বিপদ হবে, ভাবিনি।"

"ভেবেছেন কিনা, জানি না। দেবনারায়ণ এসে কান্নাকাটি না-জুড়লে আমি কিছুই ভাঙতাম না তার কাছে। কাল রাত্তিরে তার পাল্লায় প'ড়ে ফাঁস করতে হল সব। চেপে রাখলে ধ'রে নিত, আমিই ওষুধের বদলে বিষ দিয়ে তার বাপকে মেরেছি।"

পূর্ণবিকাশ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে।

"বসুন। পালাবার তালে আছেন বুঝি?"

ধীরা যেন আদেশ করে।

পূর্ণবিকাশ যন্ত্রচালিতের মত বসে। তার মাথায় শুধু অসংলগ্ন চিন্তা—

ধীরা নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে না। কি ভয়ানক কাণ্ড। দেবনারায়ণের বাবাকে সে দেখেনি কখনও। লোকটা মরেছে তার ঘাড়ে অপবাদ চাপিয়ে। জানতে পারলে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে। তারপর? তারপর ফাঁসি, নইলে দ্বীপান্তর।

পূর্ণবিকাশের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

ধীরা তার হাব-ভাব দেখছিল হাঁটু নাচাতে নাচাতে। একটু হেসে সে আবার শুরু করলো—

"ভয়ানক ক্ষেপে গিয়েছিল।"

"কে? কে? পু-পু-পুলিশ?"

—অনেক কষ্টে কথা কটা ছিটকিয়ে বেরুলো পূর্ণবিকাশের মুখ থেকে।

"পুলিশে হয়তো এখনও খবর দেয়নি। কিন্তু, দিলেও তাকে দোষবার কি আছে? বাপের আদুরে ছেলে। আর কোনও ভাই-বোন নেই?"

পূর্ণবিকাশ পাথর হয়ে যায়।

ধীরা চালাতে থাকে—

"অনেক কষ্টে ঠাণ্ডা করলাম তাকে। কিন্তু, বাড়িতে ফিরে বিগড়িয়েছে হয়তো।"

পূর্ণবিকাশ দু-হাতে মুখ ঢাকে।

"ভয় হচ্ছে? না, লজ্জা করছে? চোখে চাপা দিলে ছুটো থেকেই বাঁচোয়া, কেমন? আপনি না-দেখলে আর কেউ দেখবে না। রেহাই পাওয়ার চমৎকার রাস্তা।"

পূর্ণবিকাশ হাত নামালো।

"দেবনারায়ণকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত বাগ মানানো যাবে কিনা, সন্দেহ। আপনার কীর্তি-কাহিনী শোনার সঙ্গে সঙ্গে ......"

পূর্ণবিকাশ পরপর ঢোঁক গিললো বার দুই।

ধীরা জের টান্‌লো একটু থেমে—

"ওরে ব্বাপরে! আমি তো ভয়ে কাঁটা! কি লাফানি! আপনাকে খুন করবে, ফাঁসি-কাঠে চড়াবে।.......আমি অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছি—ঠাণ্ডা থাকবে, নিজে থেকে কিছু করবে না।"

পূর্ণবিকাশ জোড়হাতে করুণ মিনতি জানালো—

"আপনি বুঝিয়ে মানা করলে সে শুনবে। যদি দয়া করেন, সারা জীবন আপনার চাকর হয়ে থাকবো।"

"এরকম চাকর পোষার ক্ষমতা নেই আমার।"

"আপনার ওপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। আমি নিরপরাধ।"

"এই রকম নোংরা ব্যাপারে আমি আপনার জন্যে সাক্ষী দিতে যাব নাকি? আর আপনার মনে কি ছিল, তার খবরই বা আমি রাখবো কি করে?"

"বেশ, চললাম। তবে, এটাও জেনে রাখুন, আমি মরতে ভয় পাই না।"

পূর্ণবিকাশের মুখে চোখে কাঠিন্য ফুটে ওঠে। ধীরা কিন্তু তার কথা হেসে উড়িয়ে দেয়—

"ও! মরতে ভয় পান না? তাহলে মরবার অভ্যেস আছে রীতিমত?"

"অভ্যেস নেই। তবু, একটা রাস্তা ক'রে নিতে পারবো।"

"খুব ভাল। আবার, আমিও জানি, আপনার মত ভীতু লোক কখনও আত্মহত্যা করবে না। ও রকম কাজ পারে ইস্পাতে গড়া মানুষ।"

অসহায় আতঙ্কে পূর্ণবিকাশের মুখে জবাব যোগালো না।

"শুনুন। সাফ ব'লে দিচ্ছি। দেবনারায়ণের বাবাকে আপনি-ই মেরেছেন। মাথা খাটিয়ে ওষুধ এনেছিলেন আমার বাবার নামে। ডাক্তারটিও ফেঁসে যাবে আপনার সঙ্গে। যতদিন পারি, চেপে রাখবো, ঢেকে রাখবো।"

টুঁ-শব্দ করলো না পূর্ণবিকাশ।

ধীরা মাদুর ছাড়লো।

পূর্ণবিকাশ অনড়।

"কি? আরও বসবার ইচ্ছে আছে নাকি?"

পূর্ণবিকাশ উঠলো।

পনের

অশৌচের মধ্যে দেবনারায়ণ আর ধীরাদের বাড়ি যায়নি। শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করেছিল রাখাল মুখুজ্জেকে। চিঠি দিয়ে আসেন ম্যানেজার বাবু। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকতেই সে ছুটলো ধীরার কাছে একেবারে গাড়ি নিয়ে। অনেক কথা জ'মে উঠেছিল। রাত দুপুর পর্যন্ত মন হাল্কা হল খানিকটা। ধীরার একটা প্রশ্নে দশটা উত্তর— বাবা কোথায় কি রেখে গিয়েছেন, নগদ কত, সোনা-দানা কি আছে, দোকানে মাসে কত আয় হয় ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়লো না। শেষে ধীরা জিজ্ঞেস করলো—

"তা-হলে ব্যবসা-ট্যাবসায় রীতিমত জড়িয়ে পড়ছেন এবার?"

লম্বা হাই ছাড়তে ছাড়তে দেবনারায়ণ জবাব দিল—

"রামচন্দর। ওসব আমার কম্ম নয়। ম্যানেজারই চালাচ্ছে সব। যা লাগে, চেয়ে নি-ই। বাবা গাড়ি ব্যবহার করতেন। ওখানা আমার জিম্মা। ঘুরে বেড়াই।"

"দরকার পড়লে গাড়ি মিলবে তাহলে।"

"নিশ্চয়। মনে করবেন, আপনারই গাড়ি।"

"অত মনে ক'রে দরকার নেই। মাঝে মাঝে আসবেন তো?"

"তা আর বলতে। রোজ আসবো এখন থেকে।"

"রোজ আসবেন কেন? শনি-রোব্বার সকাল থেকে ঝামেলা চলে। ছুটি পাই একেবারে রাত্তিরে।"

"তাহলে শনি-রোব্বার আসবো রাত নটা নাগাৎ।"

"নাঃ। আপনাকে নিয়ে আর পারা যাবে না। হপ্তায় ঐ দুটো দিন বাইরের কাজেও বেরুতে হয়। ফেরার ঠিক থাকে না।"

"রাত্তিরে ফেরেন না?"

"দুত্তোর। তা হবে কেন। বাড়ি আসতে যার নাম দশটা-

এগারোটা। তখন আর খেতে পর্যন্ত ইচ্ছে করে না। একেবারে শুয়ে পড়ি।"

"এত খাটেন কেন?"

"না-খাটলে চলবে কি ক'রে? বড় সংসার। নিজেরও পাঁচটা দরকার হয়।"

"খাটা-খাটুনি বন্ধ করুন। রোজ আসতে পারবো তাহলে।"

"ওঃ! চমৎকার উপদেশ! আমি হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকবো, খরচ-খরচা সব জুটে যাবে আপনা থেকে!"

"আমি আছি কি করতে?"

ভাবাপ্লুত দেবনারায়ণের মাথাটা ঝুঁকে যায় সামনের দিকে। ধীরা বলে—

"আপনি আছেন ঠিক। কিন্তু, আমার তাতে কি?"

"আপনার তাতে কি? বেশ। আপনার বাড়ির সমস্ত ভার আমাকে দিন।"

"থাক, যথেষ্ট হয়েছে।"

"দু-চারমাস দেখুন।"

"কিন্তু তাহলেও শনি-রোব্‌বারের হ্যাঙ্গাম কাটবে না।"

এই আলোচনার পর দেবনারায়ণ গোবর্ধনকে শুধোলো—

"আচ্ছা, ছটা লোকের সংসার চালাতে মাসে কত লাগে রে?"

"কম-সমের মধ্যে, না, উঁচু দরের?"

"ধর, মাছ-মাংস-পোলাও-সন্দেশ খাবে, ভাল জামা-কাপড় পরবে, সিনেমায় যাবে।"

মাথা চুলকিয়ে, বারকত কর্‌গুণে গোবর্ধন উত্তর দিল—

"তা, ফেলে-ছ'ড়ে মাসে শ-তিনেক।"

গোবর্ধনের ওপর দেবনারায়ণের ভয়ানক আস্থা। তার কথায়

হিসেব পেয়ে দুপুর বেলা ম্যানেজারকে ফোন করলো—তার চারশো টাকা চাই।

ম্যানেজার নিজে এলেন। রসিদ সই ক'রে দেবনারায়ণ টাকা নিল। ম্যানেজার খুব হিসেবী, খুব সাবধানী লোক। সংসার-খরচার টাকার জন্যে গিন্নীরও দস্তখত লাগে।

সন্ধ্যেবেলা দেবনারায়ণ বুক ফুলিয়ে ধীরার হাতে চারখানা একশো টাকার নোট তুলে দিল।

ধীরা জিজ্ঞেস করলো—

"টাকা? টাকা কিসের?"

"বাঃ। আমার এত টাকা, আর, আপনি সংসার চালানোর জন্যে ছুটোছুটি করবেন, বাবা খেটে মরবেন?"

'না, না। পরের কাছে মাসোহারা নেওয়া? কি লজ্জার কথা! ধাতে সইবে না আমার। দরকারও নেই। টাকা ফেরৎ নিন।"

ধীরা নোট কখানা উঁচিয়ে ধরলো।

ঘাবড়িয়ে গেলেও দেবনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে বললো—

"আমার টাকা কি আপনার টাকা নয়?"

হাসতে হাসতে, পা নাচাতে নাচাতে ধীরাও পাল্টা প্রশ্ন করলো—

"তাহলে, মটর গাড়ি, আপনার বিষয়-আশয়—সবই আমার।"

"হ্যাঁ।"

"দেখুন। আপনি মনে কষ্ট পাবেন, তাই টাকাটা রাখছি। কিন্তু, আর দেবেন না এরকম।"

সাহস-মুখর দেবনারায়ণও এবার মনের কথা জানালো—

"আমাকে পর ভাবলেই শুনছি কিনা। আজ আমি সম্পত্তির মালিক হয়েছি আপনার দয়ায়।"

"আমার দয়ায় নয়, নিজের বুদ্ধিতে। ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিলেন আপনি, আমি নয়।"

"তা ঠিক। ভাল ওষুধ। অদ্ভুত কাজ করলো।"

"মনে করুন, কেউ যদি পুলিশে খবর দেয় যে, আপনি বাপকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিলেন নিজে থেকে। তারপরই রুগী মারা যান।"

"খবর দিলেই হল? সাক্ষী-সাবুদ পাবে কোথা?"

"তার অভাব হবে না। ওষুধ তো আর আপনি মেলে না। রুগীর নামে ডাক্তারের প্রেসক্রিপ্‌সান ছাড়া ও রকম ট্যাবলেট কেনা যায় না।"

"সে সব তো আপনি করিয়েছেন।"

"আমি কি জানতুম যে, ছেলে হয়ে আপনি বাপকে খুন করতে চান?"

দেবনারায়ণের কিরকম তাল-কাটা, বেসুরো লাগছিল ধীরার কথা। তার মুখ থেকে হাসির রেশ মিলিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো—

"ঠাট্টা, না, সত্যি বলছেন?"

"ঠাট্টা গো, মশাই, ঠাট্টা।"

দেবনারায়ণের মন থেকে অন্ধকারের আমেজ যায়। বহাল তবিয়তে সে ধীরাকে নেকলেসটা গলায় দিয়ে আসতে অনুরোধ করে।

ধীরা এল নেকলেস প'রে। এক নজর দেখে দেবনারায়ণ বললো—

"এটা আমার পছন্দ হয়নি একদম। তাড়াতাড়িতে কিনা।"

ধীরা সায় দিল—

"আমারও মনে লাগেনি। অনেক দিন হাত দিই-নি। খুলে ফেলি, বাবা।"

ধীরা নেকলেস ধ'রে টানাটানি করলো খানিকটা। তারপর ডাকলো দেবনারায়ণকে—

"আপনার জিনিস, আপনি ফাঁস আলগা করতে পারেন কিনা, দেখুন। আমার সাধ্যি নেই। যখন পরবো, তখনই খিল আটকিয়ে ঝকমারি বাধবে।"

দেবনারায়ণ গিয়ে দাঁড়ালো ধীরার পেছনে। নেকলেস খুললো অনেকক্ষণ ধ'রে। হাতটা কাঁপছিল তার। ধীরা ঠাট্টা করলো—

"পালোয়ানির প্যাঁচে হ্যাঁচকা টান দেবেন না যেন। গলায় লাগবে। এতো হীরের নেকলেস নয় যে আঁচড়েও সুখ।"

নেকলেসটা ধীরার পাশে রেখে দেবনারায়ণ তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিল।

"কি করছেন?"

"দেখছি, গলায় কিছু হল কিনা।"

"না গো, না। আপনার হাতটা কিন্তু বেশ মোলায়েম।"

দেবনারায়ণ বসে। নতুন বুদ্ধিও মাথায় আসে তার। বলে—

"এটাতে ছোট একখানা হীরে আছে। আপনার গলায় শুধু হীরের গাঁথা নেকলেস চমৎকার মানাবে।"

ধীরা মন্তব্য করে—

"কোথায় পাবো?"

সঙ্গে সঙ্গে দেবনারায়ণের বীরদর্প—

"তিনদিনের মধ্যে আপনার গলায় হীরের হার না-ঝুললে আমার নাম মিথ্যে।"

"জ্যোতিষ নাকি?"

দেবনারায়ণ জবাব দিল হেঁকে—

"দেখে নেবেন।"

দেবনারায়ণ তার ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করলো।

ষোল

রায়বাহাদুরের শনিবারটা আধাআধি কাটে ধীরার জিম্মায়। খাওয়ার পর একটু টান হওয়া। ধীরার ঘরে ধীরার বিছানায় শুয়ে পড়েন। দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যাস নেই। এপাশ ওপাশ করেন। চোখ বুজে নানা কথা ভাবেন। বেশি খাওয়ার পর জটিল চিন্তা মাথায় আসা নিয়ম নয়। পুরোনো দিনের টুকরো টুকরো ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ফাঁকে ফাঁকে বর্তমান উঁকি দেয়। অলস কল্পনা জাগে।

সন্ধ্যে পর্যন্ত উঠেও বাড়ি যাওয়া হয় না। গল্প চলে। তার মধ্যে চা আসে। সে গল্পের মাথা-মুণ্ডু থাকে না। বেশির ভাগ সময় ধীরার মুখে খই ফোটে। শ্রোতা রায়বাহাদুর মাঝে মাঝে "হুঁ, বটে, তাই নাকি" ইত্যাদি অলঙ্কার যোগান। চুপ ক'রে থাকলে ধীরা ছাড়ে না।

আলাপে নতুন প্রসঙ্গ দরকার করে না। দু-একটা চেনা লোকের কাহিনী, সঙ্গে নাচের কথা, গানের কথা, ব্যায়ামের কথা। কি কি খেলে রায়বাহাদুর তাজা থাকবেন, ধীরা তা-ও বলে। রায়বাহাদুর হাসেন, মাথা নাড়েন। হুকুম শোনবার প্রতিশ্রুতি দেন।

গল্পগুজব ক্রমে একঘেয়ে হয়ে আসে। দরজা-জানলায় ছিটকিনি এঁটে ধীরা রায়বাহাদুরকে নাচ দেখায়, দু-একখানা গান শোনায় চাপা গলায়।

রায়বাহাদুর সারা সপ্তাহ ধ'রে শনিবারের অপেক্ষায় দিন গোণেন।

সময়ের চাকা ঘুরতে থাকে।

ধীরা রায়বাহাদুরকে দিয়ে ব্যায়াম না-করিয়ে ছাড়বে না। রায়-বাহাদুরও কিছুতে তার কথা শুনবেন না। এক শনিবার রাত্তিরে রায়বাহাদুরকে কয়েকবার ওঠ-বোস, হাত টানা-মোড়া করতে হল।

রবিবার সকালে তিনি টেলিফোনে জানালেন, হাঁটা-চলা করতে পারছেন না। ধীরা তাঁকে সন্ধ্যেয় আসতে বললো। সে পা-হাতের ব্যথা সারিয়ে দেবে এক ঘণ্টায়।

এরপর থেকেই শনি, রবি—দুদিন রাত দশটা পর্যন্ত ধীরাদের বাড়িতে কাটানো আরম্ভ হল। রায়বাহাদুর এর বেশি পেরে উঠলেন না।

হজমের গোলমাল, শরীর দুর্বল বোধ হয়। ধীরা টনিকের ব্যবস্থা করলো। রায়বাহাদুর জানতে চাইলেন ওষুধের নামটা। খেলে মেজাজ বেশ খুশী লাগে। বাড়িতে রোজ ব্যবহার করবেন।

ধীরা বললো না। বোতলের গায়ে লেবেল নেই। ধীরা গেলাসে করে দেয় জলের সঙ্গে মিশিয়ে। রায়বাহাদুর মুখে ঢালেন।

ব্যায়ামের বদলে মাসেজও শুরু হয়।

শেষে রাতের খাওয়া।

রায়বাহাদুরের জীবনে নতুন আস্বাদ, নতুন স্পন্দন এসে যায়। অতীতের কোনও স্মৃতিই আর ভাল লাগে না। কেশ-বেশ, হাব-ভাবেও পরিবর্তন দেখা দেয়।

দশ-আনা-ছ-আনা পাকা চুলে রায়বাহাদুর কলপ ব্যবহার আরম্ভ করলেন। ব্যাপারটা হরেন্দ্রলালের চোখে পড়লো একেবারে শুরুতে। তার বৌ লক্ষ্য করলো। মুখফোঁড় দু-একজন কর্মচারী কান-বাঁচানো ঠাট্টা চালাতে লাগলো।

শনি-রবিবার রায়বাহাদুরের খাওয়া-না-খাওয়ার খবর রাখতো না হরেন্দ্রলাল। কিন্তু, সেটা জানতে পারলো আস্তে আস্তে। বন্ধুকে বাইশ হাজার টাকা দেওয়ার পর থেকে তিনি যেন বদলিয়ে যাচ্ছিলেন। হপ্তায় দু-দিন বাড়ি ফেরেন বেশ রাত ক'রে। সাবধানী হরেন্দ্রলাল একটু নজর রাখতে লাগলো।

বাইশ হাজার ছাড়া রায়বাহাদুর বছর-খানেক ধ'রে আরও প্রায় হাজার দশেক নিয়েছেন কয়েক দফায়। নিজের হাত-খরচা থেকে

তিনি কিছু লোকের মাসোহারা চালাতেন। সেটা কোম্পানীর হিসেবে গেল। নানা রকম চাঁদারও ঐ ব্যবস্থা হল। রায়বাহাদুর নিয়মিত বই কিনতেন। বাড়ির লাইব্রেরিটা তাঁর বেশ বড়। না-পড়লেও নতুন বই নেড়ে-চেড়ে দেখতেন তিনি। বই কেনার দায়িত্ব অফিসের ঘাড়ে চাপতে হরেন্দ্রলাল রীতিমত বিস্মিত হয়েছিল।

হুঁসিয়ার ছেলে। আন্দাজে ধ'রে নিল, বাল্যবন্ধুই বাবার সর্বনাশ করছে। কিন্তু, লোকটা আসলে কে? চোখে দেখা তো দূরের কথা, তার নামটা পর্যন্ত জানা নেই। নাম-ঠিকানার সন্ধান পেলেও হত। গরিব নিশ্চয়। কিন্তু, তার জন্যে দানছত্র? বাবা বোধ হয় তার বাড়িতে যান। খাইয়ে-দাইয়ে, মিষ্টি কথায় মন ভুলিয়ে টাকা বার ক'রে নিচ্ছে। তার পাল্লায় প'ড়েই বাবা চুলের কলপ পর্যন্ত উঠেছেন।

হরেন্দ্রলাল এসব কথা ভেবে ভেবেও ঠিক পেল না, কি ভাবে কি করা উচিত। একদিন সে রায়বাহাদুরের কাছে হাজির হল তাঁর নিজস্ব হিসেবের ফাইল নিয়ে। এটা সেটা দেখাবার পর বললো,

"এই বাইশ হাজার টাকার জের প্রত্যেক মাসের হিসেবে না-টেনে একেবারে বাদ দেবো?"

রায়বাহাদুর উত্তর দিলেন,

"হ্যাঁ। তা, বাদ দিতে পার। তবে,........আচ্ছা, চিন্তা ক'রে দেখি। ফাইলটা দরকার হবে।"

ফাইল থেকে গেল রায়বাহাদুরের কাছে। প্রয়োজনে এ রকম অনেক ফাইল তিনি নেন। দু একদিন পরে ফেরতও দেন। কিন্তু, এবার আর ফাইলটা ঘুরে হরেন্দ্রলালের হাতে পঁওছালো না। হরেন্দ্রলাল খেয়াল রাখছিল। কতবার কত ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে বাপের কাছে যায়, মতামত শোনে, কারবারের হিসেব-পত্র নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু, ব্যক্তিগত জমা-খরচের কথা তিনি একদম মুখে আনেন না। হরেন্দ্রলাল লক্ষ্য করলো, ফাইলটা টেবিলে নেই।

মনে আঘাত পাবারই কথা। দুর্ভাবনাও বেড়ে যায়। অফিসে ঢোকার পর হতে বাবার সব জিনিসই হরেন্দ্রলালের নখদর্পণে থাকতো। ব্যবসার কাজ বোঝবার আগে বাবার নিজস্ব খরচ-খরচার জিম্মা নিতে হয়েছিল তাকে। এতদিন পরে, বন্ধুকে টাকা দেওয়া উপলক্ষ্য ক'রে বাবা সে দায়িত্ব কেড়ে নিলেন। কিন্তু, এরপর যে তিনি দু-চার লাখ বেমালুম খয়রাত করবেন না, তারই বা ঠিক কি?

হরেন্দ্রলাল নিশ্চেষ্ট থাকার ছেলে নয়। শেষ পর্যন্ত মনে মনে ছ'কে ফেললো, কি করবে। শনিবার অফিস থেকে বেরিয়ে বাবার পেছনে যাবে। তিনি যাতে দেখতে না-পান, তার জন্যে একটু দূরে গাড়ি চালাবে। তাঁর বন্ধুর বাড়িটা চিনে নেওয়া দরকার। তারপর খোঁজ-খবর করতে হবে খুব গোপনে। জানতে পারলে বাবা কষ্ট পাবেন। রেগে গেলে, ফাইল রাখার চেয়ে গুরুতর কিছু করবেন হয়তো।

শনিবার দুপুরে রায়বাহাদুর নামার আগেই হরেন্দ্রলাল বসলো গিয়ে নিজের গাড়িতে। তাঁকে আসতে দেখে ড্রাইভারের কাছে মবিল অয়েল চাইলো। তেল ঢালাঢালির মধ্যে রায়বাহাদুর গাড়িতে ষ্টার্ট দিলেন। হরেন্দ্রলাল তাঁর পিছু ধরলো। ড্রাইভারকে আগে থেকেই ছুটি দেওয়া ছিল।

রায়বাহাদুর যাচ্ছিলেন জনাকীর্ণ শহর ছাড়িয়ে। গাড়ি ছুটছে দক্ষিণ দিকে। মাঝে মাঝে দু-একখানা কোঠা বাড়ি নজরে পড়ে। রাস্তার দুধারে বস্তি আর পুকুর। তাল-গাছ মাথা উঁচিয়ে আছে এখানে ওখানে।

গাড়ি থামলো শেষ পর্যন্ত। হরেন্দ্রলালও সুইচ বন্ধ ক'রে ব্রেক কষলো অনেকটা দূরে। বাবা নামলেন। গাড়ির দরজা আটকিয়ে সামনের বাড়িতে ঢুকলেন চুলে হাত বোলাতে বোলাতে।

হরেন্দ্রলাল বসে রইলো নিজের গাড়িতে। পরিশ্রম সার্থক হয়েছে দেখে সে খুশী। বাবার বন্ধু যে খুব গরীব, সে বিষয়ে

সন্দেহ নেই। শহরের বাইরে সস্তার ভাড়ায় থাকে। বাবা কতক্ষণে বেরুবেন, ঠিক নেই। তাঁর দেরী হওয়াই ভাল। বাড়িটা খুঁটিয়ে দেখে ফেরা যাবে।

হরেন্দ্রলাল গাড়ি চালিয়ে এগুলো।

কিন্তু, বাড়ির সামনে এসে ধারণা পাল্টাতে হল। গাড়ি ঘুরিয়ে হরেন্দ্রলাল আবার সেই পথেই ফিরলো। নম্বরের মার্বেল-পাথরখানা নজর করলো। বাড়িটা মন্দ নয়। একতলা হলেও, মাঝারি-রকম অবস্থাপন্ন পরিবার ছাড়া এরকম বাড়িতে থাকতে পারে না। টেলিফোনের তার গেছে ভেতরে।

হরেন্দ্রলালের চিন্তায় জট পাকালো খানিকটা। ঠিক যেরকম মনে ক'রেছিল, সে রকম নয়। লাঞ্চ খাওয়া সেরেছিল অফিসে। গাড়ি গেটে রেখে ঢুকলো গিয়ে নিজের ঘরে। এক বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। টেলিফোনে না ক'রে দিল। আর বেরুলো না। বাবা কখন ফেরেন, দেখতে হবে। কান খাড়া রাখলো। রাত্তিরে ডিনার সেরে দোতলার বারাণ্ডায় পায়চারি আরম্ভ করলো।

রায়বাহাদুর এলেন বারটার পর। গাড়ি প'ড়ে রইলো গেরাজের সামনে। নিতান্ত অবসন্নের মত তিনি ভেতরে ঢুকলেন। হরেন্দ্রলালও বারাণ্ডা ছেড়ে শুতে গেল।

রবিবার সন্ধ্যেয় আবার লম্বা দৌড়। কিন্তু, গাড়ি থেকে নামা হল না। বাবার গাড়ি লক্ষ্য ক'রে হরেন্দ্রলালকে ফিরতে হল।

তারপর দিন আর এক দফা। বাড়ির সামনেটা খালি ছিল। গাড়ি থামিয়ে হরেন্দ্রলাল নামলো। সামনে, পেছনে, দুপাশে জন-বসতি নেই। প'ড়ো শিবমন্দির একটা। তাতে কারুর সাড়া নেই। রাস্তাটাও নির্জন। সবেমাত্র সন্ধ্যের আলো জ্বলেছে। তবু লোক-চলাচল নেই। গাড়ির দরজায় হেলান দিয়ে হরেন্দ্রলাল দাঁড়িয়ে রইলো ধীরাদের ফটকে চোখ রেখে।

বেশ খানিকটা কাটলো। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, দূরে মাঝে মাঝে গাড়ির আওয়াজ, আবছা অন্ধকার—সব মিলিয়ে এক বিচিত্র পরিবেশ। তার মধ্যে রীতিমত মশার কামড় সহ্য করতে হচ্ছিল। হরেন্দ্রলাল ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছিল। এর মধ্যে একগোছা বই হাতে নিয়ে একটি ছেলে এসে পড়লো।

হরেন্দ্রলাল তাকে জিজ্ঞেস করলো—

"আচ্ছা ভাই, এই তিয়াত্তর নম্বর বাড়িটায় বুড়ো মতন ভদ্রলোক থাকেন কেউ ?"

ছেলেটি বললো—

"তাঁকে তো এখন পাবেন না।"

"কখন দেখা মিলতে পারে ?"

"দুপুরে,আর, তা না হলে, রাত্তিরে।"

"তাঁর নাম কি ?"

"শ্রীরাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভুলে যাচ্ছিলাম। তিনি আমার বাবার বন্ধু। তুমি কোথায় থাক ?"

"আমি রাখাল বাবুর ছেলে।"

"তোমার নামটি কি ভাই ?"

"রমেন।"

"আমার বাবা এখানে আসেন। তোমার বাবার সঙ্গে গল্প-সল্প করেন।"

"কই ? দেখিনিতো।"

"দেখনি ? কেন, গত কাল রাত্তিরেও তো তিনি এসেছিলেন গাড়ি চালিয়ে। তুমি বুঝি ছিলে না তখন ?"

"থাকবো না কেন। প্রত্যেক শনিবার-রবিবার একজন ভদ্রলোক আসেন. দিদির কাছে। খান এখানে।"

"দিদির কাছে ?"

প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেই রমেন জবাব দিল—

"হ্যাঁ। দিদির কাছে। একেবারে রাত্তিরে যান। বাবা তো তখন বাড়ি থাকেন না।"

"ও। তাহলে আমার ভুল হয়েছে।"

রমেন একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলো হরেন্দ্রলালের দিকে সামান্য চাঁদের আলোয় কেউ কারুর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। একটু থেমে রমেন যেন জেরা শুরু করলো—

"বাঃ। আমার বাবার নাম শুনে তো একটু আগে আপনি চিনতে পারলেন। তিনি নাকি আপনার বাবার বন্ধু।"

"না, না। নামটা গোলমাল হয়ে গিয়েছে। ঠিকানাটাও ঠিক জানা নেই। কিছু মনে ক'রো না, ভাই।"

হরেন্দ্রলাল চ'লে গেল। রমেন বাড়ি ঢুকলো।

* * *

অধ্যবসায়ী হরেন্দ্রলাল ছাড়বার পাত্র নয়। নিজের কেরানিকে রাখালচন্দ্র মুখার্জির ফোন নম্বর বার করতে বললো। নম্বর মিললো না। তখন ঠিকানাটা নিয়ে মুখার্জি, মুখোপাধ্যায় সব খুঁজতে বসলো নিজে।

পাওয়া গেল নম্বর। ধীরা মুখার্জির নামে ফোন। ধীরা! ধীরা? নামটা যেন অস্পষ্ট মনে আসে। কবে, কোথায় শুনেছে? স্মৃতি তলিয়ে দেখতে দেখতে হরেন্দ্রলালের স্মরণ হল, বাবা একদিন একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, ঠিক। তারই নাম ধীরা। খেয়ালে এল এতক্ষণে। কিন্তু, বন্ধুর মেয়ে, এমন কথা তো বলেননি তখন।

হরেন্দ্রলালের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বাবাকে ভালবাসে সে। মানুষ হিসেবে তাঁকে অত্যন্ত বেশি শ্রদ্ধা করে। নিজের পরিশ্রমে এত বড় হয়েছেন। তাঁর কোনও নীচতা, কোনও শঠতা কখনও প্রকাশ পায়নি। কিন্তু কেন তাঁর অদ্ভুত পরিবর্তন।

কেন তাঁর বিচিত্র ব্যবহার। কেন তিনি নিজের ফাইলটা আটকিয়ে রাখলেন ? বন্ধুকে টাকা দিয়ে তাঁর নাম-ঠিকানাই বা গোপন করলেন কেন ? সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চেষ্ট হওয়া অসম্ভব। হরেন্দ্রলাল বাবার ধারা পেয়েছে পুরো মাত্রায়। কোনও কিছুতে হাত দিলে লেগে থাকার অভ্যেসটা বাপ-ছেলের মজ্জাগত। হরেন্দ্রলাল তাই রাখাল মুখুজ্জের কাহিনী জানবার জন্যে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

* * *

ফোন নম্বরের সন্ধান মিলতেই হরেন্দ্রলাল ফোন করলো ধীরাদের বাড়ি। ছেলেমানুষের গলায় সাড়া মিললো—

"কাকে চাইছেন ?"

"রাখাল বাবুকে।"

এবার ফোনে ভেসে এল নারীকণ্ঠ—

"রাখালবাবু ঘুমোচ্ছেন। আমি তাঁর মেয়ে। যা বলবার, আমাকে বলুন।"

হরেন্দ্রলাল জবাব দিল,

'তাঁকেই দরকার। অন্য কারুর সঙ্গে কথায় কাজ হবে না।"

"দরকারটা জানতে পারি কি ?"

"না। নিতান্ত ব্যক্তিগত।"

"তিনি অসুস্থ। ফোন ধরতে পারবেন না।"

"ও। থাক তাহলে।"

হরেন্দ্রলাল ফোন ছেড়ে দিল। কিন্তু নিরস্ত হওয়ার ধাত নয় তার। বাড়ি থেকে ফোন করার ইচ্ছে ছিল না। অথচ, না-করলেই নয়। রাত্তিরে খাওয়ার পর নিচে নেমে সে লাইন জুড়লো—

"হ্যালো" ?

"হ্যালো"—

দুপুরের মত সরু গলার আওয়াজ।

"এটা রাখালবাবুর বাড়ি ?"

"হ্যাঁ।"

"তাঁকে একটু ডাকো না।"

"ডাকছি।"

মিনিট খানেকের মধ্যে রাখাল মুখুজ্জে এসে ফোন ধরলেন।

বাপের বন্ধু। হরেন্দ্রলাল নমস্কার জানিয়ে নিজের পরিচয় দিল—

"আমি রায়বাহাদুর নগেন্দ্রলাল রায়ের ছেলে।"

"নমস্কার।"

"নমস্কার ক'রে লজ্জা দেবেন না। আমার বাবাকে চিনতে পারছেন তো ?"

"চিনতে পারছি ? য়্যাঁ ? তা পারছি।"

"কতদিন চেনেন তাঁকে ?"

"তা, এই কিছুদিন হবে।"

"বাবার সঙ্গে দেখা হয় না আপনার ?"

"না।"

"আগে হত।"

"তা হত।"

"দু-চার মাসের মধ্যে কেউ কারুর খোঁজ পান না, কেমন ?"

"তা হবে।"

"আচ্ছা, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

হরেন্দ্রলাল রিসিভার নামিয়ে রাখলো। এর বেশি জিজ্ঞেস করতে বাধছিল। লোকটা বাবাকে চেনে কিনা, সন্দেহ। অথচ, বাবা হপ্তায় কমপক্ষে দুদিন ওদের বাড়ি যান, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটান। বাবা যে বাল্যবন্ধুকে টাকা দিয়েছেন, তিনি বোধ হয় অন্য কেউ। কিন্তু....কিন্তু....সকালে যে মেয়েটি ফোন ধরেছিল, সে তো

কম নয়। কথা যেন চাবুকের মত। কি রকম গরম মেজাজ। বাবা ওর কাছে যান। কেন যান? ড্রাইভার সঙ্গে নেন না। ওদের ওখানেই শনি-রবিবার খাওয়া চলছে।—হরেন্দ্রগোপালের মন ভয়ানক দ'মে যায়।

ওদিকে, ধীরা বাড়ি ফিরতেই নীরেন খবর দিল—

"দিদি, সেই লোকটা আবার ফোন করেছিল।"

"কোন লোকটা?"

"ঐ দুপুরে যে বাবাকে চাইলে।"

"তুই কি বললি?"

"তুমি ছিলে না। তাই বাবাকে ডেকে দিলাম।"

"বেশ করলি।"

রাত্তিরে রাখালবাবুর সঙ্গে ধীরার কথা হয়নি। সকালে তিনি নিজেই ধীরার ঘরে ঢুকে টেলিফোন-প্রসঙ্গ তুললেন—

"কাল এক মজার কাণ্ড!"

"ফোনে তো?"

"হ্যাঁ। কে এক রায়বাহাদুরের ছেলে ফোন ক'রে জ্বালাতন।"

"রায়বাহাদুর? রায়বাহাদুর নগেন্দ্রলাল রায়?"

মেয়ের চাঞ্চল্য লক্ষ্য না-ক'রে রাখালবাবু উত্তর দিলেন,

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঐ নামই করলো বটে।"

"কি বললো?"

"বললো, আমি তাঁকে চিনি কি না। কদ্দিনের জানাশোনা।"

"তারপর?"

"বুঝলুম, তোর কোনও চেনা লোক। তাই কাটিয়ে দিলাম কায়দা ক'রে।"

"কি বিপদ! পুরোনো পরিচয়ের কথা বললেই পারতে।"

"অতটা মাথায় আসেনি।"

"বন্ধু কিনা, জিজ্ঞেস করেছিল?"

"খেয়াল নেই।"

"তা থাকবে কেন। ফের ফোন এলে জানিয়ে দেবে, তোমরা দুজনে বাল্যবন্ধু।"

"বাল্যবন্ধু ?"

অসহিষ্ণু ধীরা খিঁচিয়ে উঠলো—

"হ্যাঁ। বলবে, রায়বাহাদুর নগেন্দ্রলাল রায় তোমার বাল্যবন্ধু।"

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাখাল মুখুজ্জে চ'লে গেলেন।

ধীরা সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলো রায়বাহাদুরকে—

"আপনার ছেলে আমার বাবাকে ফোনে ডেকেছিল।"

"বটে ? কি কথা হয়েছে দুজনে ?"

"আমার বাবা আপনাকে চেনে কিনা, জিজ্ঞেস করে।"

"আচ্ছা! কি জবাব দিয়েছেন তোমার বাবা ?"

"বাবা বলেছেন, জানাশোনা আছে।"

একেবারে গুম হয়ে রায়বাহাদুর রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। ছেলে এতদূর এগিয়েছে! দারুণ দুশ্চিন্তা হল তাঁর। মনে কি ধারণা করেছে কে জানে! ফোন-নম্বর পেল কোথা থেকে ? ফোনটা ধীরার নামে—তা-ই বা শুনলো কার কাছে!

শনিবার ধীরার সঙ্গেও ফোনের প্রসঙ্গ। হরেন্দ্রলাল কি ক'রে টেলিফোনের নম্বর পেয়েছে সেটা ধীরা বুঝে ওঠে না। কে বলবে তাকে! সে রকম কেউ নেই। শেষ পর্যন্ত ধীরা মন্তব্য করলো, নিশ্চয়ই রায়বাহাদুরের পিছু নিয়ে এসে বাড়ি দেখে গিয়েছে। তারপর ঠিকানা ধ'রে টেলিফোন নম্বর যোগাড় করা এমন কিছু শক্ত নয়। টেলিফোন-অফিস থেকেই পাওয়া যায়।

ধীরার যুক্তি মানতে হল রায়বাহাদুরকে। হারু এত চালাকি শিখেছে! দুর্ভাবনার সঙ্গে ছেলের ওপর বিতৃষ্ণাও এসে গেল বেশ খানিকটা।

অফিস, বাড়ি—সব জায়গায় সব সময় রায়বাহাতুরের মনে চলতে লাগলো টানা-পোড়েন। ছেলে তাঁর সঙ্গে শঠতা করেছে, তাঁর সম্বন্ধে খারাপ ধারণা নিয়েই টেলিফোনে যাচাই করেছে বাল্যবন্ধুর কাহিনী। অফিসে হরেন্দ্রলাল ফাইল বা কাগজ-পত্র নিয়ে তু-একবার আসে। কিন্তু, দাঁড়ায় না একদম। সই করিয়ে, না হয় দেখিয়ে চ'লে যায়। কোনও কথা বলবার সাহস পান না রায়বাহাতুর। ছেলে অন্যায় করেছে। কিন্তু, নিজের দিক থেকেও অপরাধ রয়েছে। অপরাধ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হেতুর খোঁজ মেলে না। ছেলেকে ডেকে ধমক দেওয়ার মত সাহসও হয় না।

খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ধীরা জেনে নেয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা। সে রায়-বাহাতুরকে বোঝায়—সমস্ত ব্যবসা তাঁর মেহনতে গ'ড়ে উঠেছে। তাঁর মত বাপ না-থাকলে হরেন্দ্রলাল একটা কেরানি-গিরি জোটাতে পারতো কিনা, সন্দেহ। লেখাপড়া জানলেই চাকরি মেলে না। তা ছাড়া, পড়ার খরচ জুগিয়েছেন রায়বাহাতুর। হরেন্দ্রলাল তৈরি, সাজানো জিনিসের ওপর কর্তৃত্বে বসেছেও তাঁর দৌলতে।

ধীরার যুক্তিগুলো রায়বাহাতুরকে আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো। তুশ্চিন্তা কেটে গিয়ে ছেলের ওপর আক্রোশও দানা বাঁধলো। সত্যিই তো! কার-কারবারের মালিক তিনি, তাঁর হাতে সব কিছুর সৃষ্টি—খাঁটি খাঁটি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিনি বড় হয়েছেন। তিনি কাকে কি দিলেন, না-দিলেন, তা নিয়ে কারুরই খোঁজ করবার অধিকার নেই। মা-মরা ব'লে ছেলেটা বরাবর আস্পর্দ্ধা পেয়েছে। শেষে কিনা, মাথায় উঠে খোদার ওপর খোদকারি!

ধীরার মন্ত্র আর একধাপ উঠলো। সে অনবরত বলতে শুরু করলো—রায়বাহাতুরের মত লোক কিনা একটা চ্যাংড়া ছেলের হাতধরা। তবুও যদি ভালমানুষ হত। খবরদারি চালাবে, গোয়েন্দা-

গিরি করবে! অন্য বাপ হলে এরকম ছেলের মুখ দেখতো না। দূর ক'রে দিত বাড়ি থেকে।

শুনতে শুনতে রায়বাহাদুরের মন একেবারে বিষিয়ে যায়। হরেন্দ্রলাল সামনে এলে নিজের থেকে কথা বলেন না, তার দিকে মুখ তুলে তাকান না। বাড়িতে তার গলার আওয়াজ কানে গেলে পর্যন্ত ভয়ানক বিরক্তি বোধ হয়। ছেলের বৌকে দেখলে তাঁর গায়ে জ্বালা ধরে।

হরেন্দ্রলাল লক্ষ্য করছিল সব। বাবার আচরণ আরও পাল্টিয়েছে। ডেকে কথার পাট উঠে গিয়েছে। দরকারী ব্যাপারে পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেন না। হরেন্দ্রলাল বোঝে—এর পেছনেও সেই রাখাল মুখুজ্জে আর তার মেয়ের কারসাজি রয়েছে। মুখ ফুটে খোলাখুলি বাবাকে কিছু বলা অসম্ভব। কতদিন ভেবেছে, নিজের মনকে তৈরি করেছে। আবার, লজ্জায় নিরস্ত হয়েছে। বাবা টেলিফোনের খবরটা জেনেছেন নিশ্চয়ই। হয় রাখাল মুখুজ্জে, নয় তার মেয়ে বাবার কানে তুলেছে পল্লবিত ক'রে। মেয়েটাই আসল পাজি। রাখাল মুখুজ্জে বাবার বাল্যবন্ধু নয়। 'সাধারণ চেনাশোনা আছে। রাখাল মুখুজ্জের সঙ্গে বাবার দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। নষ্টের গোড়া ঐ মেয়েটা। মেয়েটা ভাল ক'রে লাগিয়েছে। তাই বাবার মেজাজ একেবারে বদলিয়ে গিয়েছে। বাপ-ছেলের মাঝখানে যেন দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল উঠেছে। এটাকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারলে হরেন্দ্রলালের বুক থেকে দুঃসহ বোঝা নেমে যেত।

উপায় খুঁজে পাওয়ার আশায় সে আর একবার ফোন করলো ধীরাদের বাড়িতে। মেয়েটাই তো গোল বাধিয়েছে। যদি ওর সাহায্যে ভুল বোঝাবুঝির ওপর যবনিকা টেনে দেওয়া যায়।

রাখাল মুখুজ্জে যথানিয়ম অনুপস্থিত ছিলেন। ধীরা জানতে চাইলো, কে ডাকছেন। পরিচয় দিতেই সে তেড়ে উঠলো—

"লজ্জা করে না আপনার!"

হরেন্দ্রলাল নরম জবাব দিল,

"লজ্জার কথা নয়। একটা সংসার ছারখারে যেতে চলেছে। বাপে ছেলেতে কথা বন্ধ। হয়তো দুজনেই ভুল করেছে। তাই আলোচনা দরকার। হয়তো সব ত্রুটি আমার। আলোচনা করলে নিজের দোষ ধরতে পারবো।"

"ও! এত বড় বিবেক নিয়েই বুঝি খুঁজে বার করেছেন টেলিফোনের নম্বর? কর্তব্য-জ্ঞানের তাগিদেই বুঝি বাপের পেছনে গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে আমাদের ঠিকানা জেনেছেন?"

এ অভিযোগের সরাসরি উত্তর ছিল না। হরেন্দ্রলাল তাই নির্বাক রইলো।

ধীরা আবার বলতে শুরু করলো—

"আপনার মত লোকেরও উত্তর যোগাচ্ছে না, কেমন? আপনি ইতর। আপনার বাবা নেহাৎ দেবতুল্য, তাই আপনার বড়মানুষি চলছে। অন্য লোক হলে দূর ক'রে দিত আপনার মত কুলাঙ্গারকে।"

রাগের চোটে হরেন্দ্রলাল চেঁচিয়ে উঠলো—

"শাট্ আপ। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। আমি ইতর! আমি কুলাঙ্গার!"

ধীরাও পাল্টা চোট দিল সঙ্গে সঙ্গে—

"ইউ শাট্ আপ। ইতর-কুলাঙ্গার ছাড়া কি? যে ছেলে বাপকে ঠকিয়ে পথে বসাচ্ছে, তার আবার ভাল মানুষ সাজা! শুনুন, হরেন্দ্রলাল রায়। আপনাকে বারণ ক'রে দিচ্ছি, আর কখনও টেলিফোনে আমার কাছে বীরদর্প জানাবেন না। আর কোনওদিন জ্বালাতন করলে চরম অপমান কপালে জুটবে।"

হরেন্দ্রলাল রিসিভার ফেলে দিল হাত থেকে।

অপমানের জ্বালাটা বড্ড বেশি। কিন্তু, ব্যাপার গড়িয়েছে অনেক দূর। হরেন্দ্রলাল ব'সে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো।

—সন্দেহ তাহলে অমূলক নয়। তবু, বাবা? বাবা তো অমানুষ নন। কেন তিনি, রাখাল মুখুজ্জে আর তার মেয়ের পাল্লায় পড়লেন। কি করে তাঁকে ফেরানো যায়। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলে হত। কিন্তু, তার কাছে বাবাকে ছোট করা।

অভিমানে আঘাতও লাগে বড় বেশি। কোথাকার কারা। আজ ধীরা মুখুজ্জে বাবার আপন জন। আস্কারা না-পেলে টেলিফোনে গালাগালি করার সাহস হত মেয়েটার।

রাখল মুখুজ্জে আর ধীরাকে ভাল রকম শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে হয়। কিন্তু, হরেন্দ্রলাল কি ক'রে শিক্ষা দেবে? বাবা নাবালক নন, পাগলও নন। নিজের খুশীতে তিনি একজনদের বাড়িতে যান, নিজের ইচ্ছেয় তিনি তাদের টাকা দেন। কেউ জোর ক'রে কেড়ে নিতে আসে না। তাঁর স্বোপার্জিত সম্পত্তি স্বেচ্ছায় উড়িয়ে দিলে আটকাবার পথ নেই। বাবা নিজে যদি না-শোধরান, তাঁকে বাধা দেওয়া অসম্ভব।

* * *

ধীরা হরেন্দ্রলালের কথা তুললে রায়বাহাদুর গরম হয়ে ওঠেন। হেস্তনেস্ত করার সঙ্কল্প আঁটেন। পরে ভয় হয়, যে ছেলে, চারদিকে বদনাম রটাতে কসুর করবে না।

ধীরা জানতে পারে না। নাচ দেখতে দেখতে, গান শুনতে শুনতে রায়বাহাদুর আনমনা হয়ে পড়েন। একদিন সে হঠাৎ সিনেমা যাওয়ার প্রস্তাব করলো। রায়বাহাদুর রাজি হলেন না প্রথমে—কে দেখবে, কি ভাববে।

ধীরা বললো,

"দেখলো তো বয়েই গেল। বদনাম রটাবে? বেশ তো, আমি কাগজ এনে দিচ্ছি। লিখুন।"

রায়বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন—

"বদনাম রোখবার জন্যে লিখবো?"

"হ্যাঁ।"

"কি লিখবো।"

"চিঠি। আমার বাবার কাছে। পোষ্ট-অফিসের খাম আছে বাড়িতে। তার ওপর আমাদের ঠিকানাটাও আপনার হাতের হরফে হওয়া চাই। আমি নিজে খামখানা ছেড়ে দোবো আপনার অফিসের কাছাকাছি কোনও ডাক-বাক্সে।"

"কি করবে তা দিয়ে?"

"কেউ কখনও কোনও অপবাদ দিলে, দেখাবো। চাইকি, আপনার ছেলেকে ডেকে পড়াবো। তার মাথা ঠাণ্ডা হবে।"

"এত বুদ্ধি তোমার! নিয়ে এস কাগজ। কিন্তু, মুশাবিদা ক'রে দিতে হবে তোমাকে।"

ধীরা প্যাড আনলো।

আগে খসড়া। অনেক কাটাকাটির পর জবানি ঠিক হল। তারপর আসল চিঠি।

লেখা শেষ ক'রে, তলায় দস্তখত দিয়ে রায়বাহাদুর পড়তে লাগলেন—

"ভাই রাখাল,

ছোট বেলায় কত এক সঙ্গে খেলেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি, গল্প করেছি। সে সব দিন আর ফিরে আসবে না। আমি এখনও চোখের সামনে দেখি, দুজনে মারামারি করছি। তোমার ছেলে-মেয়েরা বোধ হয় ধারণায় আনতে পারে না, তোমার বয়েসও একদিন তাদের মতই ছিল। তোমার ভাগ্য ভাল, ধীরার মত মেয়ে পেয়েছো। আমাকে যখন রামায়ণ-মহাভারত প'ড়ে শোনায়, তার ভক্তি-মাখা মুখের দিকে চেয়ে থাকি আর ভাবি, নিজের কপাল কত মন্দ। আমার বাড়িতে সাহেবিয়ানা। ব্যবসার জন্যে যাদের সঙ্গে দহরম-মহরম, তারা কেউ ধর্ম-তত্ত্বের ধার ধারে না। আমার ছেলেটাও শুধু পয়সা চিনেছে। তাই তোমাদের ওখানে গিয়ে শান্তি পাই।

গত হপ্তায় যেতে পারিনি। টেলিফোন করার সময় হয়নি। চিঠি লিখতেও দেরী হয়ে গেল। ধীরা যেন মনে দুঃখু না পায়।”

পড়া শেষ হ’তে রায়বাহাদুর চিঠিখানা দিলেন ধীরার হাতে। মুশাবিদার কাগজখানা তিনি ছিঁড়তে যাচ্ছিলেন। ধীরা বারণ করলো। খামে নাম-ঠিকানা লেখার পর খসড়া, আসল চিঠি, খাম—সব গুছিয়ে নিল ধীরা।

এবার সিনেমার কথায় রায়বাহাদুর অমত করলেন না।

তৈরি হ’তে দেরী লাগলো না। ধীরা গিয়ে বসলো পেছনের সিটে। রায়বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন—

“কোথায় যাব?”

“চলুন না সিধে।”

রাস্তা দেখিয়ে ধীরা নিয়ে গেল এক ফটোর দোকানে। গাড়ি থামিয়ে রায়বাহাদুর বললেন,

“সিনেমা কোথায়? এ-তো ফটোর ষ্টুডিও।”

“হাঁ। ভেতরে যেতে হবে।”

রায়বাহাদুরকে নিয়ে ধীরা ঢুকলো ফটোর দোকানে। তাঁর ডান হাতটা নিজের ডান হাতের ওপর দিয়ে, বাঁ হাতটা কাঁধে রেখে, গায়ে গা লাগিয়ে ফটো তোলালো দুখানা।

গাড়িতে এসে রায়বাহাদুর মন্তব্য করলেন,

“বড্ড লজ্জা করছিল আমার।”

ধীরা বললো, “বটে?”

রায়বাহাদুর কথা ঘুরিয়ে নিলেন—

“ফটো দিয়ে কি হবে?”

“একখানা আপনার কাছে থাকবে, আর একখানা আমার কাছে। আমারটায় আপনি নিজের নাম লিখে দেবেন, আপনারটায় আমি লিখবো আমার নাম।”

“তাতে লাভ?”

"আপনার কোনও লাভ নেই, আমার আছে। হপ্তায় পাঁচটা দিন একটানা মন খারাপ লাগে। সব সময় টেলিফোন করা যায় না। একটা অবলম্বন তো চাই।"

রায়বাহাদুর খুশীর আমেজে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলেন।

"আরে। আস্তে চালান। দুজনে একসঙ্গে বেঘোরে মরবো নাকি ?"

কোনও উত্তর না-দিয়ে রায়বাহাদুর গাড়ির গতি মন্থর করলেন।

হঠাৎ ধীরা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো—

"ওমা! এযে বাড়ির রাস্তা! এদিকে আবার সিনেমা কোথা ?" অস্পষ্ট ভাবে রায়বাহাদুর বললেন,

"আজ সিনেমা থাক। আর একদিন হবে। বাড়িতেই চল। গা-হাত-পা কামড়াচ্ছে।"

ধীরা আপত্তি করলো না।

* * *

অফিসে লাঞ্চের পর হরেন্দ্রলাল একমনে বাবার কথা চিন্তা করছিল। টেলিফোনের আওয়াজে চমকে উঠলো। আর, রিসিভার কানে লাগিয়ে, একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। ফোন করছে ধীরা মুখার্জি!

রিসিভারটা সে নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল। তার চরম বিদ্বেষ মেয়েটার ওপর। কিন্তু কৌতূহল ছাপিয়ে গেল বিরূপতাকে। "শোনাই যাক না, কি চাল চালে" ভেবে হরেন্দ্রলাল জিজ্ঞেস করলো,

"আমার সঙ্গে কি দরকার থাকতে পারে আপনার ?"

"দরকার আছে বৈকি। আপনার বাবা, আমার বাবা ছোট-বেলার বন্ধু। আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া থাকা উচিত নয়। প্রথম পরিচয়ে আপনার বেয়াড়া মেজাজ টের পেয়ে আমিও কড়া কথা শুনিয়েছি। হ্যালো........"

হরেন্দ্রলাল সাড়া দিল, "হুঁ।"

ধীরার ভণিতা শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী বক্তব্য বেশি ছিল না—

"একদিন আসুন আমাদেব এখানে। এলে বুঝবেন, আমি তেমন খারাপ নই। আপনার ভুল ধারণা ভাঙতে পারে।"

হরেন্দ্রলাল চুপ ক'রে থাকে।

ধীরা প্রস্তাবটা ঝালিয়ে নেয়—

"হ্যালো, আসছেন তো?"

ইচ্ছে না-থাকলেও হরেন্দ্রলালের মুখ দিয়ে নিমরাজি গোছের জবাব বেরুলো, "আচ্ছা"।

"আচ্ছা নয়। পরশু, বুধবার সন্ধ্যেয় আসবেন।"

হরেন্দ্রলালের মনে হল 'না' ক'রে দেয়। পারলো না। ভাবলো, বাবাকে জানিয়ে, যাবে। কিন্তু, তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ। নিজে থেকে সেধে তাঁর কাছে কোনও কথা তোলা অসম্ভব।

বুধবার দুপুরে ধীরা স্মরণ করিয়ে দিল। সন্ধ্যেয় হরেন্দ্রলাল গিয়ে হাজির হল ধীরাদের বাড়ি।

আপ্যায়নে ত্রুটি করলো না ধীরা। বিশেষ কাজে বাবাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছে ব'লে আফশোষ জানালো। হরেন্দ্রলাল চা না-খেয়ে পারলো না। তারপর শুধু দুই কর্তার গল্প। দেখা না-হলে একজন আর একজনকে চিঠি লিখবেন। হালেও লেখালেখি হয়েছে। ধীরা রায়বাহাদুরের চিঠি এনে দিল। হরেন্দ্রলালকে সেখানা আগাগোড়া পড়তেও হল।

হরেন্দ্রলাল যেতেই ধীরা রায়বাহাদুরকে ফোনে ডাকলো। তিনি শুনলেন তার কথা। হরেন্দ্রলালকে ডাকিয়ে সে চিঠিখানা পড়িয়েছে কায়দা ক'রে। কিন্তু, ছেলে তাঁর অতি ভীষণ। সাপের চেয়েও খল।

রায়বাহাদুর সায় দিলেন,

"তা বুঝতে পেরেছি।"

"বোঝা-টোঝা নয়। যে ছেলে পরের কাছে বাপের নিন্দে করে, মত তার কুটিল, হিংস্র মানুষ থাকতে পারে না।"

"কি নিন্দে করেছে?"

রায়বাহাদুরের গলা কাঁপছিল।

"এসে শুনবেন।"

শোনবার তাগিদে রায়বাহাদুর পরের দিনই এলেন। ছেলে প্রত্যেক কথায় তাঁকে হেয় করেছে, ব্যবসায় তাঁর কোনও কৃতিত্ব নেই, ধুঁকছেন সব সময়। নানারকম রোগ আছে। ওষুধ খান গোপনে, বহু পয়সা নষ্ট করেন—ফিরিস্তি শেষ হবার আগেই রায়-বাহাদুর লাফিয়ে উঠলেন। ধীরা হাতে ধ'রে মানা না-করলে সে রাতেই হরেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর চরম ফয়শালা হ'য়ে যেত। সকালেও ধীরা ফোনে সাবধান ক'রে দিল, "মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন, সব সময় হুঁশিয়ার থাকবেন।"

রায়বাহাদুরকে ক্রোধ দমন করতে হল। কিন্তু, ছেলের ওপর তাঁর অমানুষিক ঘৃণা দাঁড়িয়ে গেল। কোন দিক দিয়ে পথে বসাবে, ঠিক নেই। ঠকাচ্ছে তো বটেই।

রায়বাহাদুর মিস গোমেস আর বেয়ারা মারফৎ প্রত্যেকটা ব্যবসার খাতাপত্র আনাতে শুরু করলেন। খুঁটিয়ে দেখে ত্রুটি বা ভুল-চুক নজরে না-পড়ায় ভয়ানক রকম ভয় ধরলো তাঁর—জাল-জোচ্চুরিতে পাকা ওস্তাদ। এরকম ছেলের হাত থেকে র'ক্ষে পাবেন কি ক'রে। একেবারে দুধ দিয়ে কালসাপ পুষে এখন সর্বনাশ ঠেকানো দায়।

ধীরাকে সব জানাবার জন্যে রায়বাহাদুর ছটফট করছিলেন। বলতে বাধছিল। একেবারে ঘরের কেলেঙ্কারি। তবু শেষে নিজের পথ বেছে নিলেন। ধীরা ছাড়া আর কেউ তাঁর আসল শুভ-কামনা করে না। তার সঙ্গে পরামর্শ দরকার। তারপর গুণধর

ছেলের মুখটা একেবারে পুড়িয়ে দিতে হবে। ধীরার বুদ্ধিতে হরেন্দ্রলালের ঠগবাজিও ধরা পড়তে পারে।

কর্তব্য স্থির ক'রে অফিস ছুটির মুখে রায়বাহাদুর ধীরাকে ফোন করলেন। সে ছিল না। চারবারের চেষ্টায় তাকে না-পেয়ে রায়বাহাদুর বাড়ি ঘুরে, পোষাক বদলিয়ে, গাড়ি নিয়ে ছুটলেন।

ফিরলেন কিন্তু ধীরার সঙ্গে দেখা না-ক'রেই। দরজায় ছিল হরেন্দ্রলালের গাড়ি। নিজের গাড়িতে ব'সে দূর থেকে রায়বাহাদুর লক্ষ্য করলেন অনেকক্ষণ। হরেন্দ্রলাল বেরুলো না। এদিক সেদিক ঘুরে, আধ-ঘণ্টাটাক পরে এসেও তাঁর নজরে পড়লো ছেলের গাড়ি। একই জায়গায় রয়েছে।

রায়বাহাদুরের মাথায় আগুন জ্বলছিল। দাঁত কড়মড় করতে করতে নিজের মনে বারকত বললেন, "খুন করবো, খুন করবো।" তারপর, ঝড়ের বেগে গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

হরেন্দ্রলাল এল অনেক দেরীতে। স্ত্রীর কাছে শুনলো, বাবা অনবরত ডেকে পাঠাচ্ছেন। ডাকের পালা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছে। তবে আবার বার বার তলব কেন। রাত্তিরে হঠাৎ এমন কি দরকার দাঁড়ালো। রায়বাহাদুরের পক্ষে এটা বরাবরই অস্বাভাবিক। খুব জরুরী কথা থাকলে তিনি আগে সকালে ছেলের সঙ্গে আলোচনা করতেন। ডিনারে বসতেন একা। ছেলে সামনে এলে বড়জোর ঘরোয়া দু-একটা প্রসঙ্গ উঠতো।

পরম বিস্ময়ে হরেন্দ্রলাল আন্দাজ করলো—এরকম প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অসময়ের ডাকাডাকি—বাবা হয়তো ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনও সাংঘাতিক খবর পেয়েছেন।

রায়বাহাদুর ব'সেই ছিলেন। হরেন্দ্রলাল ঢুকতে চেঁচিয়ে উঠলেন—

"নিজের ছেলে। পেছন থেকে ছুরি মারছিস।"

"একি বলছেন বাবা।"

—হরেন্দ্রলাল সামনের চেয়ারখানা ধ'রে দাঁড়ালো।

রায়বাহাদুর একটানা বীভৎস তিরস্কার চালাতে লাগলেন—"দিনের পর দিন জোচ্চুরি আমার সঙ্গে। তোর মুখ দেখলেও পাপ হয়। সব হাতে তুলে দেওয়ার এই পরিণাম। নিমকহারাম।"

"শুধু শুধু গালাগাল করবেন না।"

—বাপের কথায় পাল্টা জবাব দেওয়া হরেন্দ্রলালের জীবনে এই প্রথম। রাগে হাতের চেয়ারে ঝাঁকুনি দিল সে।

"শুধু শুধু গালাগাল? জানিস না, কি করেছিস? বৌকে নিয়ে দূর হয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। আমার অফিসে ঢুকবি না।"

"যা করবার, আপনিই ক'রে থাকেন। বাড়ি থেকে যেতে পারি। তবে, অফিসে যাওয়ার অধিকার আমার আছে, সব কারবারেই আমার ভাগ আছে। সামান্য হলেও, খাটুনির ভাগ। জেনে রাখুন, অফিসে অভদ্রতা করলে অপমানিত হবেন।"

হরেন্দ্রলাল ছুটে চ'লে গেল নিজের ঘরে। বৌ জেগেছিল। বেয়ারা-বাবুর্চি-খানসামারা ঘোরাঘুরি করছিল। জানাজানি, কানাকানির বাকী রইল না।

পরদিন হরেন্দ্রলাল সপরিবারে গিয়ে উঠলো হোটেলে। বাড়ির কেলেঙ্কারি এবার গড়ালো আদালতে। রায়বাহাদুর ছেলের বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ভঙ্গ, প্রতারণা, তছরুপের মামলা দায়ের করলেন।

দেবনারায়ণ ধীরাকে মাসের পর মাস পাঁচশো ক'রে টাকা দিয়ে যাচ্ছিল। এটা, সেটা উপহার থাকতো ফাউ হিসেবে। হপ্তায় একটা, না-হয় দুটো দিন তার কাটতো ধীরার সঙ্গে। তাকে নিয়ে সিনেমায় যেত মাঝে মাঝে। কিন্তু, বাকী সময়টা দেবনারায়ণের খালি খালি লাগতো।

গোবর্দ্ধন তার সব সময়ের সঙ্গী। অবসর কাটানোর জন্যে সে তাকে রেস-কোর্স চিনিয়ে দিল। বিকেলে, সন্ধ্যেয় কুখ্যাত পল্লীতে দুজনের যাতায়াত শুরু হল। দেবনারায়ণ মদও ধরলো।

ম্যানেজার টাকা জোগাচ্ছিলেন বরাবর। মুখের কথা লাগতো শুধু। তারপর কাগজে সই করা।

এই ভাবেই, দেখতে দেখতে দেবনারায়ণ অফুরন্ত স্ফূর্তিতে মশগুল হয়ে উঠলো। ধীরার ওপর তার আকর্ষণ দুর্নিবার। অন্য সব উপসর্গের টানও বেজায়। আগে জানতো না, জীবনটা এত আনন্দে ঠাসা—একটুও ফাঁক যায় না দিনে, রাতে। দশটায় উঠে চা-পর্ব। তারপর বেলা একটা-দেড়টা অবধি আড্ডা। দুপুরে আকণ্ঠ খেয়ে ঘুম, নইলে, রেসের মাঠে দৌড়োনো। সন্ধ্যেয় সেজেগুজে বেরুনো। ধীরার ওখানে কাউকে নেওয়া চলে না। অন্য দিন গোবর্ধন সঙ্গে থাকে। গোবর্ধনই রাত্তিরে তাকে চাকরের জিম্মা ক'রে দিয়ে যায়। চাকরের হাত ধ'রে দেবনারায়ণ ওপরে ওঠে। প্রথম প্রথম মা জেগে ব'সে থাকতেন। ছেলের রকম-সকম দেখে তিনি ইস্তফা দেন শেষ পর্যন্ত। ঠাকুর খাবার চাপা দিয়ে রাখে ঘরে। দেবনারায়ণ কোনও দিন খায়, কোনওদিন খায় না। বমি ক'রলে মা ওঠেন, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

ধীরাদের বাড়ি গেলেও দেবনারায়ণ টলতে টলতে ফেরে। তবে মাত্রাটা কম থাকে। গোবর্ধন আসে না সঙ্গে। রেসে কিছু জিত

হলে দেবনারায়ণ সারারাত বাইরে মাইফেল চালায়। সকালে বাড়িতে ফিরে শয্যা নেয়। ওঠে একেবারে দুপুর গড়িয়ে গেলে। মা শুধু বাইরে থেকে জানালা দিয়ে বার বার দেখে যান। ছেলের নাক-ডাকা শুনেই তাঁর শান্তি।

কিন্তু, চলমান চাকা থেমে গেল একদিন। বাগান-পার্টির খরচা নিয়ে হিসেব ধরছিল গোবর্ধন। বাগান ঠিক ক'রে ফেলেছে। খাওয়া-দাওয়ার সব উপকরণ যাবে হোটেল থেকে। গোবর্ধন বললো,

"সোডা, বরফ—সব বেশি ক'রে, চাই। রাত পর্যন্ত চালাতে হবে তো।"

দেবনারায়ণ সায় দিল—

"কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ। গোবরা আগে থেকে সব ভেবে রাখে।"

সবাই হেসে উঠলো অমনি। গোবর্ধন ফর্দ পড়া শুরু করলো—

"রোষ্ট মুরগী ষোলটা, বিরিয়ানি পাঁচ সের, কাঁকড়া-চচ্চড়ি আড়াই সের........"

পড়া এগুলো না আর। পুলিশ নিয়ে একটা লোক একেবারে আসরে ঢুকে পড়লো।

দেবনারায়ণের মুখ শুকিয়ে যায়। সে চায় গোবর্ধনের দিকে। ভোজের ফর্দ পকেটে রেখে ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া গোবর্ধন শুধোয় আগন্তুককে—

"কি দরকার আপনার।"

আগন্তুক জবাব দিল,

"আমি কোর্ট থেকে আসছি। বেইলিফ। অর্ডার সঙ্গে আছে। য়্যাটাচ্ করবো।"

"য়্যাটাচ করবেন? তার মানে?"

"তার মানে, আটকাবার ব্যবস্থা। এই বাড়ির মালিক দেবনারায়ণ-বাবু সব সম্পত্তি বন্ধক দিয়েছেন। তাঁর পাওনাদার নালিশ করেছে। মামলার প্রথম তারিখে দেবনারায়ণবাবুর তরফে কেউ দাঁড়ায়নি। য়্যাটাচ্মেণ্ট বিফোর জাজমেণ্ট্-এর অর্ডার হয়েছে।"

এতক্ষণে দেবনারায়ণ মুখ খুললো—

"বন্ধক? নালিশ? কই, জানি না তো!"

"জানা না-জানা দিয়ে আমি কি করবো? এর আগে নোটিস এসেছে এই বাড়িতে। দেবনারায়ণবাবু নিজে সই ক'রে নিয়েছেন।"

"কিরকম? হতে পারে না।"

"কোর্টে গিয়ে দেখে নেবেন। পাওনাদারের লোকজন বাইরে অপেক্ষা করছে।"

এর মধ্যে দেবনারায়ণের বন্ধুরা সবাই একে একে সরে পড়েছিল। বাকী ছিল শুধু গোবর্ধন। তার মাথায় গেল, ব্যাপারটা গুরুতর, একটা কিছু করা দরকার। দেবনারায়ণকে বললো,

"তুমি ফোনে ম্যানেজার বাবুকে ডাকো। এঁরা দয়া ক'রে বসুন একটু। চা-টা আনাও।"

লোকটি দেরি করবে না কিছুতে। গোবর্ধন বোঝালো তাকে—দেবনারায়ণবাবুর ম্যানেজার আসছেন। তিনি এলেই সব ব্যবস্থা হবে।

ম্যানেজার পঁওছালেন একটু পরে। ভেতরে নিয়ে গিয়ে দেবু তাঁকে জিজ্ঞেস করলো—

"সম্পত্তি বাঁধা পড়েছে, কোর্ট থেকে লোক এসেছে। অথচ, আমি কিছুই শুনিনি য়্যাদ্দিন!"

একটু হেসে ম্যানেজার তার কৌতূহল মেটালেন—দিনের পর দিন টাকা নিয়েছে সে। টাকার জন্যে সব সম্পত্তি মরগেজ দিতে হয়েছে। সমস্ত বন্ধকী দলিলে দস্তখত করেছে সে নিজে। উত্তমর্ণের এটর্ণি আগে চিঠি পাঠিয়েছিল। তারপর আসে কোর্টের নোটিস।

দেবু রসিদ সই ক'রে সব নেয়। খেয়াল নেই তার। চিঠি, নোটিস সে-ই ম্যানেজারের কাছে পাঠায়। তিনি খোঁজ করেছিলেন। কিন্তু, দেনার যা পরিমাণ, তাতে, নিদেন পক্ষে বিশ হাজার টাকা দিলে মামলা রোখা যেত। য়্যাটাচমেণ্ট ঠেকাতে হাজার দশেক লাগবে।"

দেবু বললো,

"এখনই টাকা যোগাড় করুন।"

ম্যানেজার উত্তর দিলেন,

"কোথায় পাবো? সবই তো আটক।"

"তাহলে উপায়?"

"গিন্নীমাকে ধরুন। তাঁর হাতে কিছু আছে নিশ্চয়।"

"ধরছি। তবুও এখনকার মত সামলান।"

আশ্বস্ত ক'রে ম্যানেজারবাবু দেবনারায়ণকে ওপরে পাঠালেন। ততক্ষণে গোবর্ধনও চ'লে গিয়েছে। খানিক বাদে বেইলিফ আর পুলিশকে নিয়ে ম্যানেজারবাবু বেরিয়ে পড়লেন। খবর পেয়ে দেবনারায়ণ আবার এল বৈঠকখানায়। মা-র সঙ্গে কথা হল না। তিনি আহ্নিকে বসেছিলেন। তখনও স্নানাহারের সময় হয়নি। বাগান-পার্টির তোড়জোড় বাকী রয়েছে। অথচ গোবর্ধন পর্যন্ত উধাও। দেবনারায়ণের মনটা বড় খিঁচড়িয়ে উঠলো।

দুপুরে খেতে ব'সে সে মার কাছে সব বললো। শুনে তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, এত ধার-দেনা হল কি ক'রে? দেবনারায়ণ বোঝালো, অত তাঁর মাথায় যাবে না।

মা-র বক্তব্যে নতুন কিছু ছিল না। আগে টাকা-পয়সার মালিক ছিলেন কর্তা নিজে। পরে সব গিয়েছে দেবনারায়ণের জিম্মায়। গয়না ছাড়া তাঁর হাতে আর কিছু নেই। দেবনারায়ণ গয়না-পত্রের আন্দাজী দামটা জানতে চাইলো। মা বলতে পারলেন না।

গয়না বেচলো দেবনারায়ণ নিজের হাতে। বাগান-পার্টির খরচা রেখে বাকীটা ম্যানেজারকে দিতে গেলে, তিনি দায়িত্ব নিতে চাইলেন না। তাঁর সঙ্গে কোর্টে যেতে হবে। সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে দেবনারায়ণ নিজে জমা করাবে।

টাকার পরিমাণ বেশী ছিল না। তাতে কোনও রকমে য়্যাটাচমেণ্ট বিফোর জাজমেণ্ট বন্ধ হল।

এটর্ণির সাফ জবাব শুনে দেবনারায়ণের চক্ষুস্থির। দুদিনের টাকা পেলেন মোটে। বকেয়াটা না-দিলে তিনি ঘর থেকে খরচ জুগিয়ে মামলা চালাতে পারবেন না।

মার কাছে ধর্ণা দিয়ে লাভ হল না। দেবনারায়ণ পরামর্শ চাইলো গোবর্ধনের কাছে। বাগান-পার্টির পর থেকে সব বন্ধু বর্জন করলেও সে আসছিল রোজ। এটর্ণির বিলে চোখ বুলিয়ে সে অনেক উপদেশ দিল দেবনারায়ণকে। কিন্তু, টাকা সংগ্রহের কোনও ব্যবস্থা হল না।

যা হাতে পাবে, তার আড়াই গুণের হ্যাণ্ডনোট কাটতেও দেবনারায়ণের আপত্তি ছিল না। গোবর্ধন হেসে উড়িয়ে দিল প্রস্তাবটা। যার টিকি পর্যন্ত বাঁধা পড়েছে, তাকে লোকে হাওলাত দেবে কিসের ভরসায়? দেবনারায়ণ কাতর ভাবে জিজ্ঞেস করলো,

"তা হলে কি করবো?"

গোবর্ধন বললো—

"কি আর করবি। গোড়াতেই ভাবা উচিত ছিল। কিছু সম্পত্তি বেনামদারিতে রাখিসনি কেন? কত লোক এইভাবে পাওনাদারদের কলা দেখায়। আমার কাছে পরামর্শ নিলে শিখিয়ে দিতাম।"

"পরামর্শের কথা কি মাথায় এসেছে। চাইলেই টাকা পাচ্ছিলাম।"

"ম্যানেজার ব্যাটা জাল-টাল করেনি তো?"

"না। অনেকদিনের বিশ্বাসী লোক। সই করেছি, টাকা নিয়েছি।"

"বাপ মরবার পর থেকে মোট কত পেয়েছিস, মনে আছে?"

"না। তা কখনও খেয়াল থাকে?"

"বুঝে-সুঝে সই করতে হয়।"

"তুইও তো দেখেছিস। ম্যানেজার এসে হুড়মুড় ক'রে ঢুকবে, দস্তখত নেবে, টাকা দেবে। তুই তো সাবধান করিসনি কখনও।"

"বাড়ি পর্যন্ত যেতে বসেছে, জানবো কি ক'রে। অনেক পার্টি ছিল আমার হাতে। বেশি টাকা মিলতো। ম্যানেজার কত দালালি খেয়েছে, ঠিক কি।"

এত শুনেও দেবনারায়ণ মিনতি জানালো বন্ধুকে—

"তুই একটা কিছু বুদ্ধি কর। রাস্তা বাৎলা যা হোক।"

গোবর্ধন জবাব দিল মাতব্বরের মত—

"রাস্তা অমনি মুখের কথা কি না। মামলার খরচটা জোগাড় কর। আমি পাঁচ জায়গায় ঘুরে দেখি।"

গোবর্ধনের কাছে নিরাশ হয়ে দেবনারায়ণ ছুটলো ধীরাদের বাড়িতে।

সকালে বাইরের ঘরে ব'সে ধীরা চা খাচ্ছিল। দেবনারায়ণকে ঠাট্টা করলো—

"উস্কো-খুস্কো চুল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখ-মুখ পর্যন্ত না-ধুয়ে হাজির। এবার নিশ্চয় মাকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন।"

দেবনারায়ণ সব কাহিনী বললো। হাতে একটা পয়সা নেই। মামলার খরচ জোটাতে না-পারলে পথে বসতে হবে।

হাত টান ক'রে আলস্য ভেঙে ধীরা উঠে পড়লো তার কথার মাঝখানেই। সে মুখ ফুটে টাকা চাইতে পারলো না। ধীরাকে বেরুতে হবে একটু পরে, একেবারে স্নান-টান সেরে।

দেবনারায়ণ ফিরলো উদ্‌ভ্রান্তের মত।

গোবর্ধন এসে অপেক্ষা করছিল বৈঠকখানায়। কাঁদো কাঁদো মুখে তাকে জানালো, কোথাও সিকি পয়সা মিলছে না।

গোবর্ধন সান্ত্বনা দিল—সে সব ভেবে রেখেছে। কুছ পরোয়া নেই। বাড়িতে অত জিনিস। দু-চারটে টেবিল, আলমারি, আয়না বিক্রী করলেই যথেষ্ট।

দেবনারায়ণ খানিকটা বল গেল বুকে। বাড়ি-ভর্তি আসবাব-পত্র। অথচ, সামান্য টাকার জন্যে সে মাথা খারাপ করছে। সে গোবর্ধনকে তাড়াতাড়ি খদ্দের ডেকে আনতে বললো।

তাকে বোকা বানিয়ে গোবর্ধন বোঝালো, খদ্দের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় না। তাছাড়া, সেধে কাউকে ডাকলে জলের দরে বেচতে হয়। নীলামে ভাল পয়সা পাওয়া যায়, চড়া দাম মেলে।

দেবনারায়ণ নীলামে রাজি হয়ে গেল।

গোবর্ধন জিজ্ঞেস করলো—

"নীলাম এখানেই হবে তো ?"

দেবনারায়ণ হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো।

"লিষ্টি বানিয়ে বাইরে টানিয়ে দিই তাহলে ?"

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝে দেবনারায়ণ বললো,

'না, না। বাড়িতে নয়। বড্ড বেশি জানাজানি হবে। পাড়া শুদ্ধু লোক জুটে যাবে। একেবারে ইজ্জৎ ঢিলে। তুই অন্য কোথাও ব্যবস্থা কর।"

সে দিন বিকেলেই গোবর্ধন চারটে আলমারি, দুটো বড় টেবিল, দুখানা বড় আয়না নিয়ে গেল লরিতে চাপিয়ে। রাত্তিরে একশো টাকার একখানা নোট এনে দিল। লরি-ভাড়া, কুলি-খরচা বাদে যা ছিল, তার থেকে সে রেখেছে চার টাকা সাড়ে তের আনা, মানে খুচরোটা। বাকী ঐ একশো।

একশো টাকায় একদিনের আধাআধি খরচও হয় না। পরদিন নোটখানা হাতে নিয়ে বেজার এটর্ণি শুনিয়ে দিলেন, দিনকত সময়

পাওয়া যাবে। কিন্তু, এক হপ্তার মধ্যে বকেয়া শোধ না-হলে তিনি মামলার দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন।

দেবনারায়ণ আবার উপস্থিত হল ধীরাদের বাড়ি। লজ্জায় মুখ আটকিয়ে গেলেও সে টাকার কথা পাড়লো।

ধীরা সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলো হো হো ক'রে। বললো—

"টাকা? আমার কাছে টাকা চাইতে এসেছেন? টাকা-পয়সাকে আমি হাতের ময়লা মনে করি। জানেন তো, রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা—টাকা মাটি, মাটি টাকা।"

মরিয়া দেবনারায়ণ তবুও আরজি চালাতে লাগলো—

"তা হোক। আপনি ছাড়া কে আছে আমার? কে দেখবে আমাকে? আপনি শুধু খরচটা চালিয়ে দিন। মামলা মিটে গেলে সব ফেরত পাবেন।"

আবার হাসলো ধীরা—

"মামলা? মামলা আবার মিটবে কি? বড়লোকের ছেলে কুসঙ্গে প'ড়ে সব উড়িয়েছেন। এখন পাওনাদারদের ঠকাতে চান। কিন্তু, তাদের বোকা ঠাওরাবেন না।"

"আপনি দয়া ক'রে বাঁচান আমাকে।"

"আমার পক্ষে অসম্ভব। নিজে বাঁচবার চেষ্টা দেখুন। টাকা-পয়সার সম্পর্ক রাখি না। যা পাই, মা-র হাতে তুলে দি-ই। নিজে ভবিষ্যৎ ভেবে চলেননি। ফল ভুগবেন বৈকি। পাপ করলে রেহাই পাওয়া যায় না। গোল্লায় গেলে তার মাশুল গুণতে হয়। মা কালীকে ডাকুন। তিনি শেষ ভরসা।"

নৈরাশ্য-ক্ষুব্ধ দেবনারায়ণ জিজ্ঞেস করলো,

"দেবেন না তাহলে?"

হাঁটু নাচাতে নাচাতে ধীরা বললো—

"ক্ষমতা নেই আমার। তা-ছাড়া, আপনি একদম অপাত্র।

সাধু, ফকির, গরীব, ভিখিরীকে দান করলে পুণ্য আছে। আপনার জন্যে একটা কাণাকড়ি খয়রাত হলেও পাপ।”

“কী? আমি পাপী, আর, আপনি ভাল মানুষ?”

—দেবনারায়ণ লাফিয়ে দাঁড়ালো।

ধীরা কিন্তু নড়লো না। মুচকি হেসে পাল্টা জবাব দিল—

“বস, বস, দেবুবাবু। বাপকে বিষ খাইয়ে মেরেছো। তার শাস্তি যাবে কোথা। আমার এখানে চোটপাট করলে পুলিশের হাতে পড়বে। তারপর ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে পার, দ্বীপান্তরেও যেতে পার। তুমি আকাট মুখ্খু। আইন জানো না।”

দেবনারায়ণ সিধে বেরিয়ে পড়লো। গেটের বাইরে পা বাড়াতে বাড়াতে কানে গেল তার ধীরার শাসানি, “ফের এসে জ্বালাতন করলে মজাটি টের পাওয়াবো।”

আঠার

রমেন ম্যাট্রিক পাশ করলো ফাষ্ট ডিভিসনে। আই-এসসি পড়বে। মহা উৎসাহে কলেজের খোঁজ-খবর নিতে লাগলো।

রাখাল মুখুজ্জে একদিন জিজ্ঞেস করলেন,

"কলেজে ভর্তি হবি নাকি?"

রমেন ঘাড় নাড়লো।

"দিদির সঙ্গে কথা বলেছিস?"

রমেন চুপ ক'রে রইলো।

"ওর মত চাইতো।"

রমেনও জানতো যে, দিদি রাজি না-হলে কলেজে ঢোকার আশা নেই।

কিন্তু, ধীরা আমল দিল না একদম। রমেন কলেজে ভর্তি হবে, হোক। সংসারের খরচ বেড়েছে। বাবার আয় বন্ধ। ধীরা কত দিক সামলাবে। রমেন ছেলে-মানুষ নয়, পাশ করেছে একটা। দু-বেলা দুটো টুইশনি নিলে কলেজের মাইনে, গাড়ি ভাড়া চালাতে পারবে। মাঝে মাঝে দু-একখানা ক'রে বই কিনলেই চলবে। লেখাপড়া রীতিমত সাধনার জিনিস। তার জন্যে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

দিদির মতামত শুনে রমেন ঘুরলো অনেক। বাবাকে বললো, বন্ধুদের বললো, আরও অনেককে বললো, কিন্তু, টুইশন জুটলো না। চেহারা তার ছোট্টখাট্ট। দেখলে মনে হয় নিতান্ত নাবালক। অতটুকু ছেলেকে মাষ্টার রাখার মত অভিভাবক মিললো না।

এদিকে কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় পেরিয়ে যায়। লেট ফী দিয়ে নাম লেখানোর মেয়াদও শেষ হয়ে আসে। রমেন খেতে পারে না, ঘুমোতে পারে না, সারাদিন টো টো ক'রে ঘোরে। দিদির কাছে আবার আবেদন করতে মন চায় না তার। তবু, শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো গিয়ে তার সামনে।

"কি? ছাত্তর-টাত্তর জুটেছে?"

—ধীরার প্রশ্নে রমেন মাথা নীচু ক'রে রইলো।

"হুঁ। চেষ্টা আছে? শুধু ব'সে ব'সে খাওয়ার তাল।"

"তোর বয়সী ছেলের মাসে খোরাক-পোষাক কত লাগে জানিস?"

রমেন সাড়া দিল না।

"নিশ্চিন্তি আছিস। মনে করছিস, এইভাবে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালেই চলবে।"

রমেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো—

"তোমার পায়ে পড়ি, দিদি, কলেজে ভর্তি হওয়ার টাকাটা দাও। ছেলে পড়ানোর কাজ পেলে আর কিছু চাইবো না তোমার কাছে।"

ধীরা বললো, পায়ে মাথা খুঁড়লেও কিছুই করতে পারবে না সে।

রমেন মা-র কাছে গিয়ে কাঁদলো। তিনি ক'সে বকলেন। ফের বাবাকে ধরলো। তিনি পরের বছর ভর্তি হবার পরামর্শ দিলেন। রমেন তাই শেষ বারের মত ধীরার কাছে গিয়ে তার পায়ে হাত রাখলো।

ধীরা খিঁচিয়ে উঠলো—

"ও সব আবার কি ন্যাকামি? সাতজন্মে তো নমস্কার করতে দেখি না।"

"তুমি আমায় লাথি মারো, ঝ্যাঁটা মারো, কিছু বলবো না। শুধু কলেজের টাকাটা দাও।"

ধীরা এক ঝটকায় পা সরালো।

রমেন আর সামলাতে পারলো না। রুখে উঠলো—

"রূপোর বাসন, হীরে-মুক্তোর গয়না—কোনটা নেই তোমার? রায়বাহাদুর, দেবনারায়ণ বাবু তোমাকে কত টাকা দিয়েছেন। তবুও মায়ের পেটের ভাইকে পড়তে দেবে না? একফোঁটা মায়া-মমতা নেই তোমার মনে?"

"য়্যাঁ? আমার খেয়ে-প'রে তুই আমাকেই ছোটলোকের মত গালাগালি করছিস? জানোয়ার! এক পয়সার মুরোদ নেই, চ্যাটাঙ চ্যাটাঙ কথা! জুতো মেরে বিদেয় ক'রে দোবো।"

মা, নীরেন, মিনু—সবাই জড় হয়েছিল পাশের ঘরে। রমেনের হয়ে কেউ রা কাড়লো না। মুখ বুজে কাঁদতে কাঁদতে সে চ'লে গেল রাস্তায়। রাত্তির পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে কেবলই তার মনে হতে লাগলো, দিদির মত ভীষণ মানুষের কৃপায় সে বেঁচে আছে। পড়া ছেড়ে দিতে হল। ঘৃণিত জীবনের ভার বইতে হবে চিরটা কাল। কোনও বাসনা মিটলো না তার—সব কল্পনা অপূর্ণ র'য়ে গেল। সামান্য টুইশনি পর্যন্ত জুটলো না। ভাল চাকরি পাবে না কোনও দিন। ম্যাট্রিকের বিদ্যেয় কেরানিগিরির ওপর উঠবে না। তারপর বুড়ো বয়েস পর্যন্ত ছেলে-মেয়ে নিয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম। শেষে আর পাঁচজনের মত ম'রে যাওয়া। ভুলে যাবে সবাই।

অঙ্ক কষবে, বিজ্ঞান পড়বে, আবিস্কার করবে, বড় বড় মনীষীর সঙ্গে তার নামও লেখা থাকবে মানুষের ইতিহাসে। বাড়ির বিরূপতা উপেক্ষা ক'রে রমেন এই সবই ভেবেছে বুদ্ধি হবার পর থেকে। বই সামনে রেখে পড়তে পড়তে মন চ'লে যায় ভবিষ্যতের পটভূমিকায়। বাড়ির পাঁচমিশেলি গোলমালে তার চোখ-কান এতদিন বর্তমানকে উপেক্ষা করেছে নির্লিপ্ত থেকে। সাধনা আর কল্পনা নিয়ে চলেছে সে। দিদির কড়া কথা, মার বকুনি, বাবার নিস্পৃহতা—সব কিছুর আড়ালে সে অপেক্ষা করেছে, কখন রাত্তির হবে, খাওয়া মিটবে, পড়া সেরে শুতে যাবে। বালিশে মাথা দিয়ে সে মনের পটে তুলি চালায়। দেখতে পায়, সে কলেজে পড়াচ্ছে, গবেষণা করছে, বাড়িতে একা ব'সে আছে চারপাশে বই নিয়ে। নিজের মস্ত বড় লাইব্রেরি। কোনও গোলমাল নেই। সেখানে দিদি নেই, মা নেই, বাবা নেই, নীরেন নেই, মিনু নেই। কেউ গালাগাল দেয় না, কেউ জ্বালাতন করে না। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়া। ভোরে ঘুম

ভাঙতে আলসেমির মধ্যে একই ছবি খণ্ডে খণ্ডে। রমেন তার নিজস্ব অনুভূতিতে ভিন্ন এক জগৎ গ'ড়েছিল। ভেঙে চুরমার হয়ে সে জগৎ মিলিয়ে গেল নিঃসীম, জমাট অন্ধকারে।

বাড়ি ফিরে রমেন খেতে পাবলো না। রান্না ভাত-তরকারি নষ্ট করার দায়ে মা-র তিরস্কার শুনলো।

শুয়ে শুয়ে নতুন চিন্তা। কেউ তার সমব্যথী নয়। কিন্তু, যদি ম'রে যায় সে, মা নিশ্চয় কাঁদবেন। বাবার চোখেও জল আসবে। যতদিন ওঁরা বেঁচে থাকবেন, তার কথা মনে পড়বে। নীরেন-মিনু ভুলে যাবে তাকে। দিদি? দিদি খুশীই হবে। হোক। তারই তো জয়জয়কার। বাবা-মা দিদির ওপর কথা বলেন না। নীরেন-মিনু দিদির বশ। সে-ই সংসারে অবাঞ্ছিত, গলগ্রহ।

রমেনের মাথায় এল আত্মহত্যার কথা। রাতের ঘুম চ'লে গেল, দুবেলার খাওয়া ঘুচে গেল। সব সময় একই চিন্তা—মরতে হবে।

কিন্তু, কি ক'বে মরবে? বিষ কিনতে পয়সা লাগে। কোথায় বিষ পাওয়া যায়? জলে ডুববে? রেল-লাইনে মাথা রেখে শুয়ে থাকবে? ভাবতে ভাবতে রমেন মরবার রাস্তা নিজেই খুঁজে পেল। মনে পড়লো, বাবার একটা মালিশের শিশিতে লেবেল আঁটা দেখেছিল "বিষ"। বাবার ঘরে তাকের ওপর খুঁজতে শিশিটা পেল। সেটা হাতে নিয়ে ছিপি খুললো। গন্ধ শুঁকলো। আধখালি হলেও ঝাঁঝালো। শিশি সরিয়ে রাখলো বই-খাতার মধ্যে।

মনের বেদনা উজাড় ক'রে রমেন চিঠি লিখলো একখানা। তাতে বিদ্বেষের কথা রইল না একটিও। মৃত্যুর জন্যে রমেন কাউকে দুষতে চায় না। সবার কাছে সে পরগাছা, আপদ। পড়াশুনো করতে পারলো না টাকার জন্যে। তাই বেঁচে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

চিঠি তৈরি হওয়ার পর রমেন আর দেরী করলো না। খেতে ব'সে ভাত নেড়ে-চেড়ে উঠে পড়লো। মার বিরক্তি গায়ে মাখলো না। বিছানায় শুয়ে সারারাত কাঁদলো।

ভোরে উঠেও রমেন বিছানা ছাড়লো না। মা মুখ-ঝামটা দিলেন—

"বেলা অবধি আয়েস করলে ঘর-দোর পরিস্কার হবে অমনি অমনি।"

রমেন বললো,

"শরীরটা বড় খারাপ। আজ আমিই ঘরের বিছানা তুলে রাখবো।"

মা গেলেন রান্নাঘরে। নীরেন-মিনুকে নিয়ে বাবা চা খাচ্ছিলেন উঠোনে ব'সে। সন্তর্পণে উঠে রমেন ছেঁড়া সার্ট একটা গায়ে দিল। মালিশের শিশিটা নিয়ে এল বিছানায়। বালিশের তলা থেকে চিঠিখানা বার ক'রে রাখলো পকেটে। ও সময় কারুর ঢোকবার কথা নয়। রমেন তবুও কান পেতে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর, শিশিটা মুখে উপুড় ক'রে বাঁ হাতে চেপে ধরলো ঠোঁট দুটো। বিশ্রী, ঝাঁঝালো আস্বাদ মালিশটার। গিলতে গিয়ে বমি এল। তবু, সবটাই গলা দিয়ে নামলো আস্তে আস্তে।

চোখ বুজে শুয়ে থাকে রমেন। মাথাটা কিরকম করছে, পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু, মনে তার শান্তি। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগলো। পেটের ভেতর যেন ছুঁচ ফুটছিল। কয়েকবার ওয়াক উঠলো। রমেন চাপতে পারলো না।

মা এলেন রুদ্রমূর্তি নিয়ে। খুন্তি নাড়তে নাড়তে গালাগালি শুরু করলেন—

"বিছানায় বমি করছিস, আক্কেলখেকো? ঝি রেখেছিস কাউকে? ঐ বমি খাইয়ে ছাড়বো।"

মা ফিরে গেলেন।

রমেন আবার ওয়াক তুললো।

আবার মা হাজির হলেন। তাঁর কড়া তিরস্কারে রমেন সাড়া দিল না। তিনি তেড়ে গিয়ে ধাক্কা লাগালেন কয়েকটা। রমেন শুধু নড়লো একটু।

গিন্নী ডেকে আনলেন কর্তাকে। রাখালবাবু ছেলেকে তুলে বসালেন। সে নেতিয়ে পড়লো।

"বাইরে নিয়ে চল, বাইরে নিয়ে চল। এতবড় ছেলের ঢঙ দেখছো না।"

—গিন্নির কথায় রাখাল মুখুজ্জে কোনও রকমে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে রমেনকে নিয়ে গেলেন চৌকাঠের বাইরে। সে মুখ থুবড়িয়ে পড়লো।

মা ডেকে আনলেন ধীরাকে।

রাখালবাবু বললেন,

"মনে হচ্ছে বাড়াবাড়ি কিছু অসুখ।"

"অসুখ? তাহলে হাসপাতালে পাঠাতে হবে, বাপু। বাড়িতে ঝামেলা চলবে না।"

রমেনের জ্ঞান ছিল। ধীরার কথাগুলো কানে গেল তার। রাখাল মুখুজ্জে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। হাসপাতালে নেবার জন্যে এম্বুলেন্স চাই। তা নইলে ট্যাক্সি লাগবে।

ধীরা থামালো তাঁকে—

"অত দাপাদাপি করছো কেন? পূর্ণবিকাশ পড়াতে আসবে এখুনি। সে-ই সব ব্যবস্থা করবে।"

পূর্ণবিকাশ এল একটু পরে। এম্বুলেন্স আনালো। রমেন গেল হাসপাতালে।

হাসপাতালে ধরা পড়লো, রমেন বিষ খেয়েছে। পূর্ণবিকাশ শিখিয়ে দিল, পুলিশের জেরায় কি বলতে হবে।

রমেনকে প্রশ্ন ক'রে পুলিশ জানলো, রাতের অন্ধকারে মধু মনে ক'রে মালিশ খেয়ে ফেলেছে সে।

কদিন পরে রমেন বাড়ি ফিরলো। তখনও পুরো সুস্থ হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে দিদির তলব।

মাথা নিচু ক'রে রমেন গিয়ে দাঁড়ালো ধীরার সামনে।

"চিঠিতে কি লিখেছিলি ?"

রমেন নিরুত্তর রইলো।

"চিঠিখানা তুলে রেখেছি। বাড়াবাড়ি দেখলেই থানায় পাঠিয়ে দোবো। আত্মহত্যার চেষ্টায় কম ক'রে পাঁচ বছরের কয়েদ হয়, জানিস ?"

রমেন জবাব দিল না।

"ছিঃ। ঘেন্নার জীবন। চিঠিতে ভালমানুষি ক'রে দু দুবার আমার কথা! মতলব ছিল আমাকে ফাঁসানো! দূর হয়ে যা সামনে থেকে।"

রমেন চ'লে গেল।

উনিশ

বাপ-ছেলের মামলা রসালো কাহিনী হিসেবে খবরের কাগজে বেরুলো। ধীরা পড়লো, টেলিফোনে ডেকে পাঠালো হরেন্দ্রলালকে, মামলার খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞেস করলো।

তার দুশ্চিন্তাও ছিল। নিজের নামটা আদালত পর্যন্ত গড়ানো ভাল নয়। তাই, হরেন্দ্রলালকে বললো—

"দেখবেন, আমাকে যেন কোর্টে যেতে না-হয়। আপনার বাবা ভয়ানক লোক। একমাত্র ছেলের বিরুদ্ধে যিনি নালিশ-ফরিয়াদ করতে পারেন, আমাকে তিনি ছাড়বেন কিনা সন্দেহ। বাল্য-বন্ধুর মেয়ে নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা থাকবার কথা নয়।"

হরেন্দ্রলাল আশ্বস্ত করলো ধীরাকে—

"বাবার মতিগতি জানি না। একেবারে পালটিয়ে গিয়েছেন। তবে, আমি থাকতে বাবা আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না।"

ধীরা ঢালাও ধন্যবাদ দিল হরেন্দ্রলালকে। কিন্তু, রাত কাটতে সকালে সে রায়বাহাদুরকে ফোনে ডাকলো।

রিসিভার হাতে নিয়েই রায়বাহাদুর গর্জন ক'রে উঠলেন—

"বিশ্বাসঘাতিনি। তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ানো উচিত।"

একটুও রাগ দেখালো না ধীরা। মোলায়েম গলায় বললো,

"শুধু শুধু আমার দোষ দেখছেন আপনি। গুণধর ছেলে এসে আমায় জ্বালাতন করে। তাড়িয়ে দিতে পারি না ভদ্রতার খাতিরে।"

"ঝেঁটিয়ে বিদেয় করিসনি কেন? সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকে কি অমনি?"

"অমনি কেন হবে। আমি দেখা করি না। নীরেন খবর দেয়, আমি বাড়ি নেই। নড়ে না তবু। শেষে বেরুতে হয় সামনে।

কিন্তু, তাতেই কি নিস্তার আছে। যা-তা কথা মুখে আনবে। আমি চুপ ক'রে থাকলেও ছাড়বে না।"

"কি? কি কথা শোনায়?"

"সে সব উচ্চারণ করতে বাধে।"

"বুঝেছি। দরকার হলে সাক্ষী দিতে পারবে?"

—রায়বাহাদুর প্রশ্নটা করলেন ঠাণ্ডা আওয়াজে।

ধীরা যেন ভয়ানক রকম অবাক হয়ে গেল। পাল্টা জিজ্ঞেস করলো সেই সঙ্গে—

"য়্যাঁ? সে কি? সাক্ষী? কিসের সাক্ষী?"

"কেন? ওর নামে মামলা করেছি, শোনোনি? জেলে দোবো। রাস্তার ভিখিরী ক'রে ছাড়বো।"

"মামলার খবর জানি না তো! ভালই করেছেন। ঐরকম খল, দুশ্চরিত্র, ঠগবাজ ছেলেকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত। তবু, আমাকে সাক্ষী মানবেন না। কোর্টে ঢুকলে আমার ভীরমি আসবে।"

রায়বাহাদুর কিন্তু রেহাই দিতে রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত বললেন, ব্যারিষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দরকার বুঝলে তিনি ধীরার নামে সমন পাঠাবেন।

* * *

ডাক্তারির শেষ পরীক্ষায় পূর্ণবিকাশ যাচ্ছেতাই রকম ফেল করলো। বাড়িতে তার সৎমা। তিনি চব্বিশ ঘণ্টা কথা শোনাতে লাগলেন। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যেও শুরু হল কানাকানি, বলাবলি—পূর্ণবিকাশ নাকি কুসঙ্গে মিশেছে, অধঃপাতে গিয়েছে

কার কাছে আর সান্ত্বনা মিলবে? পূর্ণবিকাশ গেল ধীরাদের বাড়ি।

ধীরা কাঠখোট্টা, বাঁধা-ধরা আপ্যায়ন করলো—

"কি ব্যাপার ?"

পূর্ণবিকাশ ফেলের খবর জানালো তাকে।

ধীরা মন্তব্য করলো—

"পড়াশুনোর ধার ধারেন না। পাশ করবেন কি ক'রে। আপনার গুরুগিরিতে নীরেন-মিনু একেবারে গবেট হয়ে যাচ্ছে।"

পূর্ণবিকাশ আহত হল খুব। তবু আত্মপক্ষ সমর্থন করলো,

"খারাপ ছাত্র ছিলাম না কখনও। এবার কটা মাস খেটে পড়লে নিশ্চয়ই পাশ করবো।"

"পাশ-টাশের আশা ছেড়ে দিয়ে কোনও ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারের চাকরি নিন। ফেল ক'রে অভিজ্ঞতা তো হয়েছে।"

"বিদ্রূপ করছেন ?"

"ঠাট্টা-বিদ্রূপ নয়। খাঁটি কথা। আপনার বারটা বেজে গিয়েছে। আর কিছু হবে না।"

"দেখবেন, আসছে বছর ঠিক পাশ করবো।"

"হ্যাঁ। আপনার মুরোদ দেখছি তো এতদিন।"

চ'টে উঠে পূর্ণবিকাশ রূঢ় জবাব দিল—

"আপনার জন্যে কম সময় নষ্ট করিনি। সেটা বুঝি ভুলে যাচ্ছেন ?"

"না, না। ভুলবো কি ক'রে ? আমার বাবার নামে ওষুধ আনিয়েছেন, সেই ওষুধ খাইয়ে দেবনারায়ণের বাবাকে খুন করেছেন। ভাগ্যিস প্রেসক্রিপ্‌সানটা রেখে দিয়েছিলাম। আশা করি, আমার কাছে আর কাঁদুনি গাইতে আসবেন না। এলে ভাল হবে না।"

পূর্ণবিকাশ ঘাড় নুইয়ে বেরিয়ে গেল।

* * *

বীরেনকুমার ধীরাকে ভয় করে খুব। দেখাদৃষ্টে তার সঙ্গে অনুরাগ-বিরাগের ধার ধারে না। হপ্তায় দু-তিন দিন তার কাছে আসা, দূত হিসেবে এখানে ওখানে যাওয়া, তার বরাত মত এটা ওটা

কিনে এনে দেওয়া। এসব বীরেনকুমারের বাঁধা কাজ। মাসের হোটেল খরচাটা পুরো পায়, গাড়ি-ভাড়ার পয়সা থেকেও কিছু বাঁচায়।

ধীরার পরিবর্তন তার নজরে আসেনি। নিয়মমত উপস্থিত হয়ে কদিন অমনি অমনি ফিরে যাচ্ছে। ধীরা কোথাও পাঠাচ্ছে না তাকে, কেনাকাটার নাম করছে না। রাহা-খরচ বন্ধ ব'লে চা-বিড়ির পয়সা জুটছে না।

বীরেনকুমার নিজে থেকেই একদিন প্রসঙ্গ ওঠালো—

"আজকাল আর কোথাও যেতে হচ্ছে না।"

"না।"

ধীরার জবাবে নিরুৎসাহ হয়ে সে আবার ভনিতা জুড়লো—

"কেনাকাটার দরকার করছে না।"

পা নাচাতে নাচাতে ধীরা অন্যমনস্কের মত আওড়ালো—

"কোথায় বা পাঠাবো, কি বা আনাবো।"

নিতান্ত দ'মে গিয়ে বীরেনকুমার শুধোলো,

"শরীরটা খারাপ নাকি?"

"খারাপ হবে কেন? কখনও কি আমাকে রোগে বিছানা নিতে দেখেছেন?"

বীরেনকুমার চুপ ক'রে থাকে। ধীরা অসুস্থ হলেও সে মনকে সান্ত্বনা দেবার অজুহাত পেতো।

ধীরা যেন স্বগতোক্তি করে—

"যত-ঝামেলা জুটেছে। ভাল লাগে না এত হুজ্জৎ।"

বীরেনকুমার সায় দেয়—

"নিশ্চয়।"

"ইচ্ছে করে, সব ছেড়েছুড়ে আলাদা থাকি গিয়ে কোথাও। ঘ্যান-ঘ্যানানি, প্যান-প্যানানিতে বিরক্তি ধ'রে যাচ্ছে।"

"বেশ তো। তারই ব্যবস্থা কর।"

"ব্যবস্থা আর কি। ভাবছি সন্ন্যাস নেবো।"

"সন্ন্যিসী হবে! কি বিপদ! গেরুয়া প'রে, মাথায় জটা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে?"

"ওরকম নয়। আধুনিক সন্ন্যাস। ঘুরতে হবে না। তবে, গেরুয়াটা লাগবে।"

"একা থাকবে?"

"একেবারে একা নয়। চেনাশোনা এক-আধজন হলেই চলবে।"

"সন্ন্যিসী না-হয়ে ছাড়বে না, তাহলে?"

"সন্ন্যিসী নয়, সন্ন্যাসিনী। তবে ঠিক করিনি এখনও।"

"দেখছি আমার কপালে আবার অসুবিধে।"

'যদি আপনাকে সঙ্গে নি-ই?"

"মানে, আমিও সন্ন্যিসী হব? মাটি করেছে!"

"মাটির কি আছে? আপনি পড়ছেন হোটেল-খরচার দুশ্চিন্তায়। আমার তো অন্তত একটা বিশ্বাসী লোক চাই।"

"এখুনই রাজি। নাচের ইস্কুলে ছাত্রী নেই, নাচের ডাক নেই। ভাড়া বাকী পড়েছে বছরখানেকের। ওটা তুলে দিতে পারলেই বাঁচি।"

"জানি সব" ব'লে ধীরা যেন কি চিন্তা করতে লাগলো।

উৎসাহিত বীরেনকুমার শুরু করলো—

"গোছগাছের জন্যে ঘণ্টা দুত্তিনই যথেষ্ট। ডাইং-ক্লিনিঙের জামা-পায়জামা আনতে আনা আষ্টেক। হোটেলের হিসেব চোকাতে হবে। এই যা।"

ধীরা সাড়া দিল না দেখে সে থামলো।

রায়বাহাদুর ছেলের সঙ্গে মামলা বাধিয়েছেন। দেবনারায়ণ সব খুইয়েছে। পূর্ণবিকাশ নিরুদ্দেশ। রমেনটা ছ্যাঁচড়ামি করলো।

রায়বাহাদুরকে দেখলে গায়ে জ্বর আসে, হরেন্দ্রলাল বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছে। ধীরার আর কিছু ভাল লাগছিল না। সবই বেয়াড়া, সবেতেই একঘেয়েমি। দেবনারায়ণ একদম পাঁঠা। ওকে চড়-কিল বসাবার জোরদার ইচ্ছেটা ধীরা বরাবর দমন ক'রে এসেছে। পূর্ণবিকাশের মাথায় ছিট। প্রথম পরিচয়ের পর মাসখানেক যেতে না-যেতেই তার আসল অস্তিত্ব চুপসে যায় পচা ফলের মত। বাবা-মা-নীরেন-মিনু ষোল আনা বশংবদ। কিন্তু, দিনকে দিন একই ধরণের কথা তাদের। তারাও সাতবাসী হয়ে উঠেছে।

এর ওপর কোথায় কি হাঙ্গামা বাধে, ঠিক নেই। রায়বাহাদুর, হরেন্দ্রলাল, দেবনারায়ণ, পূর্ণবিকাশ, রমেন—কে কখন কি ক'রে বসবে, কে জানে। এদের আওতা থেকে সরে যেতে পারলেই স্বস্তি। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে না-গেলে এরা রেহাই দেবে না।

ধীরা শুধু ভাবে, অনবরত মাথা খেলায়। আস্তে আস্তে নিজের নতুন জীবনও ছ'কে ফেলে। তারপর বাবা-মাকে একসঙ্গে জানায় মনোগত বাসনা।

রাখাল মুখুজ্জে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। তাঁর স্ত্রী চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

ধীরা কিন্তু সঙ্কল্পে অটল রইলো। সে সন্ন্যাসিনী হবে। বাড়িখানা দিয়ে যাবে বাবাকে। দু-খানা ঘরে ভাড়া বসিয়ে তিনি যা পাবেন, তাতে সংসার খরচ বেশ চ'লে যাবে। ধীরা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবে শহরের পুব-সীমানায়। তার জন্যে বাড়ি লিজ নেবে। বেশির ভাগ আসবাব, সমস্ত রূপোর বাসন-কোশন, ডিনার-সেট—সব যাবে সেখানে।

রাখাল মুখুজ্জে বললেন,

"আমাকে তাহলে রোজ অতখানি ছুটতে হবে?"

ধীরা বোঝালো—বাবা-মা-ভাইবোনের সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর দেখা-দৃষ্টে সম্পর্ক রাখা চলবে না। চিঠির মারফৎ খবরাখবরই যথেষ্ট।

রাখালবাবু কেঁদে ফেললেন এ কথা শুনে। ধীরার মন ভিজলো না। মা-নীরেন-মিনুর কান্না-মেশানো অনুনয় সে কানে তুললো না।

বাড়ি ছাড়ার দিন সকালে ধীরা রায়বাহাদুরকে জানিয়ে দিল—সংসারে তার ঘেন্না ধ'রে গিয়েছে। সে সন্ন্যাস নিচ্ছে।

রায়বাহাদুর করুণ ভাবে অনুরোধ করলেন,

"আমি আজ দুপুরে যাচ্ছি। আমার কথা শুনতেই হবে তোমাকে।"

কর্কশ জবাব দিল ধীরা—

"দেখা পাবেন না। হাজির হলে ছেলের মুখোমুখি পড়তে পারেন।"

হরেন্দ্রলালও খবর পেল টেলিফোনে। সে দুঃখু করলো অনেক। দেখা করতে চাইলো। ধীরা আমল দিল না একদম।

* * *

বাড়ি ঠিক হল। মালপত্র গোছালো বীরেনকুমার। সব জিনিস লরিতে চাপিয়ে সে সঙ্গে গেল। শেষে ধীরাকে ট্যাক্সিতে নিয়ে পঁওছালো নতুন আস্তানায়।

গাড়িতে ব'সে ধীরা জানালো, আশ্রমে বীরেনকুমারকে তার ভক্ত হিসেবে থাকতে হবে। না-পারলে গোড়াতেই ছাড়াছাড়ি হওয়া ভাল। বীরেনকুমার ঘাড় দুলিয়ে, হাত নেড়ে রাজি হল। ধীরা বললো,

"তাহলে, এখন থেকে 'তুমি'। আপনি-টাপনি মানাবে না। নামটাও ছোট হওয়া দরকার।"

জোড়া পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

এক

বাবা জগদীশনাথের ডেরায় দুপুরের আসর। বেলা গড়িয়েছে বিকেলের দিকে। বাবা বিশ্রামরত। ঘর জুড়ে কার্পেট পাতা। তার ওপর তিনি গদিয়ান। মাথার নিচে মোটা তাকিয়া। পায়ের নিচেও তাই। গদি, তাকিয়া গেরুয়া সিল্কের ওয়াড়ে মোড়া। মাথার এক ধারে রূপোর পিকদানি, আর একধারে মস্ত বড় ডিবে।

জন-দশেক শিষ্যা বাবা জগদীশনাথের মাথা-হাত-পা টিপছে। এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে রয়েছে আরও কয়েকজন। পুরুষ-শিষ্যেরা দলে হাল্কা। তাদের জায়গা কার্পেটের এককোণে—দরজার দিকে।

বাবাকে ঘিরে একটানা কথা চলছে। দূরের লোকেরা নির্বাক। ঝুঁকে ব'সে কান খাড়া ক'রে তারা শুধু শুনে যাচ্ছে।

বাবা মুদিত-নয়ন। মাঝে মাঝে তাঁর পান-লাবণ্যরঞ্জিত ঠোঁটের দু-কোণে ফুটে উঠছে মৃদু হাসির রেখা। গোটা ঘরের সাত্ত্বিক আবহাওয়া জমাট বাঁধছে সঙ্গে সঙ্গে। থেমে যাচ্ছে সব আলোচনা। জোড়া জোড়া চোখের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে বাবার মুখে। কাছের শিষ্যারা ডলাই-মলাই বন্ধ করছে, বাকীরা মাথাটা এগিয়ে দিচ্ছে সামনে। দু-একজন অমনি চারদিক দেখে নিচ্ছে—কপাল-জোরে সুযোগ পেলে তারা বাবার কাছে নিবেদন জানাবে।

বাবার হাসি কিন্তু মিলিয়ে যায় বারবার। তিনি বলেন না কিছু। আবার পুরোদমে তাঁর মাথা-হাত নিয়ে কসরৎ আরম্ভ হয়, ঘরে কল-গুঞ্জন পাক খেতে থাকে। কেউ ঘাড় সোজা করে, কেউ গা চুলকোয়।

চাপা গলার আলাপে শুধু বাবার প্রসঙ্গ—তিনি শিবের অবতার—একদম ষোল আনা। তাঁর মহিমায় অঘটন ঘটতে পারে, সব কিছু হতে পারে।

কার্পেটের ধার বরাবর একজন শুধোয় আর একজনকে, "বাবার

কৃপা পাব তো?" উদ্বেগে আর নৈরাশ্যে তাদের চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। সামনে থেকে তাদের কানে আসে, "বাবা করুণানিধান, বাবা আশুতোষ।" তারা প্রবোধ মানে।

পেছনের দেওয়ালে বাবা জগদীশনাথের মস্ত বড় তেলরঙা ছবি টাঙানো। তিনি তাতে রজতকান্তি খাঁটি খাঁটি মহাদেব। পাহাড়ের ওপর ব'সে। জটায় সাপ জড়ানো। মাথার চারদিকে আলোর ছটা। দূর থেকে নেমে আসা জলের ধারা জটায় মিশে গেছে। পায়ের কাছে নধরকান্তি ষাঁড়। দুপাশে ভূতুড়ে চেহারার দুজন জোড়হাতে দাঁড়িয়ে।

ছবির নীচে কার্পেটের ওপর পাতা রয়েছে মুণ্ডু-থাবা-নখ সমেত মস্ত বড় বাঘছাল। তার ওপর ত্রিশূল, ডমরু আর করবী ফুলের মালা অনেকগুলো।

বাবা জগদীশনাথের বয়েস পঞ্চাশের কম হবে না। তেলচকচকে একমাথা কালো চুল। গায়ের চামড়া আবলুশের মত, বেশ জেল্লা আছে, কোথাও কোঁচকায়নি। দেহটি আগাগোড়া নিটোল। হাত-পা বেশ লম্বা, পায়ের চেটো রীতিমত চওড়া, আঙুলগুলো মোটা মোটা, থ্যাবড়া থ্যাবড়া। চওড়া কাঁধের সঙ্গে ছোট মাথাটা বেমানান। বিশাল ভুঁড়ি। চেহারা রীতিমত লম্বা—হাত চারেকের মত। মুখ ক্ষৌর-মসৃণ।

বাবার গলায় সোনার হারে গাঁথা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। তাতে ঝুলছে মস্ত বড় একখানা হীরের লকেট। দু-হাতে তাগার মত সোনার সাপ। মাথায় তাদের পান্না বসানো, চোখে চুণি।

বাবা জগদীশনাথের পরণে সাদা গরদের ধুতি—লুঙ্গির মত ক'রে জড়ানো। কোমরের কাপড় আলগা হয়ে আছে। লোমশ দেহে আর কোনও আবরণ নেই।

বাবার ডান হাঁটু কোলে নিয়ে হাত বোলাচ্ছিল প্রায়-প্রৌঢ়া এক সধবা। বেঁটে-খাটো, মোটা-সোটা। শাড়ি-সেমিজে, অলঙ্কার-

প্রাচুর্যে অতীত-বর্তমানের সমাবেশ। খুব আস্তে আদুরে সুরে সে বললো,

"বাবা, আজ এখানে আসবার সময় সে কি কাণ্ড!"

কাণ্ডটা শোনবার জন্যে যে যার মুখ বন্ধ ক'রে চাইলো মহিলাটির দিকে। বাবা একটা লম্বা ঢেঁকুর তুললেন। মুখ ঘুরিয়ে সে দুপাশে সগর্বে নজর বোলালো। তারপর শুরু করলো কাহিনী।

"জানেন বাবা, আমাদের গলি থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো একটা লোক। কিম্ভূতকিমাকার চেহারা। পরণে ময়লা, ছেঁড়া কাপড়, এক মাথা চুল, এক মুখ দাড়ি, এক হাতে ভাঙা টিন একটা, আর এক হাতে আধখানা মালসা। ড্রাইভার যত হর্ণ বাজায়, যত হ্যাট হ্যাট করে, সে ততই হাত নাড়ে, মাথা নাড়ে, আর কি যেন আওড়ায়। কিছুতেই নড়বে না সে। মনে হল পাগল। ভর দুপুর। রাস্তা খালি। ড্রাইভার তো তেড়ে নামছিল গাড়ি থেকে। আমি মানা করতে সে বসে রইলো। আমিও তাই। লোকটা কিন্তু থামলো না। নিজের মনে বকতে লাগলো। কি করবো ভাবছি। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠলো। সে কি লাফ!"

শিষ্যা থামলো একটু। বাবা নির্বিকার। বাকী সবাই উৎকর্ণ। সে আবার আরম্ভ করলো—

"হ্যাঁ। কি ভীষণ লাফ! আমি তো ভয়ে কাঠ। ড্রাইভার দেখি হাঁ ক'রে রয়েছে। এপাশে ওপাশে একটা ফেরিওয়ালাও নজরে পড়লো না। তখন কি আর করি। চোখ বুজে আপনার নাম জপতে লাগলুম। তারপর যা হলো! ভাবতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! শুনছেন বাবা!"

বাবা সামান্য চিবুক নাড়লেন। বৃত্তান্ত গড়িয়ে চললো—

"কি আশ্চর্য ব্যাপার! আমি চোখ বুজে আছি, আপনার নাম করছি। গাড়ির আওয়াজে চমকে উঠলুম। বুকটাও ঢিপঢিপ

করতে লাগলো। ওমা! চেয়ে দেখি, ড্রাইভার ষ্টার্ট দিচ্ছে গাড়িতে। কেউ কোথাও নেই!"

বাবা জগদীশনাথ আড়-চোখে চাইছিলেন। বিবরণী শেষ হ'তে পিকদানিটার দিকে দেখালেন। তিনখানা হাত-এ চ'ড়ে পিকদানি এল তাঁর মুখের কাছে। ঘাড় উঁচু ক'রে বাবা তার মধ্যে কালো পিক ফেললেন অনেকখানি। এবার তাঁর ঠোঁট ঘিরে তাচ্ছিল্যের মৃদু হাসি।

"লোকটা অমন ক'রে উবে গেল কেন বাবা?"

—প্রায়-প্রৌঢ়া সধবাটির প্রশ্নে অকুণ্ঠ ব্যাকুলতার ছোঁয়াচ ফুটে উঠলো।

বাবা জগদীশনাথ মুখ খুললেন এবার—

"গভীর রাতে, মানে, সূক্ষ্ম দেহে কৈলাসে গেছিলাম কাল। বুঝলে, কাঞ্চন। মানে, নন্দীর তো পাত্তা মেলা ভার। যখনই যাই, দেখি, বাবু নেই। ভৃঙ্গী থাকে, গাছ-টাছগুলো দেখে, ষাঁড়টার ওপর নজর রাখে। তাকেও পেলাম না। তখনই মনে হলো, মানে...."

কাঞ্চন এতক্ষণে বাবার ডান হাঁটু প্রায় ষোল আনা দখলে এনেছিল। তার সামনাসামনি বিধবা গৌরীবালা আর এক হাঁটু কোলে নিয়ে যেন মুকিয়েই ছিল। বাবা থামতে না-থামতে সে জুড়ে দিল—

"তারপর? তারপর বাবা?"

এবার বাবা জগদীশনাথ মুখ ঘোরালেন তার দিকে। হাসলেনও একটু "হে-হে" ক'রে। সে এগুলো খানিকটা। বাবা বললেন,

"তারপর আর কি। মানে, অনেকদিন কৈলাস-মুখো হইনি। ভৃঙ্গী বেচারা আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

গৌরীবালা আরও ঘনিষ্ঠ হয়।

বাবা কিন্তু মাথাটা কাত ক'রে আবার কাঞ্চনের দিকে চান।

কাঞ্চন বোধ হয় একটু ঢিলে হয়ে গেছিলো। হঠাৎ সে হাঁটু ঠাসতে থাকে বেশ জোরে।

একটু থেমে বুজে-আসা চোখের পাতা টান করতে করতে বাবা জগদীশনাথ সার তত্ত্ব শোনালেন এবার—

"তুমি বড় ভাগ্যবতী, কাঞ্চন। মানে, মানুষের বেশে পাগল সেজে ভৃঙ্গী তোমার সামনে এসেছিল। তোমাকে ও চিনে বার করেছে ঠিক।"

বিগলিত কাঞ্চনের দু-হাত চলতে থাকে পুরো দমে। ফোঁস ফোঁস ক'রে নিঃশ্বাস পড়ে তার। গৌরীবালার মুখ হয়ে যায় বাংলা ৫-এর মত।

কাছের শিষ্যারা যে যার মন্তব্য করে,

"দেখলে তো! ভক্তির জোর কত! বাবার চরণ-সেবার মত পুণ্যি আছে! সবই বাবার খেলা!"

দূরে সমাসীন সবাই মাথা নাড়ে, ঠোঁট নাড়ে।

* * *

বেলা শেষ হয়ে আসছিল। বাবা জগদীশনাথকে নিয়ে মেহনতও চলছিল অবিরাম। তিনি থেকে থেকে পাশ ফিরছিলেন, উপুড় হচ্ছিলেন।

কার্পেটের কিনারায় এক বৃদ্ধ নড়াচড়া করছিলেন অনেকক্ষণ ধ'রে। একবার ডান হাঁটু তুলে, একবার বাঁ উরুতে কনুইয়ের ভর দিয়ে, ঘন ঘন গা চুলকিয়ে, মাঝে মাঝে মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে, বাঁধানো দাঁতে জিভ বোলাতে বোলাতে তিনি কয়েকবার মুখও বাড়ালেন সামনের দিকে। কিছু বলতে চান। নিবেদন না-করলেই নয়। সর্বাঙ্গে তাঁর অস্বস্তির লক্ষণ। কিন্তু, সুযোগ মেলে কি না-মেলে। বাবার চারপাশে অনর্গল গজল্লা চলছে। একজন থামে তো দুজন শুরু করে। ভদ্রলোক আস্তে আস্তে এগিয়ে বসলেন। তাঁর সান্নিতে মৃদু বিরক্তি, অস্পষ্ট ভর্ৎসনার ভনভনানি

শুরু হল। মুখফোঁড় কে যেন জনান্তিকে ফোড়ন কাটলো, "আক্কেলের মাথা খেয়েছে একেবারে।"

কোনও দিকে বৃদ্ধের খেয়াল ছিল না। ঠাট্টা-বিদ্রূপ-নিন্দে কানে না-তুলে শিষ্যা-চক্রের ফাঁক দিয়ে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন বাবার পেটটা।

বৃদ্ধ মেরুদণ্ড সিধে করলেন, মাথা উঁচিয়ে চিবুক তুললেন। তাতেও বাবার মুখ নজরে এল না। হাঁটু গাড়তে বাবার নাক পর্যন্ত দৃষ্টি এগুলো। আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না ভদ্রলোক। দুই জানুতে হাত রেখে আরম্ভ করলেন—

"বাবা! প্রভু! দেবাদিদেব, ভোলানাথ, শম্ভু, মহাকাল, মহেশ্বর........"

কিন্তু, স্তুতি আর এগুলো না। তাতে ছেদ পড়লো আচমকা। কাঞ্চন খেঁকিয়ে উঠলো—

"আচ্ছা লোক দেখছি! একদম গেঁয়ো! নিয়ম জানে না এখানকার!"

লজ্জায় কুঁচকিয়ে বৃদ্ধ মাথা নিচু করলেন। আবেগ রুদ্ধ হল। অপরাধীর মত আমতা আমতা ক'রে কি যেন কৈফিয়ৎ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। তাতেও কাঞ্চনের কড়া ধমক—

"থামুনতো।"

বৃদ্ধ থেমে গেলেন একদম। অন্য গলায় "সরে যান ওপাশে" শুনে ভয়ে ভয়ে আবার মাথা তুলতে গৌরীবালার দরজামুখী তর্জনী চোখে পড়লো। হামাগুড়ি দিয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোক চলে গেলেন সবার পেছনে।

দুই

যমুনা-ধামে প্রভু কিশোর ঠাকুরের অধিষ্ঠান। বাড়িটা বড়। বেশি পুরোনো নয়। সদরে দু-কিস্তি কড়া লাগানো। নিচে, ওপরে সমস্ত জানলায় মজবুত জাল দেওয়া। তার পেছনে ঘষা কাঁচের শার্শি। খড়খড়ি নেই। ভেতরে বাইরে তাজা চূণকামের চিহ্ন। দরজা-জানলা-রেলিঙে সবুজ রঙ।

যমুনা-ধামের নিয়মিত সান্ধ্য-সমাগমে হরেক রকমের লোক আসে। বাইরের রাস্তায় তখন গাড়ির সার, সদরে মানুষের চাপ। ঢোকবার সময় সবাই ব্যস্ত-সন্ত্রস্ত। ফিরতি মুখের যাত্রীরা এগোয় ধীর পায়ে কথা বলতে বলতে।

আনকোরা নতুন আগন্তুকেরা ভেতরে ঢুকে দাঁড়ায় একটু, চেয়ে দেখে চারপাশে। তারপর একে একে এগিয়ে যায়, জমা হয় গিয়ে উঠোনের এক কোণে। সেখানে একজন সবার নাম-ঠিকানা-পেশা লিখে নেয়, কাউকে পাশের লাইনে দাঁড়াতে বলে, সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে কাউকে অনুরোধ জানায়, "ঐ ঘরে বসুন।"

পুরোনো দর্শনার্থীরা নাম লেখায় না। তাদেরও দুচারজন লাইন ধরে, বাকিরা ঘরে গিয়ে ঢোকে।

লাইনটা অজগরের মত এঁকে বেঁকে চ'লে যায় সিঁড়ি পেরিয়ে। এগুনোর টানে লম্বা হয় পেছনের দিকে। ভাল ভাবে নজর না-করলে বোঝা যায় না, সচল কিনা।

ঘর-আশ্রয়ীদের আলাদা ব্যবস্থা। দেওয়ালে ঝোলানো তাড়া থেকে টুকরো কাগজ নিয়ে যে যার নাম লেখে। অনভিজ্ঞ, আগন্তুকও দুচারজনকে লক্ষ্য ক'রে পদ্ধতিটা বুঝে নেয়।

ওপর থেকে ঘন ঘন দূত আসে। সবাই চঞ্চল হয় তাকে দেখে। প্রত্যেক বার সে একজনের নাম ধ'রে ডাকে। আহ্বানটা ওপরে যাবার। না-বুঝলেও বোঝবার অসুবিধে নেই। নাম

ডাকার পর সে বলে "আর কার স্লিপ আছে, দিন।" দু-চার জন চিরকুট তুলে দেয় তার হাতে। সে চলে যায়। যার ডাক পড়ে, লোকটির পেছন পেছন সে এগোয়।

এই রকম জমাটি পরিবেশের একটা দিন।

একতলার ঘরে চেয়ারগুলো অনেকটা খালি হয়ে এসেছে। চিরকুটের তাড়া প্রায় খতম—খানকয়েক কাগজ রয়েছে তাতে। উঠোনের লাইন ধীরে ধীরে গুটিয়ে যাচ্ছে। অপেক্ষমান ঘরওয়ালারা চঞ্চল। দাঁড়িয়ে-থাকা লাইনওয়ালারা উৎকণ্ঠিত। কিন্তু, বিরক্তির চিহ্ন নেই কারুর মুখে।

দোতলার বারাণ্ডা ডিঙিয়ে সবাই যাচ্ছে তিনতলায়। সেখানে সিঁড়ির মাথায় একজন বসে আছে একটা মস্ত বড় কাঠের সিন্দুক আগলিয়ে। তার ডালাটা আল্গা। সিন্দুকের ভেতর জমা হচ্ছে যত ভক্তি-উপহার। সন্দেশের বাক্স, মেওয়ার ঠোঙা, মধুর শিশি, আঙুর, আপেল, আনারস—হরেক রকমের জিনিষ থরে থরে সাজানো। মাঝখানে রূপোর থালায় রয়েছে নগদ টাকা, একটা রূপোর বাঁশী, আর রূপোর পদ্ম। উপহার-গ্রহীতা ডালা খুলছে, বন্ধ করছে অনবরত। দু-একজন ভেতরে উঁকি দিচ্ছে তারই ফাঁকে, অনুশাসনও শুনছে—"কি দেখছেন অত ?"

ওপরে মোটে একখানি ঘর। কিন্তু, মস্ত বড়। পুরোনো লোক দু-একজন বলছে, "এইটে ঠাকুরের কুঞ্জ।" শুনে নতুনেরা চোখ টান করছে।

কুঞ্জগৃহ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। তার মাঝখানে ফুলশয্যা। চন্দন-চর্চিত-গৌর-কলেবর-পীত-বসন ঠাকুর তাতে অর্ধশায়িত। মাথায় ফুলের মুকুট, গলা থেকে নেমেছে ফুলের মালা, হাতে ফুল-সজ্জা। বয়েস বছর তিরিশেক। মুখে দাড়ি-গোঁফের ক্ষীণ আভাসও নেই। চেহারাটা ছোট-খাট। মাথায় চুল বাঁধা কৃষ্ণচূড়ার ঢঙে। ছাতের ঘুলঘুলি দিয়ে ফোকাস করা লাল-নীল-সবুজ-হলদে আলোর খেলা

চলছে তাঁর সর্বাঙ্গে। বাকী ঘর অন্ধকার। জানলাগুলো বন্ধ। চারদিকে মোলায়েম সুগন্ধ। বড় বড় আয়না টানানো সব কটা দেওয়ালে। পেছনের আয়নায় ফোকাস পড়লে বিদ্যুৎ-চমকের রোশনী ফুটে উঠছে।

দরজার বাইরে, ঠিক চৌকাঠের পাশে এক পার্ষদ। দূরে আর একজন আছে ঘণ্টা নিয়ে। ভক্ত দরজার কাছাকাছি এলে ঘণ্টা বাজাচ্ছে সে। আর একটু এগুলে দ্বারপাল বাধা দিচ্ছে, "ভেতরে ঢুকবেন না।"

দর্শন ও করজোড়ে নমস্কারের পালা চলছে বাইরে থেকে। দাঁড়াবার উপায় নেই কারুর। রিষ্টওয়াচ দেখে ঘণ্টাবাদক আওয়াজ করছে। বড় জোর আধমিনিটের অবকাশ। তার মধ্যেই দ্বাররক্ষী চলে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। ভক্তির প্রাবল্যে কেউ অচল হলে সে কড়া হুকুম জারি করছে খাটো গলায়—

"ভীড় চলবে না। সরে যান।"

দ্বারপালের পাশে টুলের ওপর বিরাট থালায় ফুলের পাহাড়। ফুল নিয়ে মাথায় ঠেকাতে ঠেকাতে পরিতৃপ্ত দর্শনার্থীরা নীচে নেমে যাচ্ছে।

এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে যায়। প্রভু কিশোর ঠাকুর ক্রমে চনমন করতে থাকেন। বাইরে ইলেকট্রিক কলিং-বেল বেজে ওঠে।

জনকয়েক ভক্ত ছিল সিঁড়ির মাথায়। একজন দরজা গোড়ায়। তাদের উদ্দেশ্যে "আজ আর দর্শন হবে না" বলতে বলতে দ্বারপাল উঠে দাঁড়ালো। ঘণ্টা-বাজিয়ে তাদের পাশ কাটিয়ে, ধাক্কা দিয়ে তরতর করে নেমে গেল দোতলায়। সেখানে দূতকে দেখে দূর থেকেই সে হাত নেড়ে কি ইসারা করলো। তারপর চলে এল উপহার-গ্রহীতার কাছে, দূত দৌড়োলো একতলায়।

ডাকা, স্লিপ নেওয়া, নাম-ঠিকানা লেখা—সবই খতম হল।

ঘণ্টাবাদক এসে ঢুকলো কুঞ্জ-গৃহে। প্রভু কিশোর ঠাকুর হাত-পা টান ক'রে দিয়েছেন ফুলশয্যায়। ঘণ্টাবাদককে বললেন,

"এবার ভাবস্থ হব, হরু। তোমরা একটু জিরিয়ে নাও।"

হরু বেরিয়ে যায় দরজা টেনে দিয়ে। দ্বারপাল বসে আবার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে খুট ক'রে সুইচের আওয়াজ—ঘরে জ্ব'লে ওঠে আলো। ঘুলঘুলির ফোকাস আগেই বন্ধ হয়েছিল। ঠাকুর উঠে ব'সে আয়নায় একদৃষ্টে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে লাগলেন।

ঘরের পেছন দিকটায় দেওয়াল ঘেঁষে পাতা রয়েছে মস্ত বড় খাট। চোখ রগড়াতে রগড়াতে তার ওপর থেকে নামলো ছুটি মেয়ে। ছুজনেই তরুণী—সুবেশা। একটি মেয়ে দরজায় খিল লাগালো। অপরা সব কটা জানলার সামনে দিয়ে ঘুরে এল। প্রভু কিশোর ঠাকুরের চোখ-জোড়াও এবার স'রে গেল আয়না থেকে।

তন্বী ছুজনা কোণে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রভু ওঠেন। তারা মাথার খোঁপা ঠিক করে, কানের ওপর আঙুল চালায়। প্রভু এবার তাদের পেছনে। মুচকি হাসেন তিনি। আয়নায় সে হাসির জবাব দেয় মেয়ে ছুটি চোখের ভাষায়। তিন জনের দৃষ্টি-বিনিময় চলে।

তরুণী-যুগল ফিরলো প্রভুর দিকে। প্রভু একপায়ে, ছুপায়ে খাটে উঠলেন। তারপর পা ঝুলিয়ে ব'সে বললেন, "ঘণ্টার সুইচটা দাওতো, কুন্তলা।"

আলগা তারে লাগানো কলিং-বেলের সুইচ ছিল ফুলশয্যার পাশে। কুন্তলা তুলে আনতে ঠাকুর টিপলেন তার বোতাম। আগের মত ঘণ্টা বাজলো বাইরে।

দ্বাররক্ষক তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো চেয়ার ছেড়ে। হাই তুলে চোখ ছুটো রগড়ালো একটু। এর মধ্যে উপহার-গ্রহীতাও জায়গা ছেড়েছে। দূত ঘুরঘুর করছিল। দ্বারপাল এগিয়ে গেল তাদের দিকে।

দূত বললো, "চারটি আঙুর নিচ্ছি টুমুদা"।

"রোজই এরকম কর কেন? রমেশ আসার তর সইছে না। সদর দিয়ে সে উঠুক আগে।"

টুনুর তিরস্কারে দূত সিঁড়ির ধারে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালো রেলিং ধ'রে।

সিঁড়িতে চটাপট চটির আওয়াজ হতেই সে সিন্দুকের সামনে হাজির।

টুনু বিরক্তিতে অস্পষ্ট আওয়াজ করে।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে দূত আবেদন জানায়,

"যে ওঠা-নামা। ক্ষিধে লেগেছে বড় জোর।"

হরু শুধু মুচকি হাসে।

সিন্দুকের ডালা খোলাই ছিল। চটপট এসে রমেশ তার ভেতর থেকে টপ ক'রে তুলে নিল একটা রাজভোগ। সেটা মুখে পুরে সে হাতালো এক মুঠো কাজু বাদাম।

টুনুও এতক্ষণে গোটাকত কড়া পাকের সন্দেশ খেয়ে ফেলেছিল।

হরু চিবুচ্ছিল আপেল।

দূত এক থোকা আঙ্গুর শেষ ক'রে প্যাঁড়ার চ্যাঙারিতে হাত দিল।

কলিং-বেলের আওয়াজ হল আবার।

টুলের ওপর কমলালেবু রেখে হরু গেল কুঞ্জগৃহের সামনে। দরজাটা ফাঁক হল আধ-ইঞ্চিটাক।

"দিন এবার। বেশি নয় কিন্তু।"

গলাটা কুন্তলার।

হরু এল সিন্ধুকের সামনে, দূতকে শুধোলো, "প্লেট কই?"

দূত নীচ থেকে এনে দিল দু-খানা বড় প্লেট। টুনু একটাতে সাজালো আপেল, আঙ্গুর, আখরোট, কাজু-বাদাম। আর একটাতে সন্দেশ, রাজভোগ, প্যাঁড়া।

"জল আনলে না?"

হরুর কথায় দূত আবার গেল নিচে। মস্ত বড় থার্মোফ্লাস্ক আর একটা গেলাস হাতে নিয়ে উঠলো পড়ি-কি-মরি অবস্থায়। হরু কুঞ্জগৃহের কবাটে টোকা মারলো গোটাকত।

একটা পাল্লা পেছনে টেনে কুন্তলা বললো "দিন।"

ঘরের ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

হরু প্লেট দুটো, ফ্লাস্ক, গেলাস পঁওছালো একে একে।

কুন্তলা তারপর ছিটকিনি আঁটলো দরজায়।

এইটুকু সময়ের মধ্যেই টুনু-রমেশ-দূতের জলযোগ শেষ হয়েছিল। কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে হরু রমেশকে জিজ্ঞেস করলো—

"কিছু মালকড়ির ব্যবস্থা হল ?"

"হ্যাঁ, একটা ছোকরা বশীকরণের মাদুলি চেয়েছে।"

এবার টুনুর প্রশ্ন—

"কত দিয়েছে, দেখি।"

"কুড়ি টাকা।"

"মোটে ? মারো গুলি।"

হরু-টুনু-দূত—তিনজনেই যেন আকাশ থেকে পড়ে।

"সবটাতেই তোমরা সন্দেহ কর। দর ঠিক হয়েছে চল্লিশ। অর্ধেক আগাম। বাকিটা পরশু।"

ট্যাঁক থেকে চারখানা পাঁচ টাকার নোট বার করলো রমেশ। টুনু অমনি ছোঁ মেরে নিয়ে নোট ক'খানা পুরলো নিজের পকেটে।

যমুনা-ধামের উপরি-পাওনা এই ভাবেই জমা হয়। মাসকাবারে ভাগাভাগির নিয়ম। টুনু পায় পাঁচ-আনা বখরা। হরু আর রমেশের ভাগে পড়ে চার-চার আনা। দূতের হিস্‌সা তিন আনা। প্রতিদিনের হিসেব রাখে সবাই। বাঁটোয়ারার সময় মিলিয়ে নেয়।

টাকা নিয়ে টুনু তাড়া লাগালো—

"সব গুছিয়ে নিয়ে চল। খাওয়া মিটতে সেই বাঁধাধরা সাড়ে বারোটা, নয় একটা।"

তিন

মাঝরাতের কাছাকাছি। মেনকা মার আশ্রমে সাড়া-শব্দ নেই। হাল-ফ্যাসানের বাড়ি। তিন দিকে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা বাগান। পেছনে মস্ত বড় কারখানা একটা। আশ্রমের সামনে বাগানে ঢোকবার ফটক। ফটক থেকে শুরু হয়েছে নুড়ি-ফেলা সরু রাস্তা। তার দু-ধারে কেয়ারি-করা পাতা-বাহারের গাছ। গাছের পর ঘাস-জমি। ঘাস ছাড়িয়ে একেবারে জ্যামিতিক কায়দায় ঝাউগাছ বসানো। ডালিয়ার সমারোহে রুচিবোধের পরিচয়। ডালিয়ার পর দুদিককার দেওয়াল ঘেঁষে বেলফুলের মেলা।

বাইরের ফটক মানুষ প্রমাণ হবে। ঢালাই লোহার থাম দুটো আরও হাত-খানেক ওপরে উঠেছে। নুড়ির রাস্তা ধ'রে এগুলে সদর পড়ে সামনে। চকচকে পালিশ করা কপাট-জোড়ায় নক্সা-কাটা পেতলের কড়া লাগানো। ডানদিকে কড়ার নিচে পেতলের হাতল। তার তলায় চাবির ঘর। দরজার গায়ে কলিং-বেলের সুইচ।

ফটক ভেজানো। থাম দুটোর মাথায় শেডে ঢাকা আলো জ্বলছে। সদরের ওপর আর একটা আলো। মস্ত বড় দুটো কুকুর ঘুরছে বাগানে।

জায়গাটা একেবারে শহরের পূব-সীমানায়। একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ আসে কানে। দূরে শেয়াল ডেকে ওঠে। কান খাড়া ক'রে একটা কুকুর ভারিক্কি ধরণের হাঁক পাড়ে। তার সহচর 'গোঁ, গোঁ' শুরু করে। শেষে দুজনে একসঙ্গে খানিকটা চেঁচিয়ে থেমে যায়।

আশ্রমের ভেতরে একতলাটা জনশূন্য। দোতলাও তাই। বড় ঘরে প্রতিটি জানলায় নক্সাদার সবুজ পর্দা আঁটা। ভেতরে আলো জ্বলছে। কোণে কোণে চকচকে পেতলের টবে অর্কিড, মোরাদাবাদী ধূপদানিতে গোছা গোছা ধূপকাঠি।

ধূপের ধোঁয়া আর মৃদু সৌরভে ঘর ভরপুর। এক কোণে একটা বড় আলমারি। চারদিককার দেওয়ালে শুধু মেনকা মার ছবি। কয়েকখানা সাধারণ আকারের ফটোগ্রাফ। কিন্তু, বেশির ভাগই এনলার্জ করা, পাকা হাতে রং-লাগানো। কোনওটায় মেনকা মা অন্নপূর্ণাবেশিনী—হাতে অন্নপাত্র। কোনওটায় তিনি দ্বিভুজা, খড়্গহস্তা। কোনওটায় তিনি ত্রিশূলধারিণী সন্ন্যাসিনী, রুদ্রাক্ষ-ভূষিতা। কোনওটায় তিনি মুকুটশীর্ষা বরাভয়দাত্রী।

ঘরের মেঝে মার্বেল-বাঁধানো। তার ওপর ছোট ছোট বেতের মোড়া সাজানো। মাঝখানে ফিকে সবুজ ভেলভেটের চাদর পাতা। চাদরের আধাআধি জুড়ে চামড়া-আঁটা মস্ত বড় সোফা।

মেনকা মা ব'সে আছেন সোফায় হেলান দিয়ে—হাত-পা শিথিল ভাবে এলানো। চুল ছড়িয়ে আছে সোফার পিঠে। মাঝে মাঝে ডান হাঁটু নাচাচ্ছেন।

মেনকা মার চেহারায় বয়েসের আন্দাজ পাওয়া কঠিন। দেখে মনে হয়, ত্রিশের মধ্যে। সুন্দর স্বাস্থ্য। নজর করলে ওপরের ঠোঁটে গোঁফের ক্ষীণ আভাস চোখে পড়ে। অধর ঠিক ধনুকের মত। মোটা ভ্রূর নীচে উজ্জ্বল চোখ, নাকটা তীক্ষ্ণ। হাত রোম-বহুল।

মেনকা মার উজ্জ্বল-শ্যাম বর্ণে লাল বেনারসী ভালই মানিয়েছে। গলায় ঝুলছে সোনার মুণ্ডমালা, হাতে পাথর বসানো বাজু, কঙ্কণ। মাথায় সোনার মুকুট। পায়ে সোনার নূপুর।

সামনে বড় টিপয়ের ওপর একখানা থালা, একখানা ডিশ, বাটি কয়েকটা, একটা গেলাস। সবই রূপোর। থালায় খান দুই লুচি। পাশে গলদা চিংড়ির চিবোনো মুড়ো, কয়েক টুকরো হাড়। দুটো বাটিতে খানিকটা ক'রে ঝোল। ডিশে টম্যাটো-সস-মাখা পেঁয়াজ-লেটুস-গাজরের স্যালাড ছড়ানো। গেলাসের জলে হলুদ-মশলার রঙ, তেল ভাসছে। টিপয় আর সোফার মধ্যে সামান্য ব্যবধান। ভেল-ভেটের চাদরে ছিটকে পড়েছে লুচির ভাঙা কুচো, সন্দেশের গুঁড়ো।

পায়ের নিচে মেনকা মার দুজন ভক্ত ব'সে আছে। বয়েস তাদের বেশি নয়। একজনের বছর কুড়ি, আর একজনের একটু বেশি। উভয়েই মোটা-সোটা, বেঁটে-খাটো, নিতান্ত গোবেচারা-ধরণের। নাক-চোখ ভোঁতা, মুখ শ্মশ্রু-চিহ্নহীন, মাঝারি রকমের ফর্সা। দুজনের মাঝখানে হাত-খানেক ব্যবধান। দুজনেই একে অপরের নজর এড়িয়ে চোরা চাউনিতে চাইছে মেনকা মার দিকে। বাইরে কুকুরের ডাক শুনলে দুজনেই চমকে উঠছে।

মেনকা মা নির্বিকল্প। আধ-বোজা চোখ দুটো সামনের দিকে। এ-হাত ও-হাত সরাতে সরাতে কখনও বা ভাবালু দৃষ্টি বোলাচ্ছেন পদাশ্রয়ীদের ওপর। চোখোচোখি হলে তারা মাথা নোয়াচ্ছে।

এরকম চলছিল কতক্ষণ। হঠাৎ মেনকা মা কি যেন বলতে লাগলেন অস্পষ্ট আওয়াজে।

ভক্ত-যুগল চঞ্চল হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। উভয়ে উভয়ের দিকে চাইলো। মেনকা মার কথা বোঝা যাচ্ছে না। দুজনেই দাঁড়িয়ে এক একটা কান এগিয়ে দিল তাঁর মুখ-বরাবর। দুজনেই শুনতে লাগলো তাঁর স্বগতোক্তি—

"সকালে প্রয়াগে জলে-ডোবা লোকটাকে চুলের মুঠি ধ'রে টেনে তুললাম। এখন আবার সেতুবন্ধ-রামেশ্বরের কাছে দুখানা ট্রেন। মুখোমুখী ছুটে আসছে। সংঘর্ষ অনিবার্য। কত........কত লোক মরবে........দেরি নেই........ঐ........ঐ......"

জোড়া ভক্ত রীতিমত কাঁপতে শুরু করলো। প্রবল উত্তেজনায় চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল তাদের। একজন হাত জোড় ক'রে আর্তনাদ তুললো,

"বাঁচান, জগজ্জননি! বাঁচান!"

তার জুড়ি হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কেঁদে উঠলো—

"মা! মা গো!"

আর কিছু বেরুলো না তার গলা দিয়ে।

মেনকা মা থেমে গেলেন। নিথর, নিস্পন্দ—চোখের তারা নড়ছে না, পলক পড়ছে না। হাঁটু নিশ্চল। কৃপাভিখারী দুজন ফোঁস ফোঁস করছে।

আস্তে আস্তে তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। লোক দুটো সোফা ঘেঁসে বসলো। চোখ নামিয়ে হাঁটু নাচাতে নাচাতে, মেনকা মা বলতে লাগলেন,

"নরেন, জীবন। এতগুলো মানুষ একেবারে নিয়তির মুখে পড়েছিল। ম'রতো ঠিক। কত পরিবারের সর্ব্বনাশ হত। বেঁচে গেল সবাই শুধু তোমাদের জন্যে........আঃ........"

লম্বা নিঃশ্বাসের সঙ্গে মেনকা মার হাত দুটো গিয়ে পড়লো দু-পাশে নরেন-জীবনের কাঁধে। দুজনেরই সারা দেহে শিহরণ লাগলো।

"কত ভার বইবো আর?"

—এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেল না তারা। হাঁ করে রইলো শুধু।

মেনকা মা দুটো পা রাখলেন দুজনের কোলে।

নরেন-জীবন চোখ বুজলো। পায়ে হাত ছোঁয়ানোর সাহস হল না কারুরই।

"তোমাদের ভক্তি-ডোরে নতুন করে বাঁধা পড়েছি"

—মেনকা মার কথা শুনে নরেন-জীবন পিটপিট করে চাইলো।

এর আগে কয়েকদিন এলেও তারা চরণ-স্পর্শ-ধন্য হয়নি। মেনকা মার পা কোলে নিয়ে পাখার নীচেই তারা ঘেমে উঠলো।

হঠাৎ মেনকা মা জিজ্ঞেস করলেন—

"প্রসাদ পাওনি তো তোমরা?"

প্রশ্নের মধ্যেই ছিল উত্তর। নরেন-জীবনের মুখে পুঞ্জীভূত হল

অব্যক্ত, তর্কাতীত সাত্ত্বিকতা। নরেন তুলে নিল ঝোলমাখা লুচির গুঁড়ো। জীবন হাত বাড়ালো থালার পাশে, সন্তর্পণে টেনে আনলো একটা হাড়।

কপালে ঠেকিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করলো তারা, হাত মুছলো মাথায়। মেনকা মা প্রসন্ন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন তাদের। দুজনের কাঁধে চাপ দিলেন দুহাতে।

বাগানে একটানা কর্কশ কোলাহল চলছিল। নরেন-জীবনের কানে তার রেশ পঁওছালো না।

চার

বাবা জগদীশনাথের ডেরায় শিবরাত্রির মহোৎসব। সদরের দুপাশে দুটো নেড়া থাম লাল শালুতে ঢাকা পড়েছে। খিলেনের মাথায় বড় তিনটে আলো জ্বলছে। আলোর নিচ দিয়ে এলা রং আর বালির পলেস্তারা খ'সে গিয়েছে খানিকটা।

ভেতরে শুধু লোকের মাথা। মস্ত বড় উঠোন। তার দুপাশে খানচারেক ঘর। ওপরে একখানা বড় ঘর একপাশে। তার উল্টো দিকে একধারে ভাঁড়ার আর রান্নাঘর। বড় ঘরের সঙ্গে ঠিক সদরের ওপর আছে ছোট্ট একখানা কামরা। তাতে রয়েছে খাট-বিছানা, লোহার সিন্ধুক, বিরাট দুটো ট্রাঙ্ক। সামনের একখানা ঘর ঠাসা বাবার নানা রকম জিনিষে।

বড় ঘরের মাঝখানে বাবা জগদীশনাথ ব'সে আছেন বাঘছালের ওপরে। ঢুলুঢুলু আঁখি। পেছনে মার্বেল পাথরের মস্ত বড় ষাঁড়। ডান দিকে ডমরু, বাঁয়ে ত্রিশূল, সামনে কমণ্ডলু। বাবার গলায় ধুতরো-করবীর মালা ঝুলছে অনেকগুলো। কোলের ওপর ঝুড়ি-খানেক ফুল-বেলপাতা।

কাঞ্চন-গৌরীবালা চামর নাড়ছে দু-ধারে। আজ কথা বলছে না কেউ। বাইরে থেকে অস্পষ্ট গোলমাল ভেসে আসছে একটানা।

দর্শনার্থীরা হাজির হচ্ছে দলে দলে, প্রণামি রাখছে বাবার পায়ের কাছে, ফুল-বেলপাতা ছিটিয়ে দিচ্ছে, মাথা লুটিয়ে প্রণাম করছে, উঠে চলে যাচ্ছে। নোট, টাকা পড়ছে যথেষ্ট। একখানা গিনি আর একটা আংটি চকচক করছে আলোয়। রূপোর ত্রিপত্র রয়েছে কয়েকখানা। রূপোর একটা বড় সাপ শোয়ানো কমণ্ডলুর গা দিয়ে।

বাবা জগদীশনাথ চোখ দুটো টান করছেন এক-আধবার। সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনের চামর-চালনা দ্রুত হয়ে উঠছে। দেখাদেখি গৌরী-বালাও সমান তালে হাত নাড়ছে।

এর মধ্যে আরতির সময় হল। দোতলার বন্ধ ঘর খুলে দিল এক গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারী। সমাগত সকলের হাতে হাতে চ'লে এল পঞ্চপ্রদীপ, জলশঙ্খ, নাগরা, কাঁসর, ঘণ্টা, ডুগডুগি, রামশিঙা, জগঝম্প। জোড়া কাঠি হাতে নাগরার সামনে বসলো একজন। কাঁসর, ঘণ্টা, ডুগডুগি, রামশিঙা, জগঝম্প নিয়ে দাঁড়াল পাঁচজন। চামর থামিয়ে কাঞ্চন ঘরের মাঝখানটা খালি ক'রে দিল। গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারী শুরু করলো আরতি। তার সহকারী একটার পর একটা জিনিস এগিয়ে দিতে লাগলো।

বাইরে একদম নিচ পর্যন্ত নিরেট ভীড়। কেউ মাথার ওপর হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়েছে, কেউ হাত দুটো এক ক'রে কোনও রকমে বুকের ওপর রেখেছে। দু-চারজন হাঁস-ফাঁস করছে, হাঁপাচ্ছে।

কিন্তু, সবাই ভক্তিরসে জারিত। সবার মুখে একটানা "বাবা, বাবা।" মাঝে মাঝে ছাড়া গলার আওয়াজ—"জয় বাবা জগদীশনাথ।"

আরতি-কাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাপার। গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারী নেচে নেচে হাত নাড়ে। বাজনা চলে দ্রুত তালে।

আরতি শেষ ক'রে শাঁখ বাজিয়ে গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারী পুরো দমে চেঁচিয়ে উঠলো, "জয়, বাবা জগদীশনাথের জয়।" ওপর থেকে সদর পর্যন্ত ডজন ডজন লোক অমনি এক সঙ্গে দোহার দিল, "জয়, বাবা জগদীশনাথের জয়।" এইভাবে তিন দফা জয়ধ্বনির পর গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারী বাবাকে প্রণাম করলো।

তুমুল কাণ্ড বেধে যায় সঙ্গে সঙ্গে। ভীড়ে আটক মানুষগুলো যেন ক্ষেপে ওঠে। আরম্ভ হয় হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি। চার-পাঁচজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে একেবারে বাবার সামনে। দরজায় অনেক লোক। কেউ কাউকে এগুতে দেবে না।

সিঁড়ির দিকে আর্ত্ত চীৎকার—

"ওঃ! ম'রে গেলাম! বাবাগো!"

গোলমাল ছাপিয়ে নিচ থেকে ভেসে আসে,

"মরবার আগে তোমার চরণ দেখতে পেলুম না, বাবা-আ-আ!"

চৌকাঠে পায়ের তলা দিয়ে কে যেন মাথা গলায়। তার গর্দান চেপে ধরে কয়েকজন। সে গোঙাতে থাকে।

বাবা জগদীশনাথ ন'ড়ে চ'ড়ে হুঙ্কার দিলেন—

"ব্যোম, ব্যোম।"

তাঁর কণ্ঠস্বরের রেশ ধ'রে হট্টগোল পরিণত হল ফিসফাস আওয়াজে। সামনা-সামনি কারুর মুখে আর টুঁ শব্দটি নেই। হাঁড়িকাঠে মাথা-গলানো পাঁঠার মত যে ভক্তটি এতক্ষণ দরজায় কাৎরাচ্ছিল, সে পর্যন্ত নিশ্চুপ। হুটোপাটি-গুঁতোগুঁতি একদম বন্ধ।

মেয়েদের ঘোমটা কোথায় গিয়েছে, ঠিক নেই। মেয়ে-পুরুষ সবারই চুল বিস্রস্ত। কয়েকজনের জামা ফালিফালি। নিজের দিকে নজর নেই কারুর।

বাবা জগদীশনাথ আর একবার হাঁক পাড়লেন—"ব্যোম, ব্যোম।" কপাল কুঁচকিয়ে ষাঁড়ের ওপর ঠেস দিয়ে বসলেন, পা দুটো টান করে দিলেন কমণ্ডলুর দু-পাশ দিয়ে। ফুল-বেলপাতা গড়িয়ে পড়লো এপাশে-ওপাশে।

ওপর-নিচে তখনও চলছিল নিস্তব্ধতার মহড়া।

বাবা হাঁ করে লম্বা উদ্গার ছাড়লেন।

চামরটা উঁচিয়ে ধ'রে কাঞ্চন জোর বকুনি শুরু করলো দরজার দিকে চেয়ে—

"বাবার ধ্যান ভেঙেছে দেখেও সব দাঁড়িয়ে আছে। যত বেয়াড়া, বে-আক্কেলে এসে জুটেছে।"

গৌরীবালা জুড়ে দিল,

"হাঁ ক'রে কি দেখছেন আপনারা? চলে যান তাড়াতাড়ি।"

কথার সঙ্গে সে চামর নাড়লো সিঁড়িমুখো।

ষাঁড়ের পিঠে ছু-কনুই রেখে বাবা জগদীশনাথ ফের "ব্যোম ব্যোম" করলেন। গলা তাঁর মুদারা গ্রাম থেকে প্রসন্ন উদারায় নেমে এসেছিল।

দরজা খালি হয়। বাইরের চাপ কমতে থাকে। শুধু পায়ের আওয়াজ কানে আসে সিঁড়ি থেকে। নিচে নেমে যায় সবাই। মুখ বুজে যে যার জুতো খোঁজে।

একজন রীতিমত মোটা কৃপাপ্রার্থী কি ভাবে যেন ভীড় এড়িয়ে সবাইকে পেছনে ফেলে, ডুগডুগি-জগঝম্প-রামশিঙা ডিঙিয়ে কোণস্থ হয়েছিল। পাঞ্জাবির সামান্য অংশ ঝুলছিল তার কাঁধের ওপর দিয়ে। কাপড় সামলিয়ে, পাঞ্জাবির টুকরোয় মুখটা মুছে ঘামে জবজবে ফতুয়ার তলা দিয়ে সে তলপেটে ছুহাত চালাতে লাগলো। কি যেন হাতড়াচ্ছিল। মুখে ফুটে উঠেছিল ছুশ্চিন্তা।

একটু বাদে একগাল হাসি নিয়ে লোকটি ডান হাতে টেনে বার করলো ছোট, আঁটসাঁট বটুয়া। একেবারে তেলচিটে ময়লা— তলপেট-ঘেরা সরু মজবুত দড়ির সঙ্গে বাঁধা।

থলিটা হাতে নিয়ে সে চাইলো গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারীর দিকে।

"চটপট কাজ সারুন।"

অপ্রস্তুত ভক্ত গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারীর কথায় নিচু হতে চেষ্টা করলো। চেষ্টার চোটে মস্ত বড় ভুঁড়ি নিয়ে ব'সে পড়লো থপ ক'রে। মাথা নোয়াতে পারলো না। কাতর চোখ ছুটো ওপরে তুলতে গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারী তাড়া দিল,

"ঐ ভাবেই নিবেদন হোক। প্রণাম করুন জোড় হাতে।"

জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে সে বটুয়ার বাঁধন খুললো।

"ধ্যান ভাঙার পর বাবা কি আপনার জন্যে সারা রাত ব'সে থাকবেন? বাজে সময় নষ্ট করছেন কেন?"

গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারীর তিরস্কারে থতমত খেয়ে লোকটি তাড়াতাড়ি

হাত ঢোকালো থলির মধ্যে। এবার গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারীর কড়া ধমক—

"দেবেন তো কত! তার আবার এত ভণিতা।"

নাচার কৃপাপ্রার্থী একবার চাইলো কাঞ্চনের দিকে, একবার গৌরীবালার দিকে। হাতটা তার নড়ছিল বটুয়ার ভেতরে। পরপর পাঁচখানা একশো টাকার নোট বার ক'রে সে রাখলো কোলের ওপর, থলিটা চালান করলো পেট কাপড়ের আড়ালে, ঘ'ষে ঘ'ষে নোট কখানা গুণলো দুবার।

গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারীর বিরক্তি কেটে গিয়েছিল। নোটের খসখস আওয়াজে বাবা জগদীশনাথ ন'ড়ে বসলেন। গৌরীবালাকে হাঁ করতে দেখে মুখ বেঁকিয়ে, হাতের ইসরায় কাঞ্চন থামালো তাকে।

স্থূলকায় সেবকটি এতক্ষণ নির্বাক ছিল। এবার তার ঠোঁট নড়া শুরু হল।

গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারীর কাছে এধরণের ব্যাপার নতুন নয়। ভক্তের কাঁধ ধ'রে ঠেলতে ঠেলতে বললো,

"চলুন, বাবার কাছে।"

লোকটি উঠলো না। ব'সে বসেই নোট কখানা দিল গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারীর হাতে। সে টাকাটা বাবা জগদীশনাথের সামনে রাখলো। তারপর ভক্তের ফোঁপানি—

"বাবা—ভুঃ ভুঃ···উঁ···উঁ, বাবা, কাল ইনকাম···ভুঃ ভুঃ ভুঃ, ইনকাম টাক্সের মামলা····উঁ····উঁ ···আপনার দয়া না হলে····উঁ····উঁ ভুঃ····ভুঃ···"

"চলুন বাইরে। কোনও ভাবনা করবেন না।"

গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারীর যেমন কথা তেমনি কাজ।

মন চারেক ওজনের মানুষটাকে এক হ্যাঁচকায় চৌকাঠ পার করালো। কাপড় সামলিয়ে ফতুয়ার কোণে চোখ মুছে লোকটি করজোড়ে জিজ্ঞেস করলো,

"বাবা কৃপা করবেন তো ?"

বাবা জগদীশনাথের কণ্ঠনিনাদ শোনা গেল আবার—

"ব্যোম, ব্যোম।"

গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারী গুরুভার করুণাপ্রত্যাশীকে নিয়ে সিঁড়ির কয়েকধাপ নামলো। একবার চাইলো ঘরের দিকে। তারপর চাপা গলায় বললো—

"বাবার জন্যে আর কিছু ছাড়তে হবে এখানে।"

ভক্ত কাপড়ের আড়াল থেকে বার করলো বটুয়া, তার ভেতরে আস্তে আস্তে হাত চালাতে লাগলো।

গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারীর তর সইছিল না। মোলায়েম তাড়া লাগালো নিচের দিকে মুখ ক'রে—

"আঃ। বড্ড নড়বড়ে আপনি। এত ঢিলেমিতে চলে ?"

"না, না, ধরুন এটা। কাল সকালে বাবাকে মনে করিয়ে দেবেন। মামলার ডাক হবে সাড়ে দশটায়।"

একশো টাকার একখানা নোট দিয়ে সে থলিটি রাখলো যথাস্থানে।

তাকে আশ্বস্ত ক'রে গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারী নীচের দিকে পা বাড়ালো।

পেছন থেকে লোকটি ডাকলো—

"শুনুন, শুনুন, আর একটা কথা।"

সাড়া না দিয়ে গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারী তরতর ক'রে নেমে গেল।

একতলায় তখনও জনারণ্য।

বাবা জগদীশনাথের শরণার্থীরা জমে আছে উঠোনে। ধাক্কা-ধাক্কি করছে না তারা। শিবরাত্রি উপলক্ষে বাবার দুগ্ধ-স্নান হয়। মস্ত বড় গামলায় স্নানের দুধ রাখা আছে। বাবার দেহামৃত পান ক'রে তবে ফিরবে সবাই। বাবার এক চেলা রূপোর হাতায় ক'রে দুধ বিলোচ্ছে। ভক্তেরা একের পর একে দুধ নিচ্ছে করপত্রে, খেয়ে

ফেলছে, হাতটা মাথায় বোলাচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। দু-পাঁচজন বাটি-গেলাস-শিশি বাড়িয়ে দিচ্ছে, দুধ পেলে পাত্রটা কপালে ঠেকিয়ে সাবধানে এগুচ্ছে সদরের দিকে। কেউ কেউ দেহামৃত মুখে দিয়ে রুমাল ধরছে সামনে। বাবার চেলা হাতা থেকে দু-চার ফোঁটা দুধ ছিটিয়ে দিচ্ছে তাতে।

গেরুয়া-রুদ্রাক্ষধারী বিশ্বনাথ আর তার সহকারী বদ্রিনাথ এরই মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে অবলীলাক্রমে। বদ্রিনাথের পরণে আগোড়ালিলম্বিত গেরুয়া-রঙের আলখাল্লা, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক। তারা এদিকে ঘাড় নাড়ছে, ওদিকে মাথা কাত করছে, কাউকে নিয়ে যাচ্ছে একেবারে সদরের মুখে, হাতের চেটো উঁচিয়ে কাউকে শান্ত করছে।

আর্জিরও কসুর নেই—

"দেখবেন, ভুলবেন না।"

"ফেঁসে যেন না-যাই।"

"টেণ্ডারের ব্যাপারটা। বুঝলেন?"

"বিয়ে হবে তো শেষ পর্যন্ত?"

"আর কতদিনে দুশমনটা মরবে?"

এইভাবে হরেক রকমের নিবেদনে যে যার মন উজাড় ক'রে দিচ্ছে। কোনও হৈ-হল্লা নেই।

দেহামৃত মুখে দিয়ে কেউ কেউ চ'লে যাচ্ছে কোন আবেদন না-জানিয়ে।

এরই মধ্যে সদরে গোলমাল বেধে গেল আচমকা। বিশ্বনাথ, বদ্রিনাথ আগে কান দেয়নি। শেষ পর্যন্ত তাদের যেতে হল ব্যাপারটা কি দেখতে।

দরজা আগলিয়ে শুয়ে পড়েছেন এক ভদ্রলোক। উঠতে বললে জড়িত স্বরে গালাগাল দিচ্ছেন। বয়েস হয়েছে বেশ। চুল পাকা। মদে একদম চুর। অনুরোধ-উপরোধে মাথা নাড়ছেন আর জড়িয়ে জড়িয়ে গজরাচ্ছেন—

"কারুর খাই, না পরি? নড়ছি না এখান থেকে। কোন্ শূয়োরের বাচ্চা হঠাবে আমাকে? বাবাকে না-দেখে যাব না।"

নিজেদের মধ্যে তাড়াতাড়ি পরামর্শ ক'রে দুজনে গিয়ে দাঁড়ালো মাতালের সামনে। বিশ্বনাথ বললো,

"চলুন, কর্তামশায়, বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন, দর্শন দেবেন।"

"ব-অ-টে-এ? চ-লু-উন? উট্‌কো লোক নাকি? পাল্কি এনেছো?"

"আমরা নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।"

"তবে তাই হোক, তবে তাই হোক"—গানের সুরে জবাব দিয়ে উঠে বসলেন কর্তামশায়। বিশ্বনাথ-বদ্রিনাথ ধ'রে তুললো তাঁকে। বিশ্বনাথ পাঁজা-কোলা করতে গেলে তিনি ঘোরতর আপত্তি জানালেন। তিনি খোঁড়া নন, নুলো নন। নিজের গতরে সিঁড়ি ভাঙবেন। তাই রফা হল সঙ্গে সঙ্গে। দুজনের হাত ধ'রে টলতে টলতে, ঝুলতে ঝুলতে তিনি এগুলেন ভেতর দিকে। সিঁড়ি পর্যন্ত যেতে বমিও করলেন খানিকটা।

একেবারে বাবার সামনে কর্তামশায়কে বসিয়ে দিয়ে বিশ্বনাথ-বদ্রিনাথ নিচে নামলো। কাঞ্চন-গৌরীবালা ঢুকলো গিয়ে পাশের ঘরে।

কর্তামশায় জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন,

"বাবা, ভাল ফ্রেঞ্চ মাল আনছিলাম। কিন্তু, ভুল করে⋯"

—রীতিমত উৎকণ্ঠায় বাবা জগদীশনাথ তাকে থামিয়ে দিলেন—

"চেঁচিও না। ফেলে এসেছো? মানে শিবরাত্তিরটাই মাটি তাহলে?"

"অপরাধ নেবেন না, বাবা। বোধ হয় কম দিয়েছিল। পরখ করতে করতে দেখি বোতল একদম ফাঁকা।"

"তবে খালি হাতে এলে কি করতে? কোনও দোকানও খোলা নেই।"

"তোমার চরণ দেখতে এসেছি, বাবা।"

"চরণ? চরণ? সস্তা? বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ! বদ্রিনাথ!"

বাবার জাঁদরেল ডাক কানে যেতে দুজনেই ছুটে এল নিচ থেকে। কর্তামশায়কে দেখিয়ে বাবা আদেশ করলেন,

"একে একেবারে গাড়িতে চাপিয়ে দাও।"

ভদ্রলোক বিদ্রোহের চেষ্টা করলেন, মুখও ছোটালেন খানিকটা। কিন্তু ছাড়া পেলেন না। গাড়িতে তুলে বিশ্বনাথ তাঁর ডান পকেটে হাত ঢোকালো, বদ্রিনাথ বাঁ পকেটে।

ফিরতি মুখে বদ্রিনাথ জিজ্ঞেস করলো বিশ্বনাথকে—

"কি পেলেন, দাদা?"

"দুটো টাকা মোটে। তুমি?"

"কিচ্ছু না। বমি যা লেগেছে, চান করতে হবে সাবান দিয়ে।"

বদ্রিনাথ থুতু ফেললো দেওয়ালে।

ওপরেও পট-পরিবর্তন ঘটলো। বড় ঘরের লাগোয়া ছোট ঘরে বাবা জগদীশনাথ একদম খাটস্থ হলেন। মাথার ওপর নিষ্প্রভ আলো। কাঞ্চন মাথা টিপতে লাগলো, গৌরীবালা পায়ে হাত বোলাতে শুরু করলো।

বাবা গলা খাঁকারি দিতে কাঞ্চন গৌরীবালাকে বললো,

"ও ঘরে পানের ডিবেটা রয়েছে। নিয়ে এসো।"

ডিবে এল। ডিবে থেকে একসঙ্গে চারটে পান নিয়ে কাঞ্চন দিল বাবার মুখে। তারপর আঁচলের খুঁটে বাঁধা জরদার কৌটো বার করলো। গৌরীবালা দেখছিল চোখ পাকিয়ে—

কৌটোর ঢাকনি খুলে সন্তর্পণে বড় একটিপ জর্দা তুললো কাঞ্চন।

"হাঁ করুন, বাবা। জর্দা।"

জর্দা খেয়ে খানিকটা চিবিয়ে বাবা "হুঁ, হুঁ," করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গৌরীবালা উঠে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো।

"পিকদানিতো খাটের তলায়।"

কাঞ্চনের কথায় পিকদানির হদিশ পেল গৌরীবালা।

মাথা উঁচিয়ে বাবা তাতে পিক ফেললেন।

এবার বিশ্বনাথ এসে ঢুকলো ঘরে। হাতে তার শ্বেত-পাথরের মস্ত বড় গেলাস।

গৌরীবালা তাড়াতাড়ি পিকদানিটা চালান করলো খাটের নিচে। সে মাথা তুলে দাঁড়ানোর আগেই বাবার কানের কাছে মুখ নামিয়ে মিহি গলায় কাঞ্চন বললো,

"সোমরস এনেছে, বাবা।"

পাঁচ

যমুনা-ধামে সদরের মাথায় নিয়ন-বাতির বিজ্ঞপ্তি—"প্রভু কিশোর ঠাকুরের ঝুলনোৎসব।" তার নিচে তু-ধারে লম্বালম্বি "স্বাগতম" জ্বলজ্বল করছে। সদরটা নানা রকমের পাতা আর ফুল দিয়ে সাজানো। ভেতরে সবকটা দেওয়ালে ঝুলছে তারে গাঁথা গোলাপের মালা। সিঁড়ির রেলিঙে পাঁচমিশেলী ফুলের তোড়া বাঁধা একটার পর একটা।

আজ লোকের চাপ ভয়ানক রকম বেশি। তুখানা খাতা নিয়ে বসেছে তুজন নাম-লিখিয়ে।

তিনতলার কুঞ্জগৃহে মস্ত বড় দোলনায় প্রভু কিশোর ঠাকুর দোল খাচ্ছেন।

ঘরের আলো নিতান্ত স্তিমিত। দোলনার পেছনে মস্ত বড় ছটা। তাতে কাঁচের ওপর আঁকা যত দেবদেবী। চতুর্মুখ ব্রহ্মা, চন্দ্রশেখর মহেশ্বর, গণপতি, কার্তিকেয়, লক্ষ্মী, সরস্বতী—বাদ নেই কেউ। সবাই জোড়হস্ত। কাঁচের আড়ালে আলো ঘুরছে অনবরত। দেবদেবীরা একে একে দর্শকদের চোখে ধরা দিচ্ছেন।

ছাতের ঘুলঘুলি দিয়ে লাল-নীল-বেগুনী-কমলা-সবুজ ঝলক এসে পড়ছে প্রভু কিশোর ঠাকুরের সর্বাঙ্গে। দোলনার হাতল তুটোয় জোড়া ময়ুর। দেখলে মনে হয় জ্যান্ত। দোলার গতিতে রামধনুর চমক লাগছে। প্রভু কিশোর ঠাকুরকে ঘিরে রূপকথার পরিবেশ।

জরিতে গাঁথা বেলকুঁড়ির মাঝখানে কৃষ্ণচূড়ার ময়ুর-পাখা। প্রভুর মুখ, হাত চন্দন-চর্চিত। গলায় কদমের মালা। তার সঙ্গে যুঁই-বকুলের সাতনরী। কোলের ওপর রূপোর মোহন বাঁশী। প্রভুকে সুন্দর মানিয়েছে।

কুঞ্জগৃহের মেঝেতে আলপনা।

দোলনার তুদিকে ব'সে আছে কয়েকটি তরুণী। তাদের অঙ্গে

সূক্ষ্ম বসন, পুষ্পাভরণ। প্রত্যেকের বেণীতে গোঁজা সাদা গোলাপ, চাঁপার গোছা।

ঘরের সব কটা দেওয়াল শ্বেত-পদ্মে ঢাকা। মাথার ওপরে আগাগোড়া নীল চন্দ্রাতপ টান ক'রে আঁটা। তার থেকে ঝুলছে সারি সারি রজনী-গন্ধা।

মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি দিয়ে আসছে আতর-মেশানো গোলাপ-জলের পিচকিরি-ধারা।

ওপরের সৌরভে দোতলা পর্যন্ত আমোদিত। আজ আর ঘণ্টা বাজানো, দরজা পাহারার ব্যবস্থা নেই। অর্ঘ্য-প্রণামী-মানসিক দোতলায় জমা ক'রে দর্শনাকাঙ্ক্ষীরা সবাই চ'লে আসছে ওপরে। জুতো খুলে ঘরে ঢুকে প্রত্যেকে হাত লাগাচ্ছে দোলায়, প্রভুর বাঁ পা টেনে নিয়ে ঠেকাচ্ছে মাথায়।

মাইকে বাজছে যন্ত্র-সঙ্গীত। আওয়াজটা তার খুব মৃদু। ব'সে থাকা মেয়ে কটি ফিসফাস করছে শুধু। আর কারুর মুখে সাড়া-শব্দ নেই।

এইভাবেই ঝুলন-পূর্ণিমার সন্ধ্যে কেটে গিয়ে বেশ রাত হল। ভক্তের স্রোতে ভাঁটা পড়লো।

ভক্তি-উপহারের পাহাড়ও জ'মে উঠেছিল।

এলেন দত্ত-পরিবারের বড় গিন্নী। মোটা মানুষ। বয়েসও কম নয়। চুল ধবধবে সাদা। তার মাঝখানে সিঁথি-জোড়া সিঁদুর।

প্রবীণা ভদ্রমহিলা হাঁফাচ্ছিলেন। দুপাশে দুই ঝি ধ'রে এনেছে। পেছনে আর এক পরিচারিকার হাতে মস্ত একখানা রূপোর থালা। তার ওপর রূপোর বাটি তিনটে, মীনের কাজ করা রূপোর বড় কৌটো একটা, রূপোর ঝিনুক পাশে।

দত্ত-পরিবারের বড় গিন্নীকে চৌকাঠে দেখেই প্রভু কিশোর ঠাকুর হাসতে আরম্ভ করলেন। দুপাশের মেয়েরা উঠে দাঁড়ালো।

গিন্নী আস্তে আস্তে দোলনা পর্যন্ত এগুলেন। তখনও তাঁর

নিঃশ্বাস পড়ছে ফোঁস ফোঁস ক'রে। বাইরে থেকে আর কেউ ঢুকছে না।

গিন্নী টেনে টেনে, থেমে থেমে বললেন—

"প্রভু, এবার পর্যন্ত অনেক কষ্টে তিনতলার সিঁড়ি ভাঙলাম। আসছে বছর বোধ হয় পারবো না।"

প্রভু তাকে সান্ত্বনা দিলেন—

"পারবে, পারবে। নিশ্চয় পারবে।

"প্রভু, কত রকমে পরীক্ষা কর।"

পরিচারিকা থালা নিচু ক'রে ধরলো।

বড় গিন্নী "নাও" ব'লে একটা বাটি থেকে ক্ষীর তুলে দিলেন প্রভুর মুখে। ক্ষীরের পর ছানা, ছানার পর ননী। তারপর কৌটোয়-রাখা সরের নাড়ু। শেষে চিবুক ধ'রে ঝিনুকে ক'রে দুধ ঢাললেন দু-ঠোঁটের ফাঁকে। দুধ গড়িয়ে পড়লো মুখ বেয়ে। বড় গিন্নী আঁচল তুলে প্রভুর মুখ মুছে দিলেন।

"আগের কথা মনে পড়ে? গোকুলে নন্দরাণীর হাত থেকে ছানা-ননী-সর-দুধ খেতে?"—বড় গিন্নীর গলা বুজে আসে। ফোক্‌লা মুখের ঝুলে-পড়া মাংস-বহুল গালে চামড়া নড়তে থাকে।

প্রভু বার কয়েক ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়েন।

বড় গিন্নীর চোখ দুটো ভিজে ওঠে। দোলার দিকে হাত বাড়ান তিনি।

প্রভু নিষেধ করলেন—

"পায়ে হাত দিতে বারণ করেছি না তোমাকে?"

"কত ছলনা জান" বলতে বলতে দত্ত পরিবারের বড় গিন্নী কেঁদে ফেললেন।

প্রভুর হাসি-মুখ করুণ হয়ে উঠলো।

দুই ঝিকে ধ'রে বড় গিন্নী আস্তে আস্তে বসলেন মেঝের ওপর। জোড়হাত বুকের ওপর রেখে মাথা নুইয়ে নমস্কার করলেন। দোলনার

নিচে আঙুল দেখিয়ে পেছনের পরিচারিকাকে কি যেন ইসারা করলেন। সে রূপোর থালা-বাটি-ডিবে-ঝিনুক গুছিয়ে রাখলো দোলনার তলায়।

প্রভু আবার হাসতে শুরু করেছিলেন।

ঝি-দুজন হাত ধ'রে তুললো বড় গিন্নীকে।

"যাই তাহলে"—

বিদায় নিয়ে বড় গিন্নী ডান হাতের পিঠে চোখ মুছলেন।

"আবার এস"—

প্রভু কিশোর ঠাকুরের মুখেও বেদনার ছায়া পড়লো।

বড় গিন্নী নিঃশব্দে চ'লে গেলেন।

নেপথ্যের যন্ত্র-সঙ্গীতে বিরতি ঘটেছিল। মাইকে আবার বাজনা শুরু হল।

ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে মেয়ে কজন পাশাপাশি দাঁড়ালো দোলনার সামনে। কুন্তলা বললো,

"বুড়ীটার মাথা খারাপ। ঠোঁটে ক্ষীর লেগে রয়েছে। মুছে দোবো?"

ঠাকুর মানা করলেন।

বাজনার আওয়াজ জোরদার হল। মেয়েদের পা পড়তে লাগলো তালে তালে। তারপর দোলনা-ঘিরে মিলিত-নৃত্য।

মাইকে একটার পর একটা রেকর্ড বদল হয়। তাল মিলিয়ে মেয়েরা নাচতে থাকে। সবার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

প্রভু হাত তুলতে নিরস্ত হল তারা। কুন্তলাকে তিনি কলিং-বেলটা দেখিয়ে দিলেন।

ক্রি-ই-ইং, ক্রি-ই-ই-ইং আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই টুনু হাজির।

"দোতলায় কেউ আছে?"

টুনু উত্তর করলো, "না। নিচে এক-আধজন রয়েছে।"

"নিচে যাও, তাহলে।"

হুকুম শুনেও টুনু দাঁড়িয়ে রইলো।

"কি? গেলে না যে?"

মেয়েদের দিকে একবার চেয়ে টুনু জবাব দিল,

"এঁদের জন্যে খাবার পাঠাবো?"

"না, না। যাও এখন।

প্রভুর বিরক্তি দেখে টুনু নিচ-মুখো দৌড়োলো।

প্রভু কিশোর ঠাকুর এবার দোলনা থেকে নামলেন। ব'সে ব'সে তাঁর হাত-পা ধ'রে গিয়েছিল। গোড়ালি উঁচিয়ে মাথার ওপর দু-হাত তুলে সারা দেহ ঝাঁকিয়ে তিনি এগুলেন দরজার দিকে। কপাট বন্ধ ক'রে ছিটকিনিতে হাত দিয়ে কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন।

খোল-করতালের শব্দ আসছিল দূর থেকে। অস্পষ্ট। হয়তো মড়া নিয়ে যাচ্ছে। প্রভু নিবিষ্ট মনে আওয়াজটা শুনতে লাগলেন। ক্রমে খোল-করতালের সঙ্গে কীর্তনের সুরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বেশ কানে আসছিল, "গোকুল ছাড়িয়া........"

চরম বিরক্তিতে প্রভু গিয়ে চাপলেন দোলনাতে। ঘণ্টা বাজালেন সঙ্গে সঙ্গে।

টুনু ছুটে এল।

"শীগগির মাইক আর আলো চালাও। পিচকিরিটাও। বুঝলে?"

টুনু এক লাফে বেরুলো ঘর থেকে। মেয়ে কাটি জড়সড় হয়ে দোলনার দু-পাশে জায়গা নিল। দেখতে দেখতে শ্রীখোল-বাহিনী হাজির হল যমুনা-ধামের উঠোনে। পেশাদার বৈরাগীর দল নয়। ধুতি-পাঞ্জাবি-দুরস্ত ছেলে-বুড়োর পাল।

খুলী-করতালীরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে। গলার মালাগুলো ঠিক ক'রে স্মিতানন ঠাকুর দরজার দিকে নজর মেলে দেন। সন্ত্রস্ত মেয়েরা বসে দোলনা ঘেঁষে।

গায়ক-বাদকেরা ঢোকে কুঞ্জগৃহে, একে একে অর্ধচন্দ্রাকারে

প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে যায়। শুরু হয় তুমুল খোলন্দাজী, ছাত কাঁপানো করতালবাজী।

বাজনার সঙ্গে চলে প্রভু কিশোর ঠাকুরের নাম কীর্তন—

"গোকুল ছাড়িয়া প্রভু আইলা তুমি হেথা।

জগত-কারণ, প্রভু, কিশোর ঠাকুর ॥

বৈকুণ্ঠ যে খালি প্রভু, তোমার বিহনে।

জগত কারণ, প্রভু কিশোর ঠাকুর ॥

ধরা-ধামে তুমি প্রভু, বিষ্ণু-অবতার।

জগত-কারণ, প্রভু, কিশোর ঠাকুর ॥"

কীর্তনের কলি কটি বহু বার ঘুরে আসার পর মাতন-পর্ব। তাল দ্রুত হল, গলার শিরা ফুলে উঠলো সবার, হাত চলতে লাগলো ভয়ানক রকম। প্রত্যেকের গা দিয়ে ঘামের ঝরণা ঝরছিল, মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

প্রভু দু-হাত না-তুললে তারা কতক্ষণ চালাতো, ঠিক নেই।

খোল-করতাল মেঝেয় রেখে, গান থামিয়ে কীর্তনীয়ারা সবাই দোলনা স্পর্শ করলো, প্রভুর পা মাথায় ঠেকালো। তারপর মূল গায়েন দোলনার ওপর রাখলো তিনখানা গিনি।

প্রভু স্মিতাননে চোখ বুজলেন।

খোল-করতাল তুলে নিয়ে কীর্তনওয়ালারা সবাই নেমে গেল "জগত-কারণ, প্রভু, কিশোর ঠাকুর" গাইতে গাইতে।

নাম-সঙ্কীর্তনের রেশ মিলিয়ে আসতে প্রভু ঘণ্টা বাজালেন। মাইক থেমেছিল আগেই। আলোর খেলা বন্ধ হল এবার।

টুনু এল।

প্রভু বললেন, "সদর দিয়ে বিশ্রাম কর তোমরা।"

টুনু যেতে প্রভু চটপট উঠে দরজায় ছিটকিনি আঁটলেন।

ঘুঙুরের ঝুম ঝুম শব্দে কুঞ্জগৃহ ভরে উঠলো।

তারপর শুধু নারী-কণ্ঠের চটুল হাসি।

অনেকক্ষণ পরে দরজায় টোকা পড়লো গোটা কয়েক।

খানিকটা বাদে কুন্তলা দরজা খুললো।

বাইরে দাঁড়িয়ে টুনু।

"এস।"

প্রভুর আহ্বানে সে ভেতরে ঢুকলো।

প্রভু কিশোর ঠাকুর দোলনায় শুয়ে। একটা পা ছটার গায়ে হেলানো, আর একটা চেপেছে ময়ূরের ঘাড়ে। গলার সাতনরী ছিঁড়ে প'ড়ে আছে মেঝের ওপর, চটকানো কদমফুলের মালা পিঠের পাশে, বেল-কুঁড়ি ছড়িয়ে এদিক ওদিক, কৃষ্ণচূড়া কাঁধে নেমেছে, চন্দন-চিহ্ন আধমোছা।

মাথাটা ঘুরিয়ে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন,

"খাবার তৈরি ?"

টুনু ঘাড় নাড়লো।

"কি কি এনেছো ?"

"কাটলেট্, মোগলাই পরোটা, চিকেন রোষ্ট, পুডিং।"

"পাঁচজনের কুলোবে তো ?"

"সাত-আটজনের মত হবে।"

"হুঁ। বেশি তো আনবেই।"

টুনু সাড়া দিল না।

বাঁ-হাতে কোমরের পাশ থেকে বাঁশিটা সরিয়ে প্রভু রাখলেন মাথার ধারে।

"বেঁকে গ্যাছে দেখছি।"

"তাতে তোমার কি ? খাবার আন।"

প্রভুর চাঁছা-ছোলা নির্দেশ পুরোপুরি শোনবার আগেই টুনু পা বাড়ালো বাইরে। ফিরেও এল খুব তাড়াতাড়ি। তার পেছনে হরু আর রমেশ। তিনজনের হাতে চার খেপে খাবার জিনিস সব জমা হল ঘরের কোণে ড্রেসিং-টেবিলের ওপর। কাঁচের

কুঁজো ভর্তি জল, পাঁচটা গেলাস, ছোট পিরিচে লবঙ্গ-এলাচ রেখে তারা চলে গেল।

আবার দরজায় ছিটকিনি চড়লো। ঘণ্টাখানেক বাদে প্রভু নিজেই বাইরে গিয়ে টুনুকে ডাকলেন—

"টুনু, অ টুনু।"

দোতলা থেকে সে সাড়া দিল—

"যাই।"

সিঁড়িতে ঝুঁকে প্রভু বললেন,

"না, না। এখুনই আসতে হবে না। খাওয়া সেরে গাড়ি আনো একখানা।"

দেরি হল না বেশি। পান চিবোতে চিবোতে টুনু এসে জানালো, "গাড়ি দাঁড়িয়ে সদরে।"

কুন্তলারা চারজন নিচে নামলো। টুনু যেন কি বলতে যাচ্ছিল। প্রভু জিজ্ঞেস করলেন,

"কি?"

"এগিয়ে দোবো?"

"কোনও দরকার নেই। ঘরটা যেমন আছে থাক। কাল সকালে পরিস্কার করলেই চলবে। এখন শুধু ডিস-বাটিগুলো সরাবার ব্যবস্থা দেখ। বিছানাটাও ঠিক করবে। কেত্তনের ঠেলায় আজ বড্ড রাত হয়ে গেছে।"

ছয়

কালীপুজোর রাত। মেনকা মার আশ্রমে এলাহি কাণ্ড। বাগানের খোওয়া-ছড়ানো রাস্তায় মাঝে মাঝে দুমদ্রাম পটকা ফাটছে, বাইরের পাঁচিলে সার দিয়ে তুবড়ি পুড়ছে, ঘাস-জমি থেকে হাউই উঠছে সোঁ-ও-ও ক'রে। হাজারো লোক দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তায়। ভক্তেরা আনাগোনা করছে দলে দলে।

আলোর মালায় আশ্রম আজ নতুন সাজে ঝলমল। ছাতে মস্তবড় এক 'ওঁ'—অনবরত জ্বলছে, নিভছে।

ভেতরে তিল-ধারণের জায়গা নেই। একতলার উঠোনে দেওয়াল ঘেঁষে পেতলের চকচকে রেলিঙে ঘেরা নিচু কাউণ্টার বসেছে।

কাউণ্টার আগলাচ্ছে একটি যুবক। চেহারাটা চাঁছাছোলা। পরণে সিল্কের পাঞ্জাবি, সিল্কের লুঙ্গি।

যুবকের কপালে সিঁদুরের লম্বা টিপ, হাতে রিষ্টওয়াচ্, পকেটে পেন। আঙুলে মীনে করা আংটিতে 'ম' লেখা। মাথায় বাব্‌রি। তেল নেই তাতে।

যুবকটির সামনে কাউণ্টারের ওপর "বিবরণী-পত্রে"র বাঁধানো প্যাড রয়েছে কয়েকখানা। কাউণ্টারের মাথায় কলাই-করা প্লেটের ওপর মীনার-ঢঙে লাল রঙের হরফে বাংলা আর হিন্দীতে লেখা—

"মানসিক-বিবরণী জমা দিবার স্থান।"

আগন্তুক সবাই সেখানে যাচ্ছে না। যাদের মানসিক আছে, তারা দাঁড়াচ্ছে গিয়ে সামনে। যুবকটি আঙুল দেখাচ্ছে প্যাডের দিকে। মানসিককারী নজর করছে দরখাস্তের ফরম। নাম, ঠিকানা, বয়েস, মানসিকের উপলক্ষ্য, সন-তারিখ, বিশেষ বক্তব্য—ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত এই ছ-দফার সঙ্গে ছ-কিস্তি লাইন-টানা।

মানসিক থাক আর না-থাক্, খালি হাতে কেউ আসেনি। দোতলায় হলঘরের বাইরে একটা বেঞ্চির ওপর পাশাপাশি চারটে বাক্স বসানো।

বাক্স কটা বেশ ভাবি ধরণের, ইস্পাতের মোটা চাদরে তৈরি। মাথার ডালা বন্ধ, মাঝখান দিয়ে কাটা। বাক্সের গায়ে লেখা দেখে ভক্তেরা কোনওটায় ফেলছে খুচরো টাকা, কোনওটায় নোট, কোনওটায় সোনার জিনিস, কোনওটায় রূপোর জিনিস। মেনকা মার আশ্রমে অন্য কোনও রকমের অর্ঘ্য দেওয়ার নিয়ম নেই। বাক্সগুলো নিয়ে ব'সে আছে মেনকা মার প্রধান শিষ্য বীরু। পাশে বিরাট তামার পুষ্পপাত্রে চটচটে সিঁদুর গোলা। একটি ছেলে দাঁড়িয়ে সবার কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিচ্ছে। বয়েস তার বছর কুড়ি, মুখ-চোখে সবলতার ছাপ। নিজের কাজ ক'রে যাচ্ছে একনাগাড়ে। বিরতি নেই তাতে, বিরক্তিও নেই।

বড হলঘর দেখলে চেনাই যায় না। দরজার ওপরে সাঁচি-স্তূপের নকলে বাহার চেপেছে। দু-পাশের দেওয়াল একেবারে সবুজ পাথরের রঙ ধরেছে। ভেতরে ঢালাও পটের খেলা। পাকা হাতের সেট-সিন দুরস্ত কায়দায় বসানো। পাহাড়, নদী, প্রান্তরে প'ড়ে আছে কাটা হাত-পা, বীভৎস ধরণের মাথা কয়েকটা। মাঝখানে মেনকা মা। রক্তাম্বরধারিণী। আলুলায়িত কেশে সোনার মুকুট বসানো। হাতে কঙ্কন। আর কোনও অলঙ্কার নেই। কোলের ওপর রূপোর খড়্গ। শাড়িখানাও লাল বেনারসী। মার্বেল-বাঁধানো মেঝের ওপর মাথা ঠুকে উঠে দাঁড়ালে মা ভক্তকে অভয় মুদ্রা দেখাচ্ছেন। এটা সার্বজনীন। লোক বিশেষে মা কথাও বলছেন দু-একটা। উদ্দিষ্ট অনুগৃহীত সঙ্গে সঙ্গে ব'সে পড়ছে। তার অনুকরণ করছে আরও কয়েকজন। মেনকা মার বাণী খুব সংক্ষিপ্ত। তিনি থামলে দ্বিতীয় দফায় মাথা লুটিয়ে কৃতকৃতার্থেরা উঠে যাচ্ছে।

এরকম চলতে চলতে এলেন একজন মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক। গলাবন্ধ কোটের ওপর চাদর চাপানো। মাথায় টাক। চোখে চশমা। প্রণাম সেরে ওঠার পর মেনকা মা তাঁকে শুধোলেন,

"সব মঙ্গল তো?"

"হ্যাঁ, মা।"

প্রৌঢ়ের জবাব নিস্তেজ। তিনি বসলেন।

"ব্যবসার কি হল?"

"রিটায়ারের পর আর ঝামেলায় জড়াতে মন চায় না। খান-কয়েক বাড়ি ক'রে ভাড়া খাটাবো, ভাবছি। কিন্তু তাতেও ভয়। ভাড়া বাকি পড়লে তাগাদা, মামলা-মোকদ্দমা।"

মেনকা মা খাঁড়ার হাতলে আঙুল ঘষতে লাগলেন। প্রৌঢ় থেমে গেলেন।

এর মধ্যে আর একজন ভক্ত ঢুকলেন হুড়মুড় করে। জামা-কাপড়-চুলে আলুথালু ভাব, চোখের দৃষ্টি উদাস।

মেনকা মা ব্যস্ত হয়ে তাকে বসতে ইসারা করলেন। কিন্তু তাতে কাজ হল না। মেঝের ওপর, সামনে জায়গার অভাব ছিল না। তবুও আগের ভদ্রলোক একপাশে সরলেন।

বিরক্ত মেনকা মা নবাগতকে বললেন,

"আপনার বেয়াড়া অভ্যেস যাবার নয়। বসুন দেখি।"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি প্রশ্ন করলেন,

"প্রসাদ মিলবে তো?"

মেনকা মা নরম ধমক দিলেন,

"পাগলামি করবেন না, রমেশ বাবু।"

"পাগলামি? মোটেই নয়।"

"তবে বসুন।"

কয়েকজন ভক্ত হাঁ করে দেখছিল লোকটির চাল-চলন। মেনকা মা থামতে তারা প্রণাম সারলো। অভয়-মুদ্রা দেখিয়ে মা তাদের বিদেয় করলেন।

রমেশবাবু প্রৌঢ়ের পাশে টান হয়ে শুয়ে পড়লেন এবার।

মেনকা মা জোরে ব'কে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে—

"উঠবেন, না কি?"

রমেশ বাবু এতক্ষণে মনের খেদ জানালেন—

"কাল লাখ টাকার মক্কেল ফেঁসে গিয়েছে, এখন ইজ্জত নিয়ে টানাটানি।"

প্রৌঢ়কে দেখিয়ে মেনকা মা কড়া হুকুম দিলেন,

"ওঁর সঙ্গে যান এখনি।"

রমেশ বাবু ফ্যালফ্যাল ক'রে চাইলেন।

"যা-আ-আ-ন।"

মেনকা মার কর্কশ তাড়ায় আস্তে আস্তে উঠে রমেশ বাবু বেরিয়ে গেলেন। মাটিতে মাথা ঠুকে প্রৌঢ় পিছু নিলেন তাঁর।

মেনকা মার ডাকে বীরু হাজির হল। দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে মেনকা মা জিজ্ঞেস করলেন—

"কে যেন উঁকি মারছে অনেকক্ষণ থেকে।"

বীরু জানালো, ছেলেটি এবার পরীক্ষা দিয়েছে। আগের হপ্তায় এসেছিল প্রণামি নিয়ে। মেনকা মা তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

ছোকরা একদম ছেলেমানুষ। একমাথা কোঁকড়া চুল। ধবধবে রঙ। আভিজাত্যের ছোঁয়াচ আছে চেহারায়। এসে দাঁড়ালো সামনে। মেনকা মার ইঙ্গিতে সামনে মেঝের ওপর বসলো।

তারপর কথাবার্তা।

"কি পরীক্ষা দিয়েছো?"

"ইস্কুলের টেষ্ট।"

"পাশ ক'রে যাবে।"

মহা খুশী হল ছেলেটি।

মেনকা মা প্রশ্ন করলেন,

"বাড়িতে কে আছে?"

"বাবা নেই। শুধু মা।"

"বাবা কি করতেন?"

"সরকারী উকিল ছিলেন।"

"এত রাত্তিরে ফিরবে কি ক'রে?"

"গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।"

"যাক। তা আমার কাছে এলে কেন?"

"মার শরীর খুব খারাপ। উঠতে পারে না। কার কাছে শুনে ড্রাইভারকে ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়েছে আমায়। আর একদিন এসেছিলুম আমি।"

"বেশ।"

মেনকা মা থামলেন।

পরলোকগত বিশিষ্ট উকিলের একমাত্র সন্তান স্কুলের পড়ুয়া সতের-বছর-বয়স্ক বিমল অভিভূতের মত ব'সে রইলো।

মাঝরাতের কাছাকাছি। ওপরে লোক ওঠা বন্ধ হয়েছে। কয়েকজন এক তলায় রয়েছে। বাজি পোড়ানো শেষ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। দূর থেকে বোমের শব্দ ভেসে আসছে দু-একটা।

বিমলের চোখ ভারী হয়ে আসছিল। সে ক্রমে ঢুলতে শুরু করলো।

মেনকা মার কাসিতে হঠাৎ তার ঘুমের ঝোঁক কেটে গেল। মেনকা মার চোখে তার চোখ পড়লো। সে চাইতেই মেনকা মা খড়গ তুলে নিলেন হাতে। বিমলের গা ছমছম ক'রে উঠলো। সে চোখ বুজলো তখনই। কিন্তু কৌতূহলের দায়ে আবার চোখ খুললো। মেনকা মা কাঁপছিলেন থরথর ক'রে। বিমল বুঝলো না কিছু। শুধু মনে হতে লাগলো, "পাশ করবো। কিছুই লিখিনি। তবু পাশ করবো। নিশ্চয়ই পাশ করবো। ইনি বোধহয় সেই জন্যেই এরকম করছেন।"

মেনকা মার গলা দিয়ে অস্পষ্ট আওয়াজ হতে থাকে। কানে

যেতে বিমলের ঔৎসুক্য বেড়ে যায়। মেনকা মার কথাগুলো ক্রমে স্পষ্ট হয়। বিমল বেশ শোনে—

"এই তো সে দিনের কথা। আমি তখন করালবদনা কালী। মনে পড়ে আমার হুঙ্কার। মনে পড়ে, মহাদেব ভেসে চলেছেন রক্তের স্রোতে। বুঝতে পারিনি।"

মেনকা মা আর কিছু বললেন না। কাঁপুনি বন্ধ হয়েছিল আগেই।

বিমলের মাথা ঘুরতে লাগলো। বীরু এল ঘরে। মেনকা মা জানতে চাইলেন, কজন আছে নিচে। বীরু বললো,

"একজন এসে ঢুকলো এই মাত্তর।"

"আজ আর কেউ নয়।"

আদেশ পেয়ে বীরু একতলায় এসে ঘোষণা করলো, "মা এখন ভয়ঙ্করী, মহারৌদ্র। পাকা সাধক ছাড়া যে তাঁকে দেখবে, তার আর রক্ষে থাকবে না।"

সবেমাত্র যে এসেছিল সে চ'লে গেল।

বীরু ওপরে উঠলো আবার।

ঘরে ঢুকতে মেনকা মা আদেশ দিলেন,

"বাক্স কটা এনে রেখে দাও এখানে। কাল সকালে খুলবো সব।"

বীরু চারবারে চারটে বাক্স আনলো। মেনকা মা উঠে গিয়ে নেড়ে দেখলেন এক একটা ক'রে।

তারপর এসে বসলেন নিজের জায়গায়। বিমল যেন কি বলতে চাইছিল। মেনকা মা হাসলেন একটু। বীরু বেরিয়ে যাচ্ছিল। ডাকলেন তাকে—

"শোন, এই ছেলেটি আজ অভিষিক্ত হবে। ব্যবস্থা কর তাড়াতাড়ি।"

ঘাড় নেড়ে ঘর ছাড়লো বীরু। মুখটা তার বেশ বেজার। মেনকা মা আবার মৃদু হাসলেন।

সাত

ছোট-খাট ব্যাপার কত সময় মহাভারত হয়ে দাঁড়ায়। গুজবে কান দেয় মানুষ, হুজুগে মাতে সবাই। চিরদিনের নিয়ম এটা। এ যুগের গুজব আর হুজুগের ছোঁয়াচ লাগে খুব তাড়তাড়ি। গুজব কানে হাঁটতে আরম্ভ করলে, হুজুগ দেখা দিলে লোকে পাইকারী ভাবে বিচার-বুদ্ধি হারায়। জাল বহুবিস্তৃত হওয়ার পর সবাই ভুলে যায় সূত্রপাতের কথা। একই ভাবে তুচ্ছ কারণে সার্বজনীন কুরুক্ষেত্রেও জমে ওঠে।

তিন প্রতিবেশীর তর্কাতর্কি থেকে বাজারে একদিন তুমুল কাণ্ড ঘ'টে গেল। গুজবের ঠেলায়, হুজুগের হিম্মতে সামান্য জিনিস মারাত্মক আকারে সংক্রমিত হল গোটা শহরে।

নগেন, বীরেশ, নরহরি এক পাড়ার বাসিন্দা। বাজারে যাওয়ার আগে এ ওকে ডাকে। বাজার সেরে ফেরেও একসঙ্গে। তিনজনই চাকুরে। অফিসের পথে ট্রামে-বাসে চড়ে একজোটে। তিনজনের জায়গা না-হলে বসে না তারা। বাড়ি ফেরে আলাদা। কিন্তু, রাতের খাওয়া সেরে নির্দিষ্ট রোয়াকে আড্ডা জমায় রোজ। শীত-গ্রীষ্মে একই নিয়ম। বর্ষায় একটু অসুবিধে। ছুটির দিনে তারা তাস খেলে চতুর্থ কোন সঙ্গী জুটিয়ে। বয়েসের পার্থক্য কম। উপার্জনেও তাই। নগেন পাল-পার্বণে হাজরে দেয় বাবা জগদীশ-নাথের আশ্রমে। বীরেশ প্রভু কিশোর ঠাকুরের শিষ্য। কয়েক মাস হল নরহরি ভিড়েছে মেনকা মার ভক্ত-চক্রে।

বাজারের রাস্তায় ষাঁড় থাকে, কুকুর থাকে। তিন সাথী সে সব নজর করে না কখনও। কিন্তু, ভবিতব্য খণ্ডাবে কে!

ধরা-বাঁধা রুটিনের বৈচিত্র্যহীন একটি দিনে সাত সকালে বাজারের পথে মুদিত-নেত্র বিশাল-দেহ পথশায়ী বৃষভকে দেখে নগেন নিজের মনে মন্তব্য করলো—

"এটা আগের জন্মে বোধ হয় গাধা কি বাঁদর ছিল। ধর্মজ্ঞানের জোরে এ জন্মে মহাদেবের কৃপা লাভ করেছে।"

বীরেশের পায়ে হোঁচট লাগলো। সে গজরালো সঙ্গে সঙ্গে—

"ধর্মজ্ঞান না হাতী। রাস্তা জুড়ে শুয়ে আছে।"

"না হে, না। চোখ বোজা কি অমনি অমনি। যতই চেঁচাও, ও চাইবে না, নড়বে না"

—নগেনের মাতব্বরিতে ঝাঁঝ ছিল।

বীরেশ প্রতিবাদ করলো—

"একদম অপোগণ্ড তুমি। মহাপাপী ব'লেই রাস্তার জীব। আঁস্তাকুড় ঢুঁড়ে পেট ভরায়।"

বীরেশকে বাধা দিল নরহরি—

"চিনতে পারা চাই হে, চিনতে পারা চাই। কিস্সু বোঝনি তোমরা। সবই মহামায়ার খেলা। মানুষকে চেতনা দেবার জন্যে মা জগন্ময়ী ষাঁড় সৃষ্টি করেছেন। যাদের মনে হাজারো পাপ জমা আছে. ষাঁড়ের গুঁতোয় তাদের গ্লানি কেটে যায়।"

নগেনের চেহারা নিটোল, চোখ ছোটো, নাকটা থ্যাবড়া। ভুঁড়ির ওপর বাঁ হাত রেখে ধীরে ধীরে কথা বলে।

বীরেশ লম্বা আর রোগা। হাসে কদাচিৎ। গলায় জোর আছে বেশ। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে।

নরহরির মাথায় চকচকে টাক। গলার আওয়াজটা খাটো, মোলায়েম। অপরের খেই ধরতে না-পারলে মুখ খোলে না তার। ঠোঁটের কোনে সব সময় মৃদু হাসির রেখা।

তাত্ত্বিক আলোচনা তিনজনেরই নিয়মিত অভ্যেস। সংস্কৃত শ্লোক, সাংখ্য-পাতঞ্জল জানা নেই কারুর। ইংরেজী আওড়ায় না তারা। তবুও ধর্মকথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারে। বুদ্ধিমত একে অপরের যুক্তি খণ্ডন করে, মাথা নাড়ে, শেষ পর্যন্ত রফা করে নেয়, নতুবা থেমে যায়। হার মানে না কেউ। একটা জিনিস নিয়ে

বেশিক্ষণ মতভেদের গুলতানি পাকায় না তারা। ঘন ঘন নজির দেখিয়ে যে যার সিদ্ধান্ত জানায়। আপোষ হয়ে গেলে প্রসঙ্গ পাল্টায়।

আলোচনার সময় নগেন বাঁ-হাতে নিজের পেট ধ'রে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে উদ্দিষ্ট লোকের পরিপাকাঙ্গ খোঁচাতে থাকে। শ্রোতার দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করার ভিন্নতর পন্থা রপ্ত নেই তার।

তর্কের আমেজে বীরেশ ঘন ঘন উভয় বাহু একসঙ্গে ওপরে তোলে। হাওয়া হাতড়িয়ে যুক্তি সংগ্রহ না করলে সে জুত পায় না।

একটানা কথায় নরহরিকে কাসতে হয়। দম পুরিয়ে নেয় খুক্ খুক্ আওয়াজে। তারই ফাঁকে সামনে, পাশে চোখ বুলিয়ে লক্ষ্য করে শুনিয়েদের।

বাদ-বিতণ্ডায় একসঙ্গে তিনজনই মশগুল হয়ে উঠলে নগেন ঘন ঘন আঙুল চালায়, বীরেশ অনবরত হাত ছুঁড়তে থাকে, নরহরি একটানা কাসতে আরম্ভ করে। আবার, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা উত্তেজনা দমন ক'রে ধাতস্থ হয়।

এমনিতে নগেন খোঁচা দিলে বীরেশ-নরহরি চটে না। বীরেশের হাত নাড়ায় নগেন-নরহরি ভয় পায় না। নরহরির কাসিতে নগেন-বীরেন বিরক্তি বোধ করে না। তিনজন একসঙ্গে চড়াগলায় গুরুর দোহাইও পাড়েনি এর আগে। সে দিন হঠাৎ যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেল।

ঘটনাচক্রের রীতিই আলাদা। কোথা থেকে কি হয়ে যায় ঠিক নেই।

নরহরির পেট খুঁচিয়ে নগেন বললো,

"বাবা জগদীশনাথের কাছে গেলেই বুঝবে ষাঁড়ের ইজ্জৎ কত।"

ঊর্ধ্ববাহু বীরেশ খেঁকিয়ে উঠলো, "বাবা-টাবার কম্ম নয়। প্রভু কিশোর ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়েছ কখনও? চোখ খুলবে কি ক'রে।"

কাসতে কাসতে নরহরি নিজের রায় দিল,

ম্যা ম্যা খক্ খক্ মেনকা খক্ মেনকা মার খক্ আশ্রমে খক্ খক্-ঘ্র ঘ্র-ঘ্র

—দমফাটা ঘড়ঘড়ানিতে বাকী কথাগুলো তার গলায় পাক খেতে লাগলো।

এরপর মাত্রা চড়তে আর কতক্ষণ!

দেখতে দেখতে গরম উঠলো চরমে। তিন বন্ধু ত্রিভুজাকারে দাঁড়িয়ে পড়লো। বাঁ হাতে বাজারের থলি বাগিয়ে ধ'রে, ডান হাতের আঙুল নিচু ক'রে নগেন হুঙ্কার ছাড়লো,

"আমার গুরু নরদেহেমহাদেব।"

হাত উঁচিয়ে বীরেশ হাঁক পাড়লো,

"প্রভু কিশোর ঠাকুর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর পায়ের যুগ্যি, নখের যুগ্যি কেউ আছে?"

গলার শির ফুলিয়ে একটানা প্রচণ্ড কাসির ফাঁকে ফাঁকে নরহরি আওড়াতে লাগলো অনেক কিছু—

"মেনকা মা আসল মহাশক্তি, সঙ্গে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা, মনসা সব।"

পাড়া সম্পর্কের 'তুমি' নেমে এল 'তুই'তে।

একজন দুজন ক'রে লোকও জমে গেল।

নগেন তেড়ে উঠলো

"তোরা ঠগবাজ।"

বীরেশ দাবড়ালো,

"তোরা জোচ্চোর।"

নরহরি জুড়ে দিল,

"তোরা মিথ্যাবাদী।"

বিতণ্ডার প্রথম পর্ব খতম হল ঠেলাঠেলিতে। ভীড় জমাট বাঁধছিল বেশ। ফাঁকে ফাঁকে গোটাকত বাচ্চা ছেলে চেঁচাচ্ছিল

হো হো ক'রে। দূর থেকে বোঝার উপায় ছিল না কি নিয়ে গোলমাল।

একটা কিছু হচ্ছে জানতে পারলে কজনই বা ধৈর্য রাখতে পারে। রাস্তায় মরা ইঁদুর দেখতে দর্শক জুটে যায়, পরস্পর প্রশ্ন করে। তিনটে লোকের চেঁচানি তার চেয়ে অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক, অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক।

সহজাত বিশ্লেষণ শক্তির গুণে বাজার-যাত্রীরা ধ'রে নেয়, দেখবার মত এবং শোনবার মত ব্যাপার একটা ফসকিয়ে যাচ্ছে। পেছনের সবাই এগিয়ে আসতে চায় সামনে। তার ফলে ধাক্কাধাক্কি।

নগেন হুমড়ি খেলো বীরেশের ওপর।

বীরেশ অমনি দু-হাত ছুঁড়লো সামনের দিকে।

জলভরা চোখে কাসতে কাসতে হাঁপাতে হাঁপাতে নরহরি তড়পাচ্ছিল, "মারবি নাকি? এত আস্পর্ধা! মার দেখি? গায়ে হাত তুললে কারুর রক্ষে থাকবে না, দেখে রাখিস।'

নরহরির আস্ফালন শেষ হতে-না-হতে বীরেশের একটা হাত এসে পড়লো তার মুখের ওপর। "উঁ" ব'লে সে ঠোঁট চেপে ধরলো। ওপরের ঠোঁটটা কেটে গিয়েছিল। হাতে রক্তের দাগ দেখেই সে শুরু করলো আর্তনাদ, "ওরে বাবারে! মেরে ফেল্লে রে! খুন করেছে! কে কোথায় আছ। বাঁচাও, বাঁচাও!"

অদ্ভুত কাণ্ড ঘ'টে যায় সঙ্গে সঙ্গে। চারদিক থেকে ওঠে বারোয়ারী বীরদর্পের আওয়াজ "খুনে খুনে······চোর চোর·········গুণ্ডা, গুণ্ডা·······পকেট থেকে টাকা তুলছিল····আমি নিজের চোখে দেখেছি ·········রাহাজানি········বাটপাড়ি·······পুরোনো পাপী·········দাগী······· ঘুঘু·······ও মশাই! দেখুন না ভাল ক'রে·······সঙ্গে ছোরা-টোরা আছে নিশ্চয়·······আরও কতবার এরকম করেছে·······পুলিশ পুলিশ! ·······পুলিশ কি করবে? ক'ষে দু-ঘা দাও········মারের চোটে ভূত ছাড়বে···········"

দশজন পিছু হটে ভয়ে। বিশজন তেড়ে আসে উত্তেজনায়।

তারপর সক্রিয় কলরব। চটপট, ধুপধাপ শব্দ একটানা। চারদিক ঘিরে চক্রব্যূহ। মাঝখানে নগেন, বীরেশ, নরহরি।

নগেনের আর্তরব শোনা যায়—‘

‘জোড় হাত করছি, ছেড়ে দিন আমাকে।’

মিলিত কণ্ঠে হুঙ্কার ওঠে,

“গুঁতোর চোটে সবাই ওরকম মাপ চায়।”

বীরেশের নালিশ হাওয়ায় ভাসে,

“শুধু শুধু মারছেন সবাই।”

তার আওয়াজ চাপা পড়ে পাল্টা গর্জনে,

“ওঃ! আবার চোখ রাঙানি? দাঁত কটা ভেঙে দিলেই মুখ বন্ধ হবে। মস্তানির জায়গা পাওনি?”

নরহরি কাঁদে ভেউ ভেউ ক’রে—

“বিশ্বাস করুন, আমার কোনও দোষ নেই।”

জনতার ভেতর থেকে উৎকট জবাব আসে,

“আবার মড়াকান্না....ন্যাকামি..........ঢঙ্ দেখাচ্ছে রে! জোরসে মেরামত কর।”

দুর্বলের দিকে দাঁড়াবার মানুষও দু-চারটে গজাতে থাকে। দঙ্গলের মধ্যে এটা অস্বাভাবিক নয়। বীরধর্মের অনুপ্রেরণা, বাহাদুরি দেখাবার অভিলাষ প্রকৃতিগত মানবিক গুণ। নিজেকে জাহির করার জন্যে কত লোকের অবচেতন মন এই জাতীয় সুযোগ খোঁজে।

কাজেই, একতরফা আবহাওয়া হয়ে উঠলো দোতরফা। নগেন-বীরেশ-নরহরির পক্ষ নিয়ে এগিয়ে এল বেশ কয়েকজন। হাতাহাতিটাও চারিয়ে গেল।

এরপর বড়জোর আধঘণ্টা। বাজার লণ্ডভণ্ড, দোকান-পাট লুট, গাড়ি চলাচল বন্ধ। ছাতে ছাতে মেয়েরা দাঁড়িয়ে যায়, রাস্তা দিয়ে কেউ দৌড়োয় মাছ বাগাতে বাগাতে, কেউ ছোটে লাউ কুমড়ো বেগুন

হাতে নিয়ে। কারুর মাথায় গুড়ের নাগরি, কারুর কাঁধে আলুর ঝুড়ি। তেলের ক্যানেস্তারা, ঘীয়ের টিন, ময়দা-আটা-ডালের বস্তাও পাচার হয় একে একে।

একদিকে লাভযোগ, আর একদিকে মুষ্টিযোগ-চড়-চাপড় খতম হয়ে ইট পাটকেল, সোডার বোতল চলতে থাকে বেপরোয়া। কে কাকে তাগ করছে ঠিক নেই। একদল তাড়া করে তো আর একদল দৌড় দেয়। পটকা ফাটে গোটা কত।

ক্রমে হাজির হয় পুলিশ, দমকল, য়্যাম্বুলেন্স। দাঙ্গা থামে বেমালুম। বাজার আর রাস্তা থেকে সবাই ভেগে পড়ে চোখের নিমিষে।

শুধু গলি কটার মুখে মুখে উৎসাহী দর্শকেরা দাঁড়িয়ে যায়। পুলিশ ধাওয়া করলে পেছন ফিরে ছুট মারে তারা, সরলে আবার জমা হয় আস্তে আস্তে।

এই রকমের লুকোচুরি চললো খানিকক্ষণ।

এম্বুলেন্স চ'লে গেল কয়েকজন আহতকে নিয়ে। দমকলের লোকেরা দাঁড়িয়েছিল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা গলি থেকে বেরিয়ে এল সেই ষাঁড়, যাকে উপলক্ষ্য ক'রে এত হাঙ্গামা। দমকল-বাহিনী ঘিরে ধরলো জীবটিকে। সে কিন্তু গ্রাহ্য করলো না কিছুই। শিং নেড়ে গদাই-লস্করি চালে এগুতে লাগলো। তাকে আর না-ঘাঁটিয়ে দমকলওয়ালারা গাড়িতে উঠলো।

একটা জমাদারকে বাজারের সামনে রেখে দমকলের পেছনে পুলিশ-কর্মচারীও স'রে পড়লেন সদলে।

ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজে মেটে না। বাজারের দাঙ্গা-কাহিনী ছড়িয়ে যায় শহরে। অগুণতি লোক নতুন উত্তেজনায় মাতে। আনুষঙ্গিকও জুটতে থাকে।

সব জায়গায় কথা কাটাকাটি শুরু হয়। পাড়ায় পাড়ায় হাঙ্গামা বাধে। এ বাড়ির মেয়েরা ও বাড়ির দিকে চেয়ে ভেঙচি কাটে। ও

বাড়ির ঘরণী-ভগিনীরা এ বাড়ি লক্ষ্য ক'রে থুতু ফেলে। এ মহল্লার বাসিন্দা ও মহল্লার লোককে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে গাল পাড়ে। এক পরিবারের কর্তা আর এক পরিবারের মুরুব্বিকে সামনে পেলে নাক সিঁটকোয়। প্রতিবেশীর ঈর্ষা, পল্লীগত রেষারেষি বেপরোয়া ভাবে ফলাও হতে থাকে।

বাসে, ট্রামে অনবরত কুরুক্ষেত্র। যাত্রীরা সব সময় মারমুখো। সিনেমা ভাঙলে হাতাহাতি আরম্ভ হয়।

হাজারো খবর রটে।

সার্বজনীন অসহযোগ-উষ্মা-জিঘাংসার নাগপাশে আটক পড়ে সবাই। স্ত্রী-পুরুষ-বৃদ্ধ-প্রৌঢ়—বাদ যায় না কেউ।

বাবা জগদীশনাথ, প্রভু কিশোর ঠাকুর আর মেনকা মার ভক্তেরা এক জায়গায় ত্র্যহস্পর্শ ঘটালেই রক্তারক্তি। তা-ছাড়াও নামকরা-অনামী-নির্বিশেষে মহারাজ-স্বামী-বাবাজী-ঠাকরুণদের চেলা-চামুণ্ডারা যে যেখানে পারে, ঝাল মেটায়।

অফিসে বড়বাবু ছোটবাবুকে ডাকেন শ্বশুর-পুত্র সম্বোধনে। ছোটবাবু সাড়া দেন দোয়াত ছুঁড়ে।

বড় কোতোয়াল ছোট কোতোয়ালকে চাকরি খেয়ে দেবার ভয় দেখান। ছোটো কোতোয়াল তাঁর দিকে দৌড়োন লাঠি নিয়ে।

মহাজন-মজুতদার, উকিল-মোক্তার, অধ্যাপক-শিক্ষক, গায়ক-বাদক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, দোকানি-পসারী—সবার মাথা গরম, সবার মেজাজ দিনরাত চড়া সুরে বাঁধা। সামনে লোক পেলে কড়া বুলি। তারপর গালাগালি। সামান্য সুযোগেই থাবড়া থাবড়ি, চুলোচুলি। ভাল মত জ'মে উঠলে মাথা ফাটাফাটি। গুরু, মুরুব্বি, মোড়ল, নেতা আছে অনেকের। যাদের নেই, তারাও ভিড়ে পড়ে গোলমালে। নিন্দে হোক, প্রশংসা হোক, ভাল হোক, মন্দ হোক—কেউ কারুর কথা বরদাস্ত করে না।

বাবা জগদীশনাথের ডেরায় কাঞ্চন-গৌরীবালা আসে না একদম। বদ্রিনাথ-বিশ্বনাথ গা ঢাকা দেয়।

যমুনা-ধামে কুন্তলারা উধাও হয়। হরু-টুনুদের পাত্তা মেলে না।

মেনকা মার আশ্রম খাঁ খাঁ করে। বীরু-প্রমুখেরা নিখোঁজ হয়।

বাবা জগদীশনাথের ডেরায় একদিন বড় রকমের হামলা হল। মেনকা মার উত্তেজিত ভক্ত-চমূ আর প্রভু কিশোর ঠাকুরের চেলারা এসেছিল ডাণ্ডা-শাবল-গাঁইতি নিয়ে। আস্ফালনে সাড়া পেল না তারা। দরজার ওপর লাথি চালাতে আরম্ভ করলো দু-চারজন। বাবা জগদীশনাথ সাহসী। দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ঝাঁকড়া চুল, চোখ জোড়া জবাফুলের মতো লাল। পরণে ল্যাঙট, ডান হাতে বড় বোতল একটা, বাঁ হাতে ত্রিশূল। মোটা আওয়াজ সপ্তমে চড়িয়ে বললেন,

"পালা সব। বোতলে য়্যাসিড ভর্ত্তি—ছিটিয়ে দোবো গায়ে। ত্রিশূল ছুঁড়বো।"

ভয় পেয়ে কিশোর ঠাকুরের চেলারা পিছিয়ে গেল, মেনকা মার ভক্তেরা সদর ছাড়লো। দু-দলের মধ্যে তর্কও বাধলো। এক পক্ষ চেঁচাতে লাগলো, "তোমরা আগে গিয়ে দরজায় শাবল মারো।" আর এক পক্ষ পাল্টা জবাব দিচ্ছিল, "তোমরা এগিয়ে যাও, আমরা পেছন দিকটা সামলাচ্ছি।"

কিন্তু পিছু হঠলো সবাই।

রাস্তা জনশূন্য হলে বাবা জগদীশনাথ বারান্দা ছাড়লেন।

যমুনা-ধামে ডিল পড়ছিল কদিন ধ'রে। সমস্ত জানলা-কপাট বন্ধ ক'রে রেখেছিলেন প্রভু কিশোর ঠাকুর। বাইরে, ভেতরে ইট পাটকেলের স্তূপ জ'মে উঠলেও তিনি টুঁ-শব্দ করেন নি, ঘর থেকে বেরোননি। হানাদারেরা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের পরীক্ষায় হার মানে।

কিন্তু, তাদের সাড়া না-পেলেও প্রভু কিশোর ঠাকুর দরজা জানালা খোলেননি। টর্চ হাতে ছাতা মাথায় দিয়ে রাতের অন্ধকারে পা টিপে টিপে একবার একতলায় নামেন সদরটা দেখবার জন্যে।

প্রভু কিশোর ঠাকুরের দল মেনকা মার আশ্রমে পিকেটিং শুরু করেছিল। সার দিয়ে ভলান্টিয়ার দাঁড়িয়ে থাকতো। কাউকে আশ্রমের দিকে আসতে দেখলে মানা করতো। মেনকা মার অনুগৃহীতেরা তাতে নিরস্ত না হলে ভয়ও দেখাতো।

এর সঙ্গে আশ্রমের চারদিক ঢেকে গিয়েছিল পোষ্টারে। নানা রকমের ছবি-ছড়ায় ভর্তি সেগুলো।

গোড়ার দিকে পিকেটিংকারীরা বাইরের ফটক ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করতো না। একঘেয়েমিতে শেষ পর্যন্ত তাদের সাহস বেড়ে গেল। একদিন ফটক টপকিয়ে কয়েকজন ভেতরের খালি জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। তারা হয়তো আরও কিছু করতো। কিন্তু হঠাৎ তাজ্জব ব'নে গেল হানাদারেরা। মুক্তকেশী মেনকা মা খাঁড়া হাতে "রক্ত চাই, রক্ত চাই" বলতে বলতে ছুটে বেরুলেন সদর খুলে। তাঁর-দু-পাশে দুই য়্যালশেশিয়ান ঘেউ ঘেউ করছিল।

পলকের মধ্যে সবাই চম্পট দিল। বাইরে-মুখো লাফে কারুর কাপড় ছিঁড়লো, কারুর জুতো রয়ে গেল, কেউ হোঁচট খেয়ে পড়লো।

.

বাবা জগদীশনাথের ডেরায় সেবার শিবরাত্রি হল না।

যমুনা-ধামে প্রভু কিশোর ঠাকুর ঝুলনোৎসব পালন করলেন একা একা।

দীপান্বিতা অমাবস্যায় মেনকা মা ধ্যানস্থা রইলেন জনহীন আশ্রমে।

মাতামাতি, লাঠালাঠিরও উঠতি-পড়তি আছে। সব রকমের উত্তেজনাই চরমে উঠে ক্রমে কমতে থাকে।

শহরের দঙ্গল-হাঙ্গামার আস্তে আস্তে ভাঁটার টান দেখা দিল। শহরতলি, মফঃস্বলের দাপাদাপিও ঠাণ্ডা হয়ে এল। মাঝে-মধ্যে এখানে ওখানে গোলমাল বাধলে পাঁচজনে থামিয়ে দিত। জনতার কৌতূহল কমে গেল। হুল্লোড়বাজরা ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

আট

ভর দুপুরে অদ্ভুত ঘটনা।

জম-জমাটি ভীড়ের মরসুমে পর্যন্ত মেনকা মার আশ্রমে ডাকাডাকির রেওয়াজ ছিল না একদম। কড়া নাড়ার পাট নেই এ বাড়িতে। সদর খোলা না-দেখলে কলিং বেল টেপার নিয়ম। হাঙ্গামার বাজারে কেউ আসে না। বাইরের ফটকে জোড়া তালা লাগানো, ভেতরের সদর বন্ধ। তাই, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয় একটানা কড়া নাড়ার আওয়াজে মেনকা মা কান খাড়া করলেন, জোড়া কুকুর ডেকে উঠলো।

ফটক না-টপকালে ভেতরে আসা অসম্ভব, কে এল, কেন এল, হাঙ্গামা বাধাবে নাকি ইত্যাদি প্রশ্ন চকিতে মাথায় খেলে গেল। মেনকা মা কড়ার আওয়াজ শুনতে লাগলেন।

মিনিটের পর মিনিট কড়া নড়তে থাকে। তার মধ্যে কোনও অভদ্রতা, কোনও বেয়াদবির পরিচয় নেই। খানিকক্ষণ খুট্‌খুট্ শব্দ, সামান্য বিরতি, তারপর আবার খুট্‌খুট্।

মেনকা মা বুঝলেন, লোকটা নাছোড়বান্দা। কুকুর দুটো চেঁচাচ্ছিল। তাদের থামিয়ে দোতলায় সদরের ঠিক ওপরে বন্ধ জানলার পেছনে দাঁড়ালেন তিনি। খড়খড়িটা আস্তে আস্তে তুলে, সামনে, দুপাশে নজর চালিয়ে কাউকে দেখা গেল না। বাগানে কেউ নেই। যে এসেছে, সে নিশ্চয়ই একা।

নিঃশব্দে জানলা খুলে দুটো শিকের মাঝে মাথা লাগিয়ে, মুখ ঝুঁকিয়ে নিচের দিকে চাইলেন মেনকা মা। আগন্তুককে ভাল ক'রে দেখতে পেলেন। লম্বা-চওড়া। দরজা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। আগে কোনওদিন এসেছে ব'লে মনে পড়লো না। গায়ে লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি। ভেতরের গেঞ্জি আবছা দেখা যাচ্ছে। ডান হাতের তাবিজ ফুটে উঠেছে হাতার ভেতরে। ঢিলে পায়জামা

নেমেছে গোড়ালি পর্যন্ত। মুখে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ। একমাথা কালো কুচ্‌কুচে চুলের খানিকটা ঢাকা পড়েছে আলগা শালের টুপিতে। চোখে চামড়া-ঘেরা কালো কাঁচের চশমা। পায়ে সাদা চামড়ার নাগরা। বাঁ হাতে ছড়ি—ওপরটা তার রূপো দিয়ে বাঁধানো। ডান হাতে রূপোর মস্ত বড় বই-প্যাটার্ণের ডিবে। ছড়ি বগলে ধ'রে ভদ্রলোক ডিবে থেকে দুটো পান নিয়ে মুখে পুরলেন, পকেট থেকে রূপোর কৌটো বার ক'রে দু আঙ্‌লে বড় একটিপ জর্দা ফেললেন দু-ঠোঁটের ফাঁকে। জর্দার কৌটো পকেটে রেখে ডিবেটা খুললেন আবার। তার ভেতরে একধারে একটা খোপে চূণ ছিল। তর্জনীর ডগায় খানিকটা চূণ তুলে জিভে দিলেন। তারপর সদরের একপাশে পচ ক'রে পিচ ফেলে কড়া নাড়লেন আর একবার।

পরিচয় আন্দাজ করতে না-পেরে মেনকা মা খুঁটিয়ে দেখছিলেন নবাগতকে। ডান দিককার পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বার ক'রে ঠোঁট মুছে ভদ্রলোক ওপরের দিকে চাইলেন।

এবার উভয়ের চোখাচোখি।

"দরজাটা খুলুন না"

—কর্কশ কণ্ঠস্বরে ষোল আনা বিনয়ের আমেজ ফুটে উঠলো।

কোনও ব্যগ্রতা না দেখিয়ে মেনকা মা জিজ্ঞেস করলেন,

"কি চাই আপনার? কাকে চাই?"

"মানে আপনার সঙ্গে কথার দরকার। বড্ড জরুরী"—

জবাবটা বেশ নম্র।

"দাঁড়ান" ব'লে মেনকা মা জানলা থেকে স'রে গেলেন।

খানিকটা বাদে সদর অর্গলমুক্ত হল।

ডাইনে, বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে চারদিক দেখে নিয়ে পাঞ্জাবি-পায়জামাদুরস্ত আগন্তুক ঢুকলেন ভেতরে।

আহ্বান এল, "ওপরে চলুন।"

ভারী ঘেউ ঘেউ শব্দ আসছিল সিঁড়ির মাথা থেকে।

মেনকা মার অনুসরণ ক'রে সিঁড়ি পেরিয়ে নবাগত ঢুকলেন গিয়ে দোতলার বড় ঘরে। বারান্দায় রেলিঙের সঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধা বিশালাকৃতি জোড়া য়্যালসেটিয়ান ল্যাজ নাড়ছিল।

ভদ্রলোক টুপি-চশমা খুলতে খুলতে মন্তব্য করলেন,

"বেশ কুকুর আপনার।"

"পরিচয়টা পাইনি এখনও।"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আগন্তুক নিজের পরিচয় দিলেন।

মেনকা মা অবাক হলেন না একটুও। তবু বিস্ময়ের ভান করলেন,

"ওমা! এতক্ষণ জানতে পারিনি! যেমন কপাল আমার। এমন দিনে এলেন যে, সামান্য ভদ্রতা করবারও উপায় নেই।"

কুকুর দুটো চেঁচিয়ে উঠলো পাল্লা দিয়ে। বাইরে গিয়ে মেনকা মা তাদের নিরস্ত ক'রে এলেন।

অতিথি ততক্ষণে চেয়ারে আশ্রয় নিয়েছেন।

মেনকা মা এসে বসলেন সামনের সোফায়।

ভদ্রলোক নাকের মাথাটি ঘষছিলেন বুড়ো আঙুল দিয়ে।

মেনকা মা সংক্ষেপে নিজের হেনস্তা শোনালেন—

"বাড়িতে আমি একা। সঙ্গী শুধু ওরা। দই-মাংস না-হলে চলে না ওদের। আমি রোজ চালে-ডালে ফুটিয়ে নিচ্ছি। ওদের ডাল রোচে না, ঘি রোচে না। টিনের দুধ দি-ই, টিনের মাছ-মাংস দি-ই। তাতেও মন ওঠে না। পেট ভ'রে খায় না। অত ডাকছে ক্ষিধের জ্বালায়।"

"মানে, তাতো হবেই। অবোলা জীব। আমার অবস্থাও আপনার মত। সবাই স'রে পড়েছে। মানে, উনুন ধরাতে জানি না, রেঁধে খাওয়ার অভ্যেস নেই। প্রথম প্রথম ছোলা, মটর, মুগ ভিজিয়ে চালিয়েছি। তারপর স্রেফ সরবৎ। মানে, শেষতক ভোল পাল্টিয়ে রাস্তায় বেরুচ্ছি। দু-বেলার মত পুরি, কচুরি, সিঙ্গাড়া, ফল, মিষ্টি, দই, রাবড়ি, যা পারি নিয়ে ফিরি।"

ভদ্রলোক কথার শেষে ফোঁস ক'রে নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

"যাক। তাহলে ভাল রকমের ফন্দার চালাচ্ছেন। এরকম হবে, ভেবেছিলেন কোনওদিন ?"

প্রশ্ন শুনে চুপ ক'রে রইলেন আগন্তুক। মেনকা মা আবার শুধোলেন—

"বলুন ? ভেবেছিলেন কখনও ?"

ভদ্রলোক এবার উত্তর করলেন,

"কি ক'রে ভাববো। মানে, বেয়াড়া সব কাণ্ড ঘ'টে গেল।"

মেনকা মা অতিথির কথা কেড়ে নিলেন—

"তা না-হলে আপনি, বাবা জগদীশনাথ আর আমি, মেনকা মা একসঙ্গে নির্জনে এরকম আলাপও করতাম না।"

"মানে, সবই নসীবের খেলা। আমি নসীবটাকে বড্ড মানি।"

"নসীবের ধাক্কায় ফটক ডিঙিয়েছেন।"

মেনকা মার মুখে ফুটে ওঠে চপল হাসি। সেটা লক্ষ্য না-ক'রেই ভদ্রলোক কৈফিয়ৎ দেন—

"মানে, কি করবো। সদর বন্ধ, ফটকে তালা। চেঁচিয়ে লাভ হবে না। মানে, ফটক ছাড়িয়ে এগুলে তবে কড়া নাড়তে পারবো। তাই চট ক'রে পার হলাম।"

"চোট-টোট লাগেনি তো ?"

"এ শর্মা গাছে চড়তে পারে। মানে, ফটক তো সামান্য জিনিস।"

আগন্তুক বুক ঠুকলেন একবার।

মেনকা মা তারিফ করলেন,

"ধন্যি মানুষ।"

এর পরে দুজনে আলাপ চললো অনেকক্ষণ ধ'রে।

"মানে, আজ তবে আসি", ব'লে করযোড়ে নমস্কার জানিয়ে বাবা জগদীশনাথ চেয়ার ছাড়লেন সন্ধ্যে নাগাৎ। মেনকা মা তাঁকে এগিয়ে দিলেন সদর অবধি।

নয়

সন্ধ্যের আঁধারে এক ভদ্র-মহিলা যমুনা-ধামের সদরে দাঁড়িয়ে কলিং-বেলের সুইচ খুঁজছিলেন। সঙ্গে কেউ নেই। পরণে তাঁর জর্জেট শাড়ি, মুখে রঙের অবলেপ, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, বাঁ-কব্জিতে জড়োয়া ব্রেসলেটের মাঝখানে রিষ্ট-ওয়াচ বসানো, পায়ে জরিদার চটি। মৃদু সেন্টের গন্ধ তাঁকে ঘিরে। মাথায় কাপড় নেই। বেণী-বন্ধন বয়সের সঙ্গে বেমানান।

দেওয়ালে হাত চালাতে চালাতে কলিং-বেলের সুইচ পেয়ে টিপলেন—একবার, দুবার, তিনবার। হাত নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন একটু। আর একবার বেল-এ আঙুল রাখলেন বেশ খানিকক্ষণ। ভেতরে আগে জুতোর ক্ষীণ খশ-খশানি, তারপর খিল নামানোর আওয়াজ। সুট-পরা, হ্যাট-মাথায়, সুদর্শন, বেঁটে-খাটো এক যুবক দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালেন।

আপাদমস্তক তাঁকে দেখে নিয়ে মহিলাটি বললেন, "আমি এসে-ছিলাম প্রভু কিশোর ঠাকুরের খোঁজে। বিশেষ জরুরী খবর আছে একটা। তাঁকে ছাড়া আর........"

"আমার কাছেই তাহলে খবরটা বেফাঁস করুন।"

—যুবক হাসতে লাগলেন।

ভদ্রমহিলা বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—

"তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না, তাহলে?"

"তিনি ছাড়া যমুনা-ধামে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। মারামারির হিড়িকে সবাই পলাতক।

"আপনিই তিনি?"

"আমিই আদি ও অকৃত্রিম প্রভু কিশোর ঠাকুর। দ্বাপরে যিনি বনমালী পীতাম্বর ছিলেন, কলিকালে তাঁর হকদার যদি দায়ে প'ড়ে হ্যাট-কোট-টাই-প্যান্ট পরেন, তাতে দোষ কি? কলির

নারদ গীটার বাজান, বেদব্যাস চুরুট ফোঁকেন, অর্জুন বন্দুক ছোঁড়েন, ভীমসেন বারবেল ভাঁজেন। এটা যুগের ধর্ম। বাইরের খোলস পালটায় স্থান-কাল-ভেদে। পাত্র ঠিকই থাকে।”

“বাব্বা! বক্তৃতা কি তৈরিই ছিল?”

“না-থেকে উপায় কি? পুরোনো চেলা-চেলীরা কেউ এদিক মাড়ায় না। বাবা জগদীশনাথের ভক্তরা, মেনকা মার দলবল এসে চেঁচাতো, ইঁট ছুঁড়তো, দরজায় লাথি চালাতো। কয়েক হপ্তা তাদের সাড়া পাচ্ছি না। কেতা-মাফিক কলিং-বেলের আওয়াজ শুনে ছাত থেকে দেখে নিলাম। অবলার কাছে ভয়ের কিছু নেই। বেরুতেও হবে। সাজগোজ হয়ে গিয়েছিল। আর একটু দেরিতে এলে দেখা পেতেন না।”

“আমার নাম-ধাম তো জিজ্ঞেস করলেন না?”

“কিছুটা মালুম বেশ-ভূষায়। তা ছাড়া, প্রভু কিশোর ঠাকুরের কাছে এসেছেন, বিশেষ খবর দেবেন। সুতরাং, ভূমিকাটা আমিই শেষ করলাম।........আপনি যে আমার দরদী, সেটা বুঝেছি।”

“আঃ, ভণিতা ছাড়ুন তো! সদরে দাঁড়িয়ে একেবারে মহাভারত আওড়াচ্ছেন। যদি কেউ আসে? চলুন ভেতরে গিয়ে বসি।”

“জনপ্রাণী যমুনা-ধামের ছায়া মাড়ায় না আজকাল। বয়কটের পালা চলছে, চলবেও। ভাবছিলাম, যদি ধুলো-পায়েই বিদেয় নেন। বুঝতে পারছেন সবই। ব'সে ব'সে, শুয়ে, হাই তুলে, ঘুমিয়ে সময় কাটে না। কথা বলার সুযোগ মেলে না, তাই, বেশি বকছি। যাই হোক, পরিচয় জানার কৌতূহল হচ্ছে এখন। ঠিকানাটা পরে হলেও চলবে। নামটা শুনতে পাব কি?”

“আমি, আমি মেনকা, মানে, আমি মেনকা মা।”

“বলেন কি? স্বয়ং মহাশক্তি এখানে আধুনিকার বেশে হাজির!”

“স্থান-কালের কথা শোনালেন যে এখুনি?”

“ও। সেইজন্যে মজা দেখতে এসেছেন।”

"আজ্ঞে না-আ-আ।"

"তবে কি সন্ধির প্রস্তাব?"

"এখান থেকেই তাড়াতে চান?"

"ছিঃ"

—প্রভু কিশোর ঠাকুর জিভ কাটলেন, মাথা নাড়লেন। তারপর মেনকা মাকে স্বাগত জানালেন,

"চলুন। একেবারে তিনতলায়। নিজের বাড়ি মনে করবেন।"

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মেনকা মা মন্তব্য করলেন।

"বড্ড নোংরা।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ৎ দিলেন,

"লোকজন নেই। সাফ করবে কে। আর, দরকারই বা কি।"

কুঞ্জগৃহে হাজির হয়ে প্রভু আলো জ্বালালেন, এয়ার-কণ্ডিশনার চালালেন। মেনকা মা চোখ বোলাতে লাগলেন সব দিকে। খাটের ধারে দাঁড়িয়ে প্রভু বললেন,

"আসুন, এখানেই বসি। চেয়ার-টেয়ার সব বাইরে।"

"তাতে আর কি হয়েছে। চেয়ার যা, খাটও তা"—

মেনকা মা মুখের কথা শেষ করলেন একেবারে খাটের ওপর দুপা তুলে, বাজুতে হেলান দিয়ে। চটি-জোড়া রইলো মেঝের ওপর। জুতো খুলে উল্টো দিকে নিজের জায়গা নিয়ে প্রভু কিশোর ঠাকুর শুরু করলেন সলজ্জ নিবেদন—

"চায়ের পাট শুদ্ধু উঠে গেছে।"

মেনকা মা প্রবোধ দিলেন তাঁকে,

"আমার ওখানেও হরি-মটরের ব্যবস্থা।"

পকেট থেকে রুমাল নিয়ে হাতে জড়াতে জড়াতে প্রভু বারবার আয়নার দিকে চাইছিলেন। দু-একবার আয়নার মধ্যে মেনকা মার চোখে চোখ পড়লো। এই ভাবেই আলাপ জ'মে উঠলো।

হাঁটু দোলাতে দোলাতে মেনকা মা প্রভুর জবানি হজম করতে লাগলেন।

কথার তোড়ে প্রভু কিশোর ঠাকুর টেক্কা দিলেন আগাগোড়া। মেনকা মা নিবিষ্ট মনে তীক্ষ্ণ চোখে শুনলেন যথেষ্ট, বললেন কম।

হঠাৎ রিষ্ট-ওয়াচ নজর ক'রে প্রভু একেবারে নেমে দাঁড়ালেন।

মেনকা মা শুধোলেন,

"কি হল?"

"কি আর হবে। আর নয়। এবার না-বেরুলে উপায় নেই।"

নিজের ঘড়ি দেখে মেনকা মা-ও খাট ছাড়লেন।

"এঃ। রাত একেবারে দশটা। বুঝতেই পারিনি"—

মেনকা মার কথায় ছিল আলস্যের আমেজ। প্রভুর মুখে চোখে ব্যস্ততার লক্ষণ।

জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে প্রভু বললেন,

"আমার তো না-বুঝে উপায় নেই।"

"এখন তাহলে কদ্দূর?"

"হোটেল বন্ধ হয় সাড়ে দশটায়। রাতের খাওয়া সারতে হবে, দিনের রেস্তো আনতে হবে। এখান থেকে রিক্সায় মিনিট কুড়ির রাস্তা। আপনাকে এগিয়ে দিয়ে সিধে যাব হোটেলে।"

"আপনার হোটেল আছে। বাবা জগদীশনাথ তোফা কচুরি-সিঙ্গাড়া-দই-সন্দেশ-রসগোল্লা-রাবড়ি চালাচ্ছেন।"

"আপনি কি করছেন?"

"হাজার হোক, আমি মেয়েমানুষ। বাড়িতে চাল-ডাল-মশলা-ঘি-নুন-তেল-আলু-পেঁয়াজ ছিল যথেষ্ট। টিনে প্যাক করা মাছ-মাংস, জমাট দুধও যোগাড় করেছিলাম অনেক কষ্টে। সব ফুরিয়ে যাবার পর বেরুতে আরম্ভ করি। হগ মার্কেটে কিনছি আজকাল। ইলেকট্রিক কুকারে রেঁধে নি-ই।"

"এখন গিয়ে রাঁধবেন?"

"না। রাতের রান্না সারি বিকেলে। সন্ধ্যের আগে বার-মুখো হইনা।"

"রাত্তিরে ভাল কোনও রেষ্টুরেণ্টে খেতে পারেন।"

"ছুটো কুকুর আছে আমার। তা-ছাড়া, মেয়েছেলে। রোজ রোজ হোটেল-রেষ্টুরেণ্টে ঢুকলে কে কখন পিছু নেবে, ঠিক কি।"

"ভয়ও আছে দেখছি।"

"ভয়-ডরের ধার ধারি না। কিন্তু, আশ্রম পর্যন্ত ধাওয়া ক'রে কেউ পরিচয়টা জানতে পারলেই বিপদ।'

"চলুন এবার। আর পঁচিশ মিনিট মেয়াদ আছে।"

দশ

অল্পদিনের মধ্যেই বাবা জগদীশনাথ, মেনকা মা, প্রভু কিশোর ঠাকুরকে নিয়ে সুন্দরকাণ্ড শুরু হয়ে গেল। সাধারণ জনশ্রুতিকে হার মানিয়ে দৈবী সুসমাচার ছড়ালো হাওয়ার আগে।

হৈ-হৈ কাণ্ড, রৈ-রৈ ব্যাপার! শহর তোলপাড়! বাজার-হাট, দোকান-পাট, রাস্তা-ঘাট, খেলার-মাঠ, রোয়াক-বারান্দা, ট্রাম-বাস গুলজার! মহাদেব-মহাশক্তি-বিষ্ণুর নতুন কৃপা! নরদেহে আবির্ভূত তিনজন একযোগে ভূ-ভার হরণের দায়িত্ব নিয়েছেন! বাবা জগদীশনাথ, মেনকা মা, প্রভু কিশোর ঠাকুর মিলিত হয়েছেন মানুষের কল্যাণ-কামনায়! তিনজনে এক সঙ্গে দর্শন দেবেন!

পোষ্টারে পোষ্টারে ছয়লাপ। হাতে হাতে রং-বেরঙের হ্যাণ্ডবিল। তিনজনের বাণী ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে, মহল্লায় মহল্লায়।

লোকের মুখে শুধু এক কথা, এক প্রসঙ্গ।

বাঁ হাত নিজের পেটে বোলাতে বোলাতে নগেন একগাল হেসে ডান হাতের আঙুল দিয়ে বীরেশের পেটে খোঁচা মারে। বীরেশ একটুও চটে না। নগেন সম্ভাষণ জানায়—

"আর তাহলে ভাবনা নেই!"

আধবোজা চোখ টানতে টানতে দু-হাত ওপরে তুলে বীরেশ বলে নরহরিকে—

"আসলে তো তিনজনেই এক—ভগবানের তিনটে রূপ। যিনি হর, তিনি হরি। যিনি কালা, তিনিই কালী।"

খুশীভরা মুখে ছোট্ট কাসির সঙ্গে নরহরি উপদেশ দেয় নগেনকে—

"বুঝলে ভায়া, সবই দেবদেবীর লীলা। তুমি-আমি ধরতে পারি না। চোখে ঠুলি নিয়ে ঘুরে মরছি সবাই।"

বাসে ঝুলতে ঝুলতে এক যাত্রী আর এক যাত্রীকে আপ্যায়িত করে,

"খবর শুনেছেন তো? তিনজনে এক হয়ে গেছেন!"

পকেটের হাত আলগা ক'রে শ্রোতা সাড়া দেয়,

"ভাবছি, তিনজনকে একদিন দর্শন ক'রে আসবো।"

পড়শীরা তিন বেলা বলাবলি করে,

"আমরা মহাপাপী। চিনতে পারি না, বুঝতে জানি না।"

পোষ্টারের ওপর পোষ্টার পড়লো। নতুন কিস্তির হ্যাণ্ডবিল বেরুলো। তিনজনে প্রথম চার মাস কাটাবেন মেনকা মার আশ্রমে, দ্বিতীয় চার মাস প্রভু কিশোর ঠাকুরের যমুনা-ধামে, তার পরের চার মাস বারা জগদীশনাথের ডেরায়। এই ভাবে বছর ঘুরলে হবে প্রথম বাৎসরিক মহামিলনোৎসব। সবার মুখে এক কথা, সব জায়গায় এক সমাচার—"সহাবস্থানের যুগ আরম্ভ হয়েছে। মহাদেব, মহাশক্তি, বিষ্ণুর সহাবস্থানে দুনিয়া রক্ষে পাবে।"

কেউ কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করলো মাথা নেড়ে, "তিনজনের জোট-মাহাত্ম্যে অনেক অঘটন ঘটবে। দেখে নিয়ো সবাই।"

* * *

সহাবস্থান শুরু হল ঠিকমত। মেনকা মার আশ্রমে তিনজন তিন কামরায় থাকেন। বিকেল থেকে শুরু হয় দর্শন-দান। দোতলার বড় ঘরে তিনজন পাশাপাশি তিনখানা ছোট কৌচে বসেন। ভক্তেরা আসে দলে দলে। নিচতলায়, বাইরে, রাস্তায় লোক জমে কাতারে কাতারে। ভীড়ের চাপ সামলায় ব্যাজ-আঁটা ডজন ডজন ভলান্টিয়ার। প্রণামী ইত্যাদি আলাদা আলাদা জমা ক'রে হিসেব রাখতে চেলারা হিমসিম খেয়ে যায়। ভাগ কারুরই কমেনি, বরঞ্চ বেড়ে

গিয়েছে। জনসমাগম চলে রাত-দুপুর পর্যন্ত। তারপর আহারাদি এবং শয়ন। সকালে প্রাতঃকৃত্য, আলোচনা-বৈঠক ইত্যাদি। মধ্যাহ্নে তিনজনেই ঘুমিয়ে নেন। রুটিন ধ'রে সব কাজ।

ব্যতিক্রম ঘটলো তিনদিন, তিনবার।

শিবরাত্তিরে মেনকা মা আর প্রভু কিশোর ঠাকুর রইলেন নেপথ্যে। ঝুলনে শুধু প্রভু কিশোর ঠাকুর দর্শন দিলেন। বাবা জগদীশনাথ এবং প্রভু কিশোর ঠাকুর কালীপুজোর রাতটা যে যার ঘরে ঘুমিয়ে কাটালেন।

হাঙ্গামার মরশুমে ছোটখাট, মাঝারি যত স্বামী-মহারাজ-বাবাজী-ঠাকরুণের হাল বড় খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। পাততাড়ি গুটিয়ে, আস্তানা ছেড়ে অনেকেই ভেগেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কাশী-হরিদ্বার-বৃন্দাবন-কামাখ্যাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁদের যোগাযোগ হয়। সবাই এক দুঃখে দুঃখী, সবারই এক অবস্থা। সামগ্রিক বিপদের দিনে মানুষ ব্যথার ব্যথী চিনতে পারে অত্যন্ত সহজে।

হরিদ্বারের গঙ্গায় ডুব দিতে দিতে কনকনে শীতে দুই মহারাজের প্রথম আলাপ, কাশীর গলিতে মাধুকরীর টানে ঘুরতে ঘুরতে আরও কয়েকজনের ঘনিষ্টতা, কামাখ্যায় মন্দির-প্রান্তে খানিকটা পরিচয়, বৃন্দাবনের যমুনা-পুলিনে মন-উজাড়-করা কথা—সব মিলিয়ে গ'ড়ে উঠলো আত্মিক সম্পর্ক। তারপর প্রয়াগে নতুন অনেকে একত্র হলেন।

সমস্যা জটিল। সমাধান না-করলেই নয়। রেলে ভাড়া দিতে হয় না, রাস্তায় খোরাকের অভাব হয় না। কিন্তু, কাঁহাতক চরকিবাজি চালানো যায়। দিনের পর দিন এখানে ওখানে প'ড়ে থাকা সম্ভব নয়। কারুর দিনে সের-খানেক দুধ লাগে, কেউ সকালে দুটো ডিম খান, কারুর রাতে ফুলকো লুচি না-হলে চলে না। নরম বিছানা,

তাকিয়া, তেল-মালিশ—নাম নেই কিছুর। আরও অনেক জিনিস নিয়ে বাঁধা-ধরা অসুবিধে।

স্বামী-মহারাজ-বাবাজী-ঠাকরুণেরা অনেক আলোচনা করলেন। মাথা নাড়ানাড়ি, কথা কাটাকাটি কম হল না। শেষ পর্যন্ত সবাইকে একটা রফা করতে হল। বাবা জগদীশনাথ, মেনকা মা, প্রভু কিশোর ঠাকুরের কথা উঠলো। তাঁদের সহাবস্থান-কাহিনী চারিয়ে গিয়েছিল সব জায়গায়। স্বামী-মহারাজ-বাবাজী-ঠাকরুণরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের নাগাল পাওয়ার যুক্তি আঁটলেন।

এগার

বছরও প্রায় ঘুরে আসে। শেষ কিস্তিতে বাবা জগদীশনাথের ডেরায় তিনজনের অধিষ্ঠান। তাঁদের সময় কাটছিল ভালই।

একদিন সকালের ডাকে প্রত্যেকের নামে এক একখানা মোটা সীলকরা খাম এল। চা-খেতে খেতে তিনজনই অবাক হলেন। ব্যাপারটা একদম নতুন।

খাম তিনখানা নিয়ে মেনকা মা দেখলেন নেড়েচেড়ে। বাবা জগদীশনাথ, প্রভু কিশোর ঠাকুর নজর করছিলেন তাঁকে।

মেনকা মা বললেন, "একই হাতে নাম-ঠিকানা লেখা। একসঙ্গে একই পোষ্ট-অফিসে ছেড়েছে। ভারী খানিকটা, নিশ্চয় কাগজে ভর্তি। খুললে বোঝা যাবে কি আছে ভেতরে।"

বাবা জগদীশনাথ দৃষ্টি-বিনিময় করলেন প্রভু কিশোর ঠাকুরের সঙ্গে। তারপর মেনকা মার হাত থেকে যে যার খাম নিয়ে নাম-ঠিকানায় চোখ বোলাতে লাগলেন।

"আপনারা ভাবুন বসে। আমি খুলছি"—

কথার সঙ্গে সঙ্গে মেনকা মা নিজের নাম-লেখা খামের মাথাটা ছিঁড়ে ফেললেন।

ভেতরে একগোছা কাগজ।

বাবা জগদীশনাথ, প্রভু কিশোর ঠাকুর এবার মেনকা মার অনুকরণ করলেন।

"আরে! এ যে প্রকাণ্ড দরখাস্ত!"

—ওল্টাতে ওল্টাতে শেষ পাতায় পঁহুছালেন মেনকা মা। তারপর আবার স্বগতোক্তি করলেন,

"এত দস্তখত!"

বাবা জগদীশনাথ, প্রভু কিশোর ঠাকুর যে যার খাম-বাণ্ডিল

হাতে নিয়ে চুপচাপ ব'সে ছিলেন। মেনকা মার কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলেন বাবা জগদীশনাথ।

প্রভু কিশোর ঠাকুর মত প্রকাশ করলেন,

"সবই এক জিনিষ মনে হচ্ছে। বোধ হয়, তিনটে নকল পাঠিয়েছে তিনজনের কাছে।"

"এক জিনিসে ভয় পাচ্ছেন, না খুশী হচ্ছেন?"

মেনকা মার জিজ্ঞাস্যটা ঠিক ধরতে না-পেরে প্রভু কিশোর ঠাকুর চুপ ক'রে রইলেন।

"ভয়ের কিছু নেই। আমাদের পেশা এক রকমের, পদ্ধতি এক রকমের, এমনকি থাকা-খাওয়া, চাল-চলনেও তফাৎ বড় কম। দেখি আপনাদের কাছে কি পাঠিয়েছে।"

হাত বাড়িয়ে মেনকা মা প্রভু কিশোর ঠাকুরের কাগজ-খাম নিলেন। বাবা জগদীশনাথ দিলেন নিজে থেকে। সেগুলো একবার দেখে নিয়ে পা নাচাতে নাচাতে মেনকা মা বললেন,

"হুঁ আমার যা বোঝবার বুঝে নিয়েছি। এখন আপনারা একটু মাথা ঘামান।"

দু-জনের খাম-দরখাস্ত ফিরিয়ে দিলেন মেনকা মা।

আরজিখানা মস্ত বড়। পর পর কাগজে বহু দস্তখত আর পাশাপাশি ঠিকানা। সই করেছেন যাঁরা, তাঁদের প্রত্যেকেই নামের আগে বা পরে উপাধিধারী—স্বামী, মহারাজ, বাবাজী, ব্রহ্মচারী, ঠাকরুণ ইত্যাদি। বক্তব্যের মোদ্দা কথাগুলো সহজ, সরল—

"........মেনকা মা, বাবা জগদীশনাথ এবং প্রভু কিশোর ঠাকুর যে সমঝোতার পরিচয় দিয়েছেন, নিবেদনকারী ও নিবেদনকারিণীরা তাতে সবিশেষ অনুপ্রাণিত। সব শুনে, অনেক মেহনতের পর তাঁরা একজোট হয়েছেন। তাঁদের সবাইকে নিয়ে দেশে অবতার-চক্র গ'ড়ে তুললে তিনজনের মহান আদর্শ প্রকৃত সার্থকতা লাভ করবে।........"

বাবা জগদীশনাথের অবস্থা কাহিল। প্রভু কিশোর ঠাকুরের মত তিনিও ঝুঁকে বসেছিলেন কাগজের তাড়া নিয়ে। কিন্তু সুবিধে করতে পারলেন না। পাতা উলটিয়ে অস্ফুট আওয়াজে টেনে টেনে কয়েকটা নাম পড়েন। এক এক জায়গায় থেমে যান হোঁচট খেয়ে, শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন খানিকক্ষণ, ঠোঁট নাড়েন, আবার দেখেন হাতের কাগজ।

নাটকীয় ভঙ্গিতে বাঁ হাত নাড়তে নাড়তে প্রভু কিশোর ঠাকুর দরখাস্তটা আওড়ালেন আগাগোড়া। নাম-ঠিকানার ফিরিস্তি উলটিয়ে প্রথম আর শেষের দিকটায় চোখ বোলালেন। তারপর হাত উঠলো চুলে। মাথা চুলকোতে চুলকোতে আর একবার পড়লেন। মুখটা তাঁর শুকিয়ে এল।

মেনকা মা এর মধ্যে নিজের খাম-কাগজ এক সঙ্গে পাকিয়ে কোলের ওপর রেখেছেন। মুখে তাঁর তাচ্ছিল্যের হাসি, পালা ক'রে চোখ ঘুরছে বাবা জগদীশনাথ আর প্রভু কিশোর ঠাকুরের ওপর।

বাবা জগদীশনাথের গলা দিয়ে আর্ত্তনাদ বেরুলো—

"সর্বনাশ করেছে! মানে, এত ভাগিদার।"

একবার উঠে তিনি ব'সে পড়লেন।

"সবাই মিলে পেছনে লাগলেই হল? মজাটা দেখাবো না।"

—প্রভু কিশোর ঠাকুরের বীরদর্পে কান্নার আমেজ। তিনি ঢোঁক গিললেন কয়েকটা।

হাসতে হাসতে মেনকা মা উভয়কে অভয় দিলেন—

"একেবারে নাবালক আপনারা। ওরা চড়াও করবে না কোনওদিন। আমাদের চেয়ে ওদের বিপদ অনেক বেশি।"

বাবা জগদীশনাথ, প্রভু কিশোর ঠাকুর রা কাড়লেন না একদম। দুজনের মুখে ফুটে উঠলো ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

মেনকা মা বলতে লাগলেন,

"এই সামান্য ব্যাপারে একেবারে কেঁচো হলে চলবে কেন? টোপ গিললে বাছাধনদের রক্ষে থাকবে না। আগে ন্যাজে খেলাবো। তারপর একসঙ্গে সব কটাকে টেনে তুলবো। ধড়ফড়ানি সঙ্গে সঙ্গে।"

মেনকা মার আশ্বাসে প্রভু কিশোর ঠাকুর মন্তব্য করলেন,

"সহজে ছাড়া হবে না, কিন্তু।"

বাবা জগদীশনাথও তাজা হয়ে হাঁক পাড়লেন,

"য়্যায়সা তালিম দোবো, মানে......"

* * *

হপ্তা-খানেকের মধ্যেই স্বামী-মহারাজ-বাবাজী-ব্রহ্মচারী-ঠাকরুণ-দের কাছে ডাকযোগে এক-একখানা লম্বা চিঠি পঁওছালো। ভাল কাগজে ছাপানো। মাথায় খাঁড়া-ডমরু-বাঁশীর ছবি, বাঁ দিকে মোটা অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে মেনকা মা, বাবা জগদীশনাথ, প্রভু কিশোর ঠাকুরের নাম। চিঠির বয়ানে শাস্ত্র, দর্শন, কাব্য, অনুশাসন, চোখ-রাঙানি বা অনুনয়ের বিন্দুমাত্র আভাস নেই। লেখা রয়েছে—

"আপনার প্রস্তাব ও মনোগত অভিপ্রায় জেনে আমরা বিশেষ আনন্দিত। বিষয়টি বিবেচনা করবার জন্যে আমরা অত্যন্ত উৎসুক। তবে, ফটো এবং টিপসই সহ নিচের বিবরণীগুলি না-পেলে পাকা পরিকল্পনায় হাত দেওয়া যাবে না। কোনও জিনিস গোপন করবেন না।

জ্ঞাতব্য তথ্যাবলী

১। বয়স।

২। পিতৃনাম।

৩। নিজের আসল নাম।

৪। বংশগত পদবী।

৫। (বিবাহিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে) স্বামীর পদবী।

৬। আগেকার ঠিকানা।

৭। এ যাবৎ স্বনামে বা বেনামে কোনও মামলায় জড়িয়ে থাকলে তার ভালমন্দ সমস্ত কাহিনী।

৮। স্থায়ী শিষ্য-শিষ্যাদের সংখ্যা।

৯। শিষ্য-শিষ্যাদের আর্থিক অবস্থার মোটামুটি আন্দাজ।

১০। শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে কত জনের বয়েস কুড়ি থেকে চল্লিশের ভেতর, কতজন চল্লিশ ছাড়িয়ে ষাটের মধ্যে পড়ে, কতজন ষাটের ওপর।

১১। পুরোনো ধরণের সন্ন্যাসী, না, আধুনিক।

১২। খাদ্য এবং পানীয়ের মধ্যে কোন কোনটি বিশেষ প্রিয়, কোন কোনটি না-হলে চলে না।

১৩। তাবিজ-কবচ, ফুলপড়া-জলপড়া ইত্যাদি দেওয়ার অভ্যাস আছে কিনা।

১৪। কোন দেবতার হকদার।

১৫। নগদ, জমি, বাড়ি, গহনা, তৈজস ইত্যাদি মিলিয়ে স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির হিসেব এবং আনুমানিক দাম।

১৬। পোষা গুণ্ডা বা ঐ ধরণের লোক আছে কিনা।”

* * *

পক্ষকাল পরে। রাত হয়েছে যথেষ্ট। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। শুধু একটানা জলপড়ার আওয়াজ কানে আসে। দমকা বাতাস মাঝে মাঝে ধাক্কা দিচ্ছে দরজা-জানলায়, পর্দাগুলো ফুলে উঠছে।

বাবা জগদীশনাথ, প্রভু কিশোর ঠাকুর, মেনকা মা আহার-পর্ব শেষ করেছেন। তিনজনে বসেছেন একসঙ্গে। হাতে খড়কে নিয়ে বাবা জগদীশনাথ পান চিবুচ্ছেন। আঙুলে কোঁচার খুঁট জড়াতে জড়াতে প্রভু কিশোর ঠাকুর ঢেঁকুর তুলছেন। দু হাঁটু নাড়াতে নাড়াতে মেনকা মা কথা শুরু করলেন—

"দেখলেন মজাটা? টোপ গেলা তো দূরের কথা, কেউ দাঁত ফোটানোর চেষ্টা পর্যন্ত করলো না। একজনও জবাব দিলে না। পাল্টা সাধারণ চিঠি এলো না একখানা। আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার মতলবে ছিল সবাই। এখন যে যার মাথায় হাত বুলিয়ে দেখছে।"

"আপনি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। মানে, আমি তো দস্তুর মতো ঘাবড়িয়ে গেছিলাম"—

বাবা জগদীশনাথের বক্তব্য আটকিয়ে গেল পানের বিষম লেগে। তিনি ভয়ানক রকম কাসতে আরম্ভ করলেন।

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিলেন প্রভু কিশোর ঠাকুর। সুর ক'রে তিনি মেনকা মার প্রশস্তি জুড়ে দিলেন—

"আপনার তুলনা মিলবে না দুনিয়ায়। নহ মাতা, নহ কন্যা......"

মেনকা মা থামিয়ে দিলেন তাঁকে—

"এত রাতে আর কাব্যের দরকার নেই। সময়মত বিজ্ঞে জাহির করবেন।"

বার

সহাবস্থানের প্রথম বাৎসরিক মহোৎসব উদ্‌যাপিত হল বিপুল সমারোহে। বড় মাঠে বিরাট আটচালার নিচে তিনদিন তুমুল কাণ্ড চললো।

সকালে মাইকে ত্রিমূর্তির স্তব-স্তোত্র, ভজনগান। বিকেলে বক্তৃতা। সন্ধ্যের পর কীর্তন, কালীকীর্তন। দুপুরে জমকালো শোভাযাত্রা।

শোভাযাত্রায় সবার আগে লাজবর্ষণকারীর দল। তারপরই পাশাশাশি মহেশ্বররূপী বাবা জগদীশনাথ, অন্নপূর্ণাবেশিনী মেনকা মা, কৃষ্ণকল্প প্রভু কিশোর ঠাকুরের বিরাট ছবি। ছবির পেছনে কাড়া, নাকাড়া, জগঝম্প, ব্যাণ্ড, ব্যাগপাইপ, ঢাক-ঢোল-কাঁসি-সানাই। সবার শেষে শ্রীখোল-বাহিনী। বাজনার তুমুল শব্দ ছাড়িয়ে ঘন ঘন হাজারো কণ্ঠের প্রচণ্ড জয়ধ্বনি। এতবড় জনস্রোত কেউ কখনও দেখেনি।

শোভাযাত্রার চোটে রোজ গাড়ি ঘোড়া অচল হত। ভীড়ের চাপে তিনদিনে বহু লোক জ্ঞান হারিয়ে হাসপাতালে গেল। রাস্তার দুধারে ফুটপাথে, বাড়ির ছাত-বারাণ্ডা-জানলায় দর্শক দাঁড়াতো কাতারে কাতারে। কোথাও বড় গাছ থাকলে তার ডালে ডালে আশ্রয় নিত দর্শনেচ্ছুরা। বাজনার আওয়াজ কানে আসতেই চেঁচাতো সবাই "ঐ, ঐ"। তারপর শুরু হত ধাক্কাধাক্কি। শ্রীখোল-বাহিনী এগিয়ে যাওয়ার পর অনেকে ভিড়ে যেত পেছনে। ফাঁপতে ফাঁপতে চলমান জনারণ্য আশ্রয় নিত মণ্ডপে।

তিনদিন প্রসাদ বিতরিত হয়েছে একটানা। সকালে এলাচ-দানা, মিছরির গুঁড়ো, দুপুরে খিচুড়ি-মালপোয়া, সন্ধ্যেয় ফল-বাতাসা পেয়ে হাজার হাজার ভক্ত মাথায় ঠেকিয়েছে, মুখে দিয়েছে, সযত্নে বাড়ি নিয়ে গেছে।

মহাদেববেশী বাবা জগদীশনাথ, জটা-গেরুয়া-ধারিণী অন্নপূর্ণারূপিনী মেনকা মা, বনমালা-পীতাম্বর-ভূষিত বংশীধারী প্রভু কিশোর ঠাকুর আটচালার মাঝখানে এক সঙ্গে উঁচু মঞ্চে অধিষ্ঠিত হয়েছেন রোজ দু-বেলা। তাঁদের ঘিরে চলেছে তাক লাগানো আলোর খেলা। কৃপাপ্রার্থীরা সেখানে গিয়ে মাথা ঠুকেছে লাইন ধ'রে, প্রণামী-অর্ঘ্য জমা করেছে। স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দৈনন্দিন কার্যাসূচি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়েছে, কোনও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি।

কীর্তন-কালীকীর্তনের পর রোজ আতস বাজি পুড়েছে।

মেনকা মা বুঝিয়েছিলেন অনেক। কিন্তু, বাবা জগদীশনাথ রাজি হননি একদম। প্রভু কিশোর ঠাকুরেরও অমত ছিল। তা নইলে তিনজনে তিনদিন প্রকাশ্যে বাণী দিতেন।

মহোৎসবের শেষ রাতে ঘোষিত হল, তিনজন আবার স্বতন্ত্র লীলায় ধন্য করবেন মানব-সমাজকে। তবে, সহাবস্থানের মূল তত্ত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে। বিশ্বের মঙ্গলার্থে প্রয়োজন বোধে তিনজন আবার একত্র হবেন।

মহামিলনোৎসবের জের চললো মেনকা মার আশ্রমে। নগদ টাকা পড়েছিল হাজার হাজার। জিনিস-পত্রের পরিমাণ দাঁড়ালো গাড়ি গাড়ি। ফর্দ তৈরি ক'রে, হিসেব মিলিয়ে তবে বখরা। তারপর বাবা জগদীশনাথ ফিরলেন ডেরায়, প্রভু কিশোর ঠাকুর ঢুকলেন গিয়ে যমুনা ধামে।

তের

সহাবস্থানের মাসখানেক পরে।

একদিন ভোরের অন্ধকারে মেনকা মার আশ্রমে কলিং-বেল বেজে উঠলো। এ সময় কেউ আসে না। সকালের দিকে প্রায় সবাইকেই ফিরে যেতে হয়। মেনকা মা কচিৎ কাউকে দিনের বেলা দর্শন দেন।

আগন্তুক ফটক পেরিয়ে কলিং-বেল টিপছিলেন। সদর খুলে বীরু তাকে নিরস্ত করতে পারলো না। একদম নাছোড়বান্দা। মেনকা মার সঙ্গে তখুনি দেখা করবেন।

শেষ পর্যন্ত খবর পঁওছালো ওপরে। মেনকা মা সাক্ষাৎপ্রার্থীর নাম জানতে চাইলেন।

বীরু ফিরে গেল। ভদ্রলোকটি কিছুতেই নাম বললেন না। মেনকা মা চেহারার বর্ণনা শুনলেন—লম্বা-চওড়া, মাথায় পাগড়ি, চোখে গগ্‌লস, পরণে পায়জামা-পাঞ্জাবি-নাগরা। ঘুমের আমেজে একটু হেসে মেনকা মা তাঁকে নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন।

বিছানা ছেড়ে মেনকা মা গিয়ে কাৎ হলেন হল-ঘরের বড় সোফায়। সামনে জোড়া কুকুর। নবাগত ঢুকতেই সোফার হাতায় একটা পা ছড়িয়ে বললেন,

"পাগড়ি-চশমা খুলুন আগে। ওসব দেখলে আমার মেজাজ বিগড়িয়ে যায়।"

পাগড়ি-চশমার আড়াল থেকে আবির্ভূত হলেন জলজ্যান্ত বাবা জগদীশনাথ। চশমা পকেটে রেখে, পাগড়ি হাতে নিয়ে তিনি দাঁড়ালেন কাঠগড়ায় হাজির আসামীর মত।

না-উঠেই মেনকা মা প্রশ্ন শুধোলেন—

"সাত-সকালে কি মনে ক'রে?"

তাঁর পা নাচানো নজর করতে করতে বাবা জগদীশনাথ হোঁচট-খাওয়া জবাব দিলেন—

"মানে, মানে········এই······মানে····"

"অত মানে দিয়ে কি হবে, আসল দরকারটা কি শুনি।"

"মানে, আজ কদিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘুম আসে না। চোখ বুজলেই, মানে চোখের দুটো পাতা এক করলেই······"

"বুঝেছি। ভূত দেখেন, কেমন ?"

"না, মানে, ডেরায় ফিরে যাবার পর থেকে চোখ বুজলেই, মানে, চোখ বুজলেই······"

"দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ ? সব কথা গুলিয়ে যাচ্ছে। বসুন চেয়ারটা টেনে। মাথা ঠিক ক'রে গুছিয়ে বলুন। গোলমাল হয়ে গেলে ভেবে নিন।"

"বসবো, দাঁড়াবো, যা করতে বলবেন করবো।"

"আর কিছু করতে হবে না। বসুন দেখি ভাল মানুষের মত।"

পাগড়ি কোলে নিয়ে মাথা নিচু ক'রে বাবা জগদীশনাথ বসলেন।

মেনকা মা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। আশ্রমের একটি ছেলে এর মধ্যে দরজায় এসে দাঁড়ালো। হাত টান ক'রে আলস্য ভেঙে, হাই তুলে কাপড় গুছিয়ে মেনকা মা উঠে বসলেন।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো, চা আনবে কিনা।

মেনকা মা মাথা নেড়ে নির্দেশ দিতে সে চ'লে গেল।

বাবা জগদীশনাথ নির্বাক। কপালে তাঁর বিন্দু বিন্দু ঘাম।

"ওরেব্বাপ! এত ঘাম। আমি তো ভাবছিলাম পাখাটা বন্ধ-ক'রে দেবো। ভোরের হাওয়ায় শীত শীত করছে।"

মেনকা মার মন্তব্য সরল বিদ্রূপে ভরা।

"না, মানে, ঘাম নয়, মানে······"

অপ্রতিভ বাবা জগদীশনাথের উত্তর নিতান্ত দুর্বল।

"ও হোঃ! বুঝতেই পারিনি! ওগুলো নিশ্চয়ই শেষ-রাতের শিশির-কণা।"

বাবা জগদীশনাথ লজ্জায় কুঁকড়িয়ে যান। মুখ দিয়ে তাঁর একটি শব্দ বেরোয় না। দেহটা চেয়ারের মধ্যে যথাসাধ্য গুটিয়ে চেয়ে থাকেন পাগড়ির দিকে।

চা এসে গেল।

বাবা জগদীশনাথ হাঁফ ছাড়লেন। সোফার গায়ে টিপয়ের ওপর ট্রে রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল ছেলেটি। মেনকা মা মৃদু ভর্ৎসনা করলেন তাকে—

"তোমার কাণ্ডজ্ঞান হল না এতদিনে? পুরো চার মাস এঁর খিদমৎ খেটেছো। শুধু চা-তে চলে এঁর? সব ভুলে গেছো?"

বাবা জগদীশনাথের দিকে চোখ ঘুরিয়ে বললেন—

"কেবল মিষ্টি, না, আরও কিছু?"

কৃতার্থ বাবা জগদীশনাথ অস্পষ্ট সাড়া দিলেন—

"না, না। মিষ্টিরই বা কি দরকার।"

ছেলেটি হাঁ-ক'রে দাঁড়িয়েছিল। মেনকা মা তাকে সামান্য তাড়া দিলেন—

"মগজে ঢোকেনি এখনও? যাও, মিষ্টির সঙ্গে কিছু নোনতা আনবে। গরম যা পাবে। দেরি ক'রো না। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

সে চলে গেল।

বাবা জগদীশনাথ খানিকটা সজীব হয়ে আনচান করতে লাগলেন।

"কি হল? মুখ বুজে উসখুস করবেন শুধু?"

"না, মানে, পরশু রাতে স্বপন দেখছিলাম........"

—বাবা জগদীশনাথ গুছিয়ে আনছিলেন কথাগুলো। কিন্তু, বাগড়া দিয়ে ফোড়ন কাটলেন মেনকা মা—

"বাঃ। এই যে বললেন, আপনার আজকাল একদম ঘুম হয় না।"

বাবা জগদীশনাথ আবার মুশড়িয়ে যান—

"না। একটু তন্দ্রার মত এসেছিল আর কি।"

"তন্দ্রা? সর্বনাশ। আপনার যে নাক ডাকে! একটা বছর আপনার নাসাগর্জন শুনেছি। দু-তিনখানা ঘর ছাড়িয়ে সে আওয়াজ কানে আসতো দিনে রাতে।"

"শুনেছেন? শুনেছেন?"

"না-শুনে উপায় ছিল? এখানে প্রথম দিন গভীর রাতে ঘুম ভাঙলে বুঝতেই পারিনি শব্দটা কিসের। ভয় পেয়েছিলাম খুব। আলো জ্বেলে বাইরে গিয়ে দেখি, আশ্রমের লোক-জন জেগে উঠেছে আমারই মত। কুকুর দুটো বাঁধা ছিল নিচে। তা নইলে চেঁচাতো। সবাই মিলে কান পেতে লক্ষ্য ক'রে বোঝা গেল, কীর্তিটা আপনার।"

"আমি কিন্তু কিছুই টের পাই না।"

"সত্যি?"

"বিশ্বাস হয় না?"

"সত্যি বলছি।"

"মা কালীর দিব্যি।"

"বেশ, বেশ। তাহলে স্বপ্নের কথাটা মিথ্যে?"

বাবা জগদীশনাথ করুণ চোখে চাইলেন।

এর মধ্যে রাজভোগ, সিঙাড়া নিয়ে এল আশ্রমের ছেলেটা। মেনকা মা আদেশ করলেন,

"মুখে পুরুন।"

বাবা জগদীশনাথ সব কটা খেয়ে ফেললেন একে একে, লম্বা চুমুকে চা শেষ করলেন। তারপর কানের আড়াল থেকে রূপোর খড়কে টেনে নিতেই মেনকা মার তিরস্কার—

"আপনাকে কতবার মানা করেছি, আমার সামনে দাঁত খোঁটা, কান খোঁচানো, নাকের মধ্যে আঙুল চালানো চলবে না। যত সব নোংরা অভ্যেস।"

থতমত খেয়ে বাবা জগদীশনাথ খড়কেটা ফেলে দিলেন মাটিতে।

'চটপট কথা সারুন। লোক আসতে আরম্ভ করবে এখুনই।"

"আগে তো সকালে-দুপুরে কাউকে দেখা দিতেন না?"

"আজকাল নিয়ম পাল্টিয়েছি।"

"তা বেশ। তা বেশ। মানে, আপনি, আপনি......."

বাবা জগদীশনাথ জুতসই ভাষা খুঁজে পাওয়ার আগেই মেনকা মা উঠে দাঁড়ালেন সোফা ছেড়ে।

বাবা জগদীশনাথ ব'সে রইলেন। তবে, বুঝলেন, আর দেরি করা চলবে না। হাত দুটো পাগড়ির ওপর রেখে শুরু করলেন তাই—

"মানে, আমাকে বাঁচান, মানে, আপনি........"

"আপনাকে? বাঁচাবো? আমি? কেউ খুন করার ভয় দেখিয়েছে নাকি?"

মেনকা মার জবাবে বাবা জগদীশনাথের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবুও বললেন,

"খুন? আমার গায়ে হাত তুলবে, এমন হিম্মৎ আছে কটা লোকের? মানে, আমি শুধু ভিক্ষে চাইছি........"

"কি ভিক্ষে?"

"খানিকটা সময়।"

"আচ্ছা, এক মিনিট।"

'মানে, আমার, আমার, সব, সব, সব কিছু নির্ভর করছে আপনার ওপর।"

"বটে?"

"হ্যাঁ। আলবৎ। মানে, আপনার দয়া, দয়া ছাড়া আমার, মানে, আমার জীবন......"

"ব্যর্থ হবে, নষ্ট হবে, কেমন ?"

"ওঃ। মানে, আমার মনের কথা জানতে পেরেছেন।"

"বেশ। এক মিনিট কিন্তু কেটে গিয়েছে।"

"না, মানে, আজ যদি আমার নিবেদন শোনবার সময় না-দিতে পারেন, তা-হলে আর একদিন, মানে········"

"আর একদিন আবার কি করবেন ?"

"মানে, আর একদিন আসবো। মানে, কবে আসবো ?"

"আসবেন ? ও—" মেনকা মা একটু থেমে জবাবটা পুরো করলেন,

"মঙ্গলবার সকালটা খালি থাকি। কারুর সঙ্গে দেখা করি না।"

"সামনের মঙ্গলবার, সকালে ? কেমন ? য়্যাঁ ?"

"অগত্যা।"—

সংক্ষিপ্ত উত্তরের সঙ্গে মেনকা মা এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

ফোঁস ক'রে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাবা জগদীশনাথ খড়কেটা মাটি থেকে তুললেন। মেনকা মা পেছন ফিরে রয়েছেন। বাবা জগদীশনাথ খড়কে কানে গুঁজলেন, মাথায় পাগড়ি চাপালেন, চোখে চশমা আঁটলেন। মেনকা মা ততক্ষণে সিঁড়িতে পা দিয়েছেন। বাবা জগদীশনাথ দ্রুত তাঁর অনুগমন করলেন।

চোদ্দ

কয়েকদিনের মধ্যেই মেনকা মার আশ্রমে এক অবগুণ্ঠনবতী মহিলা হাজির। রাত তখন বারোটার কাছাকাছি। দোতলা খালি। চেয়ারে ব'সে টেবিলে হেলান দিয়ে বীরু সিগারেট টানছে। কাউণ্টারের আলো জ্বলছে। একতলায় আর কেউ ছিল না। খোলা সদর দিয়ে স্ত্রীলোকটি সটাঙ গিয়ে দাঁড়ালেন বীরুর সামনে। বীরু উঠে গিয়ে কাউণ্টারের প্যাড থেকে নিয়ে এল একখানা "বিবরণী-পত্র।"

মহিলার কোনও সাড়া নেই—নড়েন-চড়েন না। বীরু পকেটের কলমটা খুলে ধরলো।

কিন্তু, কোনও কথা না-বলে, ঘোমটা না-সরিয়ে মহিলাটি চকচকে নতুন ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বার ক'রে দিলেন একটুকরো কাগজ। পরিষ্কার অক্ষরে তাতে লেখা—

"রায়-বাড়ির ছোট বৌ।"

নিশুতি রাতে ঠিক এ রকমের ভক্ত আশ্রমে আর এসেছে ব'লে স্মরণ হল না বীরুর। আড়চোখে তাঁর মাথার কাপড় থেকে পায়ের চটি পর্যন্ত দেখে নিল সে। ব্যাগ আর স্লিপার একেবারে হাল ফ্যাসানের। সাড়িটা গোলাপী বেনারসী। হাতে আংটি আছে, ঘড়িটা একটু বড়। মুখ-চোখ-নাক-কান ঢাকা, বাইরে থেকে ভাল-মন্দ বোঝবার উপায় নেই। বয়েস খুব বেশি নয়। বীরু এর বেশি রহস্য-ভেদে সক্ষম হল না।

তবুও, কাগজের টুকরোটা দ্বিতীয়বার দেখে সে প্রশ্ন করলো,

"মানত টানত ?"

রায়-বাড়ির ছোট বৌ মাথা নাড়লেন।

"উপহার ?"

ভদ্রমহিলা এবারও মাথা নেড়ে স্লিপটার দিকে আঙুল দেখালেন।

ফালতু ব'কে লাভ নেই বুঝে বীরু উঠলো কাগজখানা হাতে নিয়ে।

নেমে এসে সে বললো, "চলুন আমার সঙ্গে।"

রায়-বাড়ির ছোট বৌ যেন সবই চেনেন। ঘোমটা ঠিক রেখে টক টক করে সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন। তারপর সিধে ঘরমুখো। তাঁকে ঘরের চৌকাট ডিঙোতে দেখে বীরু নেমে গেল।

বড় ঘরে নীল আলো জ্বলছিল। সোফার ধারে দাঁড়িয়ে বাবড়িওয়ালা একটি ছোকরা। রায়-বাড়ির ছোট বৌ ঢুকতে মেনকা মা তাকে বাইরে যেতে ইশারা করলেন। সে এক-পা দুপায় এগুতেই মেনকা মার ধমক, "দেরী করতে না পারো, চলে যাও।" ছোকরা বেরিয়ে গেল মুখ বুজে।

অবগুণ্ঠনবতী তখনও দরজার কাছে। নিজের পাশে জায়গা দেখিয়ে মেনকা মা তাকে বসতে বললেন। মহিলাটি কিন্তু বসলেন না। পেছন ঘুরে গিয়ে ছিটকিনি আঁটলেন দরজায়। তারপর ঠাঁই নিলেন সোফার কোণে।

নবাগতা পর্দানসীনা গৃহস্থ-বধূ, আর, বক্তব্যটা নিশ্চয়ই জটিল। মেনকা মা তাই পা তুলে ঘুরে বসলেন সোফার পিঠে একটা হাত রেখে।

ভদ্রমহিলা এবার মুখ আবরণ-মুক্ত করলেন। সিঁথির সিঁদুর সমেত খোঁপা-বাঁধা কেশদামও মাথা থেকে খসালেন।

মেনকা মার বিস্ময় দ্রুত কৌতুকে পরিণত হল। হাসির লহরে তিনি প্রশ্ন করলেন,

"প্রভু কিশোর ঠাকুর তাহলে কিশোরী, থুড়ি, পর্দানসীন বধূ সাজতেও ওস্তাদ। তা হঠাৎ নারী-বেশে আবির্ভাব কেন?"

"বহুরূপী না হয়ে উপায় ছিল না।"

"উপায় হাতড়িয়ে কি সব সময় ঠেলা সামলানো সম্ভব হয়?"

"বেকায়দায় পড়লে শরণ নিতে হয়। শরণাগতেরা বেঁচে যায় চিরকাল।"

"তবু, রাত দুপুরে রায়-বাড়ির ছোট বৌ সেজে আসার উদ্দেশ্যটা মহৎ ব'লে মনে হচ্ছে না।"

"নিশ্চয়ই মহৎ।"

"সাড়ি-পরচুলাটা কিন্তু ভাঁওতার উপকরণ ?"

"মেয়েছেলে না সেজে আসতাম কি ক'রে ?"

"ইচ্ছেটা ঐকান্তিক হলেই পারতেন। বিপদের দিনে তো থেকেও গিয়েছেন চার মাস। এখন কি লোক-লজ্জার ভয় ?"

জিভ কেটে প্রভু কিশোর ঠাকুর উত্তর করলেন,

"ছিঃ! তা কেন হবে। দিন রাত ভেবে ভেবে কূল-কিনারা পাইনি। শেষে এই পথ বেছে নিলাম।"

"মগজ আপনার বেশ সাফ।"

"পুরো একটা হপ্তার চেষ্টায় আজ বেরুতে পেরেছি বহু কষ্টে।"

"অত কষ্টের দরকার কি ছিল ?"

"আমার অবস্থা বুঝলে ঠাট্টা করতেন না"—

প্রভু কিশোর ঠাকুরের কথায় অভিমানের সুর বেজে উঠলো।

"সাড়ি-পরচুলা, ভ্যানিটিব্যাগ কি বৈরাগ্যের হাথিয়ার ?"

মেনকা মার জিজ্ঞাসায় পুরোদস্তুর শ্লেষের আভাস থাকলেও প্রভু কিশোর ঠাকুর তা গায়ে মাখলেন না। বললেন—

"বৈরাগ্যের বাকীও নেই। কিছু ভাল লাগে না। মাথাটা একদম ফাঁকা ঠ্যাকে……"

প্রভুর গলা ভারী হয়ে এল। তিনি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন মেনকা মার দিকে।

মেনকা মা দেখলেন, প্রভুর চোখ দুটো ভিজে উঠেছে।

প্রভু কিশোর ঠাকুরের বা কাঁধে ডান হাতের চাঁটি লাগিয়ে মেনকা মা প্রবোধ দিলেন,

"অল্পে অধীর হলে চলবে কেন? শিষ্য-শিষ্যারাই বা কি মনে করবে?"

"সব চুলোয় যাক।"

দুহাত টান ক'রে আলস্য ভাঙতে ভাঙতে মেনকা মা উপদেশ দিলেন—

"এত তাড়াতাড়ি নয়। সময় আসুক। ধৈর্য ধরুন।"

"আমি যথাসর্বস্ব ত্যাগ করবো।"

এ প্রস্তাবের জবাব দিলেন মেনকা মা বড় রকমের একটা হাই তুলতে তুলতে—

"বেজায় ঘুম পাচ্ছে।"

প্রভু কিশোর ঠাকুরের চোখে নামলো বাদল-ধারা। জানলার দিকে মুখ ঘোরালেন তিনি।

তা দেখে মেনকা মা হাসি মুখে দাঁতে দাঁত চেপে দু-হাতে তাঁর চুল ধ'রে নেড়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর অদ্ভুত ভাব পরিবর্তন। তাঁর সারা দেহ খুশীতে শ্লথ হয়ে এল।

গদগদ হয়ে তিনি কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। সোফায় গা এলিয়ে, আধবোজা চোখ দুটো ওপরের দিকে তুলে অস্ফুট ভাবে মেনকা মা তাঁকে বাধা দিলেন—

"আর একদিন বাকী কথা শুনবো।"

প্রভু চমকে উঠে থমকে গেলেন। শেষে আহত কণ্ঠে শুধোলেন,

"বিরক্ত হচ্ছেন?"

"না। তবে, ঘুমের চোটে আর ব'সে থাকা দায়।"

"আজ তাহলে যাব?"

"আরও বসতে চান?"

প্রভু কিশোর ঠাকুর কৃপাপ্রার্থীর হাসি হাসলেন।

চোখ টান ক'রে মেনকা মা যেন আদেশ করলেন—

"উঠুন তাহলে।"

"সত্যিই যাবো ?"

"নিশ্চয়।"

"ওঃ, বুঝিনি।........কাল দেখা হবে ?"

"এত জলদি ?"

আবার চোখ জুড়ে আসে, আবার হাই ওঠে মেনকা মার।

"কবে, তাহলে ?"

"কবে ? আচ্ছা।........শনিবার রাত গোটা দশেকের পর লোকজন সব চ'লে যায়।"

"বেশ। শনিবার আসবো।"

পুরোপুরি-মুদিতনয়না মেনকা মার দিকে প্রভু চেয়ে রইলেন। মেনকা মা হঠাৎ চোখ খুলতে তিনি মাথা নোয়ালেন।

"আরে! এখনও নড়বার নাম নেই ?"

"তাড়াতে পারলেই বাঁচেন।"

"আমার খাওয়া বাকী। ঘুমোতে হবে। তা ছাড়া, রায়-বাড়ির ছোট বৌ মাঝ রাতের রাস্তায় বিপদে পড়তে পারেন।"

"নাঃ। ভয়ের কিছু নেই।"

"ভয় না-থাকলেও স'রে পড়ুন।"

"তা-হলে উঠি এবার ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

মেনকা মা চোখ বুজে ঘাড় কাত করলেন।

মাথায় পরচুলা এঁটে, ঘোমটা টেনে প্রভু কিশোর ঠাকুর বেরুলেন ঘর থেকে।

নীচে বীরু তখনও ব'সে সিগারেট ফুঁকছিল। কাউণ্টারের পাশে আর একখানা চেয়ারে বাবড়িওয়ালা ছোকরাটি—প্রভু কিশোর

ঠাকুর ঘরে ঢুকতে যাকে মেনকা মা ধমক দিয়েছিলেন। নারী-বেশিনী প্রভু নিচে নামতে সে ওপরে গেল। বীরুও উঠে দাঁড়ালো।

প্রভু সদরমুখো পা বাড়াতে বীরু ডাকলো পেছন থেকে—

"শুনুন।"

প্রভু থামলেন না, ঘাড়ও ফেরালেন না।

"এগিয়ে দোবো কি?"

হাত নেড়ে তাকে "না" জানিয়ে প্রভু রাস্তায় নামলেন। ফটকে আঁকড়া লাগানোর আওয়াজ হল।

"কি জাঁহাবাজ মেয়েমানুষরে বাবা" বলতে বলতে বীরু সদর বন্ধ করলো।

পনের

পরের মঙ্গলবার ভোর বেলায় এলেন বাবা জগদীশনাথ। মেজাজটা তাঁর বেশ শরিফ। চা খেতে খেতে, ভণিতা বাদ দিয়ে তিনি নিজের কাহিনী আরম্ভ করলেন—

"বুঝলেন ? মানে, একেবারে হা-ঘ'রে হাড়হাবাতে ভাববেন না।"

"ভাবি না বটে, কিন্তু, আপনাকে তো দেখছি শুধু বাবা জগদীশ-নাথ হিসেবে।"

"আমার অন্য পরিচয়ও ছিল একদিন। এখন সেটা, মানে, সেটা........"

"মুছে গেছে ? কেমন ? বলুন না, শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"শুনবেন তাহলে ?"

"নিশ্চয়।"

"ছোটখাট জমিদারের ঘরে জন্মেছি।"

"হতে পারে।"

"হতে পারে মানে ? সত্যি। ঠাকুদ্দা হাজারিবাগে অনেক জমি কিনেছিলেন সস্তায়। মোক্তারিতে তাঁর ভাল পশার ছিল। জমিতে প্রজা বসিয়ে বাবা সেখানে থাকতেন বারমাস। আমি ছোটবেলায় বাংলা দেশের মুখই দেখিনি।"

মেনকা মা আচম্বিতে বাধা দিলেন—

"তা জমিদার-নন্দনের সন্ন্যাস তো সহজ কথা নয়।"

"তা-ও শুনবেন ? মানে, কেন এপথে এলুম ?"

"হ্যাঁ। সবটা না-জানলে মন খুঁৎ খুঁৎ করবে।"

"সবই বলছি। জন্মের পর মা চ'লে যান। তাঁর চেহারা মনে পড়ে না। মানে, ছোট বয়েসে মানুষ হয়েছিলাম এক সাঁওতাল ঝীর কোলে-পিঠে চড়ে। মানে, যতদিন জ্ঞান হয়নি, তাকেই মা ব'লে ডাকতাম। তার মুখটা দেখতে ছিল আপনার মতন।"

"বটে ? আমাকে সাঁওতালনী বলছেন ?"

"না, না।"

"বুঝলাম। তারপর ?"

"বাবাকে হারাই পনের বছর বয়সে।"

"শেষ পর্যন্ত বুঝি মাথার ওপর কেউ ছিল না ?"

"হ্যাঁ। বাবা মারা যাওয়ার পর, মানে, ঝীটাও হঠাৎ গেল।'

"পালিয়ে গেল ?"

"না। পালাবে কেন। মানে, ম'রে গেল।"

"তারপর থেকে ব'সে ব'সে খেয়েছেন শুধু।"

"মোটেই না। যথেষ্ট মেহনৎ করেছি। মানে, বাবার কাছে শিখি কুস্তি, লাঠিখেলা। একজন সাঁওতাল সর্দারের কাছে নিয়েছিলাম তীর-ধনুকের তালিম। মানে, হাতে ধ'রে ছেলের মতন ক'রে দেখিয়ে দিত।"

"বটে ? লাঠি-ফাটির কথা বিশ্বাস হচ্ছে না মোটে।"

"মানে, বিশ্বাস হচ্ছে না ? আচ্ছা।"

বাবা জগদীশনাথ ভয়ানক রকম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁর পৌরুষে ঘা লেগেছিল। চেয়ারের ওপর পাগড়ি-গগ্‌ল্‌স রেখে দাঁড়ালেন। পাঞ্জাবির হাতা দুটো গুটিয়ে নিলেন চটপট। চেয়ে দেখলেন চারদিক। ঘুরপাক খেলেন গোটা ঘরে। কিন্তু, কি রকম যেন দ'মে যাচ্ছিলেন। চারদিকে শ্যেনদৃষ্টি চালাতে চালাতে তাঁর চোখে-মুখে হঠাৎ খুসিয়ালির আমেজ দেখা দিল। টিপয়ের ওপরে রাখা রজনীগন্ধার গোছা ছোঁ মেরে তুললেন। তার থেকে দুটো ডাঁটা টেনে নিয়ে দু-হাতে ধরলেন। কিন্তু, একটা দিয়ে আর একটার ওপর ঘা লাগাতে দুটোই গেল মচকিয়ে। চরম বিরক্তিতে "ধুত্তোর" ব'লে বাবা জগদীশনাথ ডাঁটা দুটো ছুঁড়ে মারলেন মেঝের ওপর। তারপর, পাগড়ি-গগ্‌ল্‌স হাতে নিয়ে চেয়ারে বসলেন আবার।

"একখানা ছোট হাত-লাঠিও নেই আপনার ঘরে!"

বাবা জগদীশনাথের আফশোষে ভেজাল ছিল না। কৌতুকের হাসি হাসতে হাসতে মেনকা মা প্রবোধ দিলেন,

"আশ্রমের কোথাও লাঠি বা ডাণ্ডা মিলবে না। তাতে কি। আপনি যে পাকা লেঠেল, সেটা বুঝতে বাকী নেই।"

এ সান্ত্বনায় ফল হল উল্টো। বাবা জগদীশনাথ রুখে উঠলেন,—

"ঠাট্টা করছেন? মানে, বুঝলেন কি ক'রে? পাঁয়তাড়ার আশা নেই। ছড়িটা শুদ্ধু আনিনি। ভাবলাম, মানে, বেনেটি না-হোক, হারোয়ার কায়দা দু-একটা দেখাবো। কোনও উপায় নেই।"

"দুঃখু করবেন না।"

"দুঃখু করবো না, মানে? আপনি ভেবেছেন, ধাপ্পা দিয়েছি? সামনের মঙ্গলবার লাঠি নিয়ে আসবো।"

"ও কাজটি করবেন না। লাঠি-সোঁটা দেখলেই জোড়া কুকুর লেলিয়ে দোবো।"

লাফিয়ে-উঠলেন বাবা জগদীশনাথ। কোল থেকে চশমা-পাগড়ি প'ড়ে গেল মেঝের ওপর। ফেটে প'ড়লেন একদম—

"কুকুর? কুকুরের ভয় দেখাচ্ছেন? লাঠি হাতে থাকলে আমি বাঘকেই পরোয়া করি না। জোড়া কুকুর খতম হবে পাঁচ সেকেণ্ডে। দেখে নেবেন।"

"চশমাটা ভাঙলো কিনা দেখুন আগে। তারপর আমায় দেখাবেন। তবে, কুকুরে যখন টিট হবেন না, পুলিশেই খবর দোবো।"

গগ্‌লসের কিছু হয়নি। সেটা তুলে নিয়ে শুকনো মুখে গুম হয়ে যান বাবা জগদীশনাথ।

"রাগের চোটে পাগড়ি ফেলে যাবেন না। চিনে ফেলবে সবাই।"

পাগড়ি প'ড়ে রইল। চেয়ারে ব'সে চোখের তারা ঘোরাতে লাগলেন বাবা জগদীশনাথ। পলক পড়ছিল ঘন ঘন। চটেছেন, আঘাতও পেয়েছেন খুব।

মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে মেনকা মা নীরবতা ভাঙলেন—

' শুধু লাঠি, তীর-ধনুক, ডন-কুস্তিতে আপনার কেরামতি ?"

বাবা জগদীশনাথ মনে মনে গজরাচ্ছিলেন। মেনকা মার কথায় সমস্ত ক্ষোভ উবে গেল। চাঙ্গা হয়ে উত্তর দিলেন—

"মানে, আর কিছু পারি কিনা, জানতে চাইছেন ?"

"হ্যাঁগো, মশাই, হ্যাঁ।"

"কি ধরণের জিনিস ?"

"সব রকম কেরামতির ফিরিস্তি।"

"শুনুন তবে। মানে, মহুয়ার দেশে জন্মেছি। বাবা গত হওয়ার পর থেকে, মানে, নেশা ধরি। আমার হিম্মৎ দেখে ঝানু ঝানু সাঁওতালের পর্যন্ত তাক লেগে যেত।"

"হ্যাঃ। আপনার মত বচন-সর্বস্ব লোক আবার নেশা করতে পারে। এক বাড়িতে থাকবার সময় তো কিছুই নজরে পড়েনি।"

"কী ? কী বললেন ? মানে, নেশা করতে পারি না ? মরদকী বাৎ। এক সঙ্গে পাঁচ বোতল উড়িয়ে দোবো, টলবো না একদম। একটা বছর চালিয়েছি শুধু আফিঙ-সিদ্ধি-গাঁজা দিয়ে। টের পাবেন কি ক'রে।"

"শুধু জলপথেই চলেন না তাহলে।"

"মানে ? নৌকো বাইতে পারি কিনা, জানতে চান ?"

"না, না। মদ ছাড়া শুকনো জিনিসের নেশা-টেশাও রপ্ত আছে। কেমন ? আফিঙ্-সিদ্ধি-গাঁজার কথা তুললেন কিনা।"

বাবা জগদীশনাথ বুক বাজিয়ে বললেন,

"সব রকমের অভ্যেস রাখি। মানে, সাপের বিষ খেয়ে হজম ক'রে দোবো। এখনও আমার দিনে সিকিভরি আফিঙ, একভরি

গাঁজা, এক ছটাক সিদ্ধি লাগে। কোকেন পেলে ছাড়ি না। তার ওপর আসল জিনিস তো আছেই। গাঁজা চড়াই সকালে, রাত্তিরে খাওয়ার সময় মদ, ঘুমোনোর আগে আফিঙ, সিদ্ধিটা যখন-তখন।”

“এমন আর বেশি কি। থাক এসব কথা। গল্প শেষ করুন তাড়াতাড়ি। আমার একটু কাজ আছে।”

“কাজ তো রোজই থাকে। মানে, আজ....”

“বাজে পাঁচালী না-প'ড়ে আসল যা শোনাবার, শোনান।”

“নেশা-ভাঙে জমিদারী উবে গেল দশ-বারো বছরের মধ্যে........”

বাবা জগদীশনাথ থেমে যান।

সঙ্গে সঙ্গে মেনকা মার প্রশ্ন—

“কি হল? মুখ বন্ধ করলেন কেন?”

“মানে, আপনি, মানে, কি মনে করবেন। তা-ছাড়া, মানে, আপনার আবার কাজ আছে।”

“যে লোকের পাল্লায় পড়েছি। মনে করা-করির উপায় আছে? কাজ এখন গোল্লায় যাবে। আপনার কথা না-শুনলে রক্ষে আছে? খাঁটি খাঁটি যা ঘটেছে জীবনে, নিঃসঙ্কোচে আউড়ে যান। পেট খালি হলে আপনি নিশ্চিন্ত, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবো।”

খোঁচাটা বিঁধলো বেশ। নিরুৎসাহ হয়েই বাবা জগদীশনাথ আরম্ভ করলেন আবার—

“সম্পত্তি ফুঁকে যেতে হাত দিলাম গাঁজার কারবারে। মানে, তার জন্যেই বাংলা দেশে আসা। পয়সার লোভে টানা-পোড়েন করতাম বারবার।”

“ও। এইবার সব সাফ হয়ে আসছে। চোরা চালানের গাঁজা বেচতে বেচতে ভেক ধরলেন, কেমন?”

ক্ষুণ্ণ বাবা জগদীশনাথ প্রত্যুত্তর করলেন—

“হ্যাঁ। কিন্তু, এ শর্মা কখনও মাল নিয়ে বাজে খদ্দেরের কাছে যায়নি।”

"জমিদারের ছেলে। ইজ্জৎ আছে।"

"আলবৎ। আমার কাছ থেকে নিতো পাইকেররা।"

"অত সব জেনে কি করবো। আমি তো আর গাঁজার ব্যবসায় নামছি না।"

মুখ হাঁড়ি ক'রে বাবা জগদীশনাথ নির্বাক ব'সে রইলেন।

মেনকা মা বুঝলেন, রাগটা অহেতুক নয়। তাই উৎসাহ দিলেন,

"থামলেন কেন? শুনতে মন্দ লাগছে না।"

"আপনার কথায় সব গোলমাল হয়ে গেল।"

"তাতে আর কি। মনে করিয়ে দিচ্ছি। গাঁজার কারবারে বাংলা দেশে আসতেন……"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে আবার। মানে, গাঁজার ভাল বাজার বাংলায়। নিয়ে এলেই নগদ টাকা। খদ্দের মিলে যায় হাতের কাছে। কয়েক খেপ চালিয়ে সাহস বেড়ে গেল। মানে, বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। তারপর ধরা পড়লাম একদিন।"

"জেল হয়েছিল? না, শুধু জরিমানা?"

"মানে, আবগারি ইনস্পেক্টরকে ভাল ক'রে কষিয়েছিলাম। তাই কয়েদ হল তিন বছরের।"

"তারপর?"

"আদালত থেকে নিয়ে গেল জেলে।"

"সেখানে তো আর নেশার জিনিস পাননি।"

"তা কেন হবে। মানে, গোড়ার দিকে অসুবিধে হয়েছিল। কিছুই জুটতো না।"

"কি করলেন তখন?"

"পায়খানা সাফের কাজ নিলুম।"

"আরে রামো! ভদ্রলোকের ছেলে, জমিদারের ঘরে জন্ম। শেষে মেথরগিরি! ঘানি টানলেই পারতেন।"

"এই তো! জানেন না! জেলের নিয়ম বড় মজার। বিঁড়ির

জন্যে ভাল ভাল আসামী পায়খানা পরিস্কার করে। যা বিঁড়ি পেতাম, কোনও রকমে চালিয়ে নিতাম প্রথম প্রথম। মানে, শেষে হাল-চাল বুঝে, কায়দা-কানুন শিখে সব ব্যবস্থা ক'রে নিলাম।"

"কিরকম?"

"খানকয়েক গিণি সব সময় লুকোনো থাকতো সঙ্গে। হাজতে চব্বিশ ঘণ্টা মুখে পুরে রাখতাম। মানে, জেলের ভেতর মদ জোটে না। অন্যসব পাওয়া যায়। গিণি বেচে গাঁজা, ভাঙ জোগাড় করতাম।"

"সে কি? জেলে গিণির কারবার?"

"নিশ্চয়। বিক্রী হয়েছিল বাইরে। মানে, বাটা লেগেছিল অনেকটা। কিন্তু তা নইলে তিন বছরে পেট ফুলে অক্কা পেতাম। সোনা-রূপো-টাকা-পয়সা, আফিঙ-গাঁজা-ভাঙের জন্যে জেলে কত সময় চোরাগোপ্তা মারপিট চলে। মানে, আমাকেও খতম করবার তালে ছিল একজন।"

"বালাই ষাট।"

মনের আনন্দ হজম করতে বাবা জগদীশনাথ একটু থামলেন। মেনকা মা তাড়া লাগালেন—

"থামবেন না। বেশ জ'মে উঠেছে।"

"না, মানে, থামি নি। সারাটা দিন এক রকম কাটতো। বিকেলে লুকিয়ে গাঁজা টেনে সন্ধ্যের পর খাওয়া সেরে শুয়ে পড়তাম। নেশা ছুটতো খানিক্ষণের মধ্যে। নোংরা কম্বলে ভয়ানক গা চুলকোতো। মানে, তার ওপর মশা-ছারপোকার কামড়। একবার ঘুম ভাঙলে আর উপায় থাকতো না। নানা রকম চিন্তায় রাত কাবার হত। এই ভাবে বছর আড়াই খতম করলাম। শেষে মনটা কিরকম লাগতো। ঠিক করলাম, সন্ন্যাসী হব। হাজার হোক, মোক্তার আর জমিদারির রক্ত আছে গায়ে। এ লাইনে তাই পশার জ'মে উঠেছে।"

"জেল থেকে বেরুলেন কবে ?"

মেনকা মার ঔৎসুক্যে বাবা জগদীশনাথের উৎসাহ রীতিমত দানা বাঁধলো, উত্তর করলেন,

"দাঁড়ান, পাক্কা হিসেব দিচ্ছি।"

তিনবার কর গুণে আওড়ালেন—

"এই পুরো সতের বছর।"

"তা কখনও হতে পারে ?"

"না হয়ে যায় কোথা। তারিখ শুদ্ধু মনে আছে আমার।"

"তাই নাকি ?'

"শুনুন।"

ধরা পড়ার দিন থেকে জেল-হাজত, মামলা, সাজা, খালাস—বাবা জগদীশনাথ সব কটার সন-মাস-তারিখ বললেন একে একে।

"খেয়াল করিনি। আবার শুনি।"

বাবা জগদীশনাথ মেনকা মার অনুরোধ রক্ষে করলেন সঙ্গে সঙ্গে।

"যাক। এতক্ষণে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি সত্যিই অদ্ভুতকর্মা। আপনার জুড়ি মিলবে না।"

বাবা জগদীশনাথের একদম তুরীয় অবস্থা দেখা দিল।

"আমার কাছে এত কথা, এত কাহিনী বললেন। এর আগে পুরো একটা বছর কাছাকাছি থেকেছি দিনরাত। কিন্তু, যেমন আপনি, তেমনই আমি। আজ পর্যন্ত আপনার আসল নামটাই জানতে পারিনি"—

মেনকা মার চোখে বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেল।

"বাবা নাম রেখেছিলেন বাণেশ্বর।"

"আপনারা কায়েৎ ?"

"না। চাটুজ্জে। নিকষ কুলীন।"

"আমরাও রাঢ়ী। তবে ভঙ্গ।"

বাবা জগদীশনাথ চেয়ারটা টেনে সোফা ঘেঁষে বসলেন।

কিন্তু, ঘনিষ্ঠতার মুখেই ছেদ পড়লো মেনকা মার বেয়াড়া সম্ভাষণে—

"বেশ। আজ তবে আসুন। আমার আবার হাঙ্গামা রয়েছে।"

খানিকক্ষণ বোকার মত চেয়ে থেকে বুকফাটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাবা জগদীশনাথ পাগড়ি মাথায় আঁটলেন, চশমায় চোখ ঢাকলেন, উঠেও দাঁড়ালেন।

তারপর হাত জোড় করে নিচু গলায় বিদায় নিলেন,

"যাই তাহলে আজ? কেমন?"

"হ্যাঁ।"

"সামনের মঙ্গলবার আসছি।"

মেনকা মা সাড়া দিলেন না।

বাবা জগদীশনাথ বেরিয়ে গেলেন আস্তে আস্তে।

ষোল

যমুনা-ধামে কুঞ্জগৃহের দরজা বন্ধ। ভেতরে প্রভু কিশোর ঠাকুর মহা ব্যস্ত। মেক্‌-আপ করছেন। কিন্তু, তার মধ্যেও ঝামেলা। ভ্রূতে পেন্সিল টেনে গালে রঙ ঘষতে না-ঘষতেই বাইরে থেকে বাধা এল। কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে। থামার নাম নেই। একটানা ঠুক ঠুক চালিয়ে যাচ্ছে।

"কি আপদ! কালই ব'লে দিয়েছি, কারুর সঙ্গে দেখা করবো না আজ"—মনে মনে গজগজ করতে থাকেন প্রভু কিশোর ঠাকুর।

দরজার টোকা বন্ধ হয় না।

টুনুর আওয়াজ পাওয়া যায়। সে বলছে—

"আঃ, করেন কি? প্রভুর আজ মহাভাব। বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন কেন?"

"হোক। তবু আমি দেখা করবো।"

জবাবটা নারী-কণ্ঠের। প্রভুর অতি-পরিচিত গলা।

প্রভু কিশোর ঠাকুর ভেতর থেকে বিরক্তি জানান জোরে 'উঁ-উঁ-উ-হুঁঃ" ক'রে। শব্দটা বাইরে আসে।

"ও ঠাকুর, ঠাকুর! আমি কুন্তলা।"

প্রভু সাড়া দেন,

"হুঁ।"

টুনু নেমে গেল। তার পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটু বিরতি। তারপর আবার একঘেয়ে ঠুক-ঠুক-ঠুক-ঠুক।

কুন্তলা ধৈর্য হারাচ্ছে।

মেয়েটা নেহাৎ জেদী। নড়বে না। দরজা না খুললে বাইরে বসেই ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না শুরু ক'রে দেবে। প্রভু কিশোর ঠাকুর তাকে হাড়ে হাড়ে চেনেন।

টোকা এবার ধাক্কায় দাঁড়াচ্ছে।

ব্লাউজ খোলা হয়েছে। সাড়ি ছাড়তে ছাড়তে প্রভু কুন্তলাকে নিরস্ত করেন "রোসো" ব'লে। মাথার পরচুলা নামিয়ে মুখের রঙ তুলতে থাকেন তোয়ালে দিয়ে।

এর মধ্যে কপাটে জবর রকমের ধাক্কা, সঙ্গে আর্তনাদ—

"ঠাকুর! ঠাকুর গো!"

প্রভু কিশোর ঠাকুর সাড়ি-ব্লাউজ-পরচুলা একসঙ্গে তোয়ালেতে মুড়ে রাখলেন আয়নার পেছনে। রঙ-টঙ গেল ড্রয়ারের মধ্যে।

"আমি ছাত থেকে লাফিয়ে পড়বো রাস্তায়।"

কুন্তলার জেহাদ ঘোষণায় রীতিমত দৃঢ়তা ছিল। তুচ্ছ কারণে দেওয়ালে ওর মাথা ঠোকার দৃশ্য মনে পড়লো প্রভুর।

আর দেরি করতে সাহস হল না। ছিটকিনি নামিয়ে প্রভু দরজার একটা পাল্লা টানলেন ভেতরের দিকে।

কুন্তলার তর সইলো না মোটে। হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে এপাশে ওপাশে কি যেন খুঁজতে লাগলো। তারপর প্রভুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিল বার-কয়েক।

কুন্তলার মুখে রীতিমত কাঠিন্য ঘনিয়ে এসেছিল।

কিন্তু, মেয়েটির ভাব পাল্টালো তখনই। ভ্রূ বাঁকিয়ে চটুল রহস্যের দৃষ্টি হেনে সে বললো—

"মহাভাবের মধ্যে ঘাড়ে, কানে রঙ! এটা তাহলে নতুন লীলা! শিশিটা দিন না, ঠাকুর। আনাড়ি হাতে এসব চলে না। আমি পেইন্ট করলে এমন দশা হত না।"

"শিশি? শিশি কিসের?"

"কেন, রঙের। ভ্রূ আঁকার পেন্সিলও তো রয়েছে।"

"কি যে ঠাট্টা কর"—

প্রভু কিশোর ঠাকুর যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তবুও তাঁর

সর্বাঙ্গে অপরাধীর অস্বস্তি ফুটে উঠলো, গলায় ভুয়ো জবানবন্দির অস্পষ্টতা প্রকাশ পেল।

কুন্তলা তাঁর কথা উড়িয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে—

"ঠাট্টা? মেয়েছেলের চোখকে এত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না। দাঁড়ান, খুঁজি।"

প্রথমেই সে গেল আয়নার দিকে। প্রভু কিশোর ঠাকুর একদম স্থাণু হয়ে রইলেন। মেয়েটার হাতে তোয়ালে-জড়ানো সাড়ি-ব্লাউজ পরচুলা দেখেও সাড়া দিলেন না। সেগুলো আবিস্কার ক'রে কুন্তলা দাঁড়ালো খানিকক্ষণ। সাড়িখানা খুললো—দেখলো নেড়েচেড়ে। ব্লাউজটা বার-কয়েক তুলে ধরলো মুখের সামনে। দু-হাতে পরচুলা ছড়িয়ে নিয়ে কি যেন ভাবলো। কিন্তু, বেশিক্ষণ নয়।

কপালে, চোখে, নাকে, ঠোঁটে ক্রুর জিজ্ঞাসা নিয়ে কুন্তলা চকিতে এবার ভিন্ন মূর্তি ধরলো।

"এসব কি, ঠাকুর? মহাভাবের বাকী সব মাল-মশলা কোথা।"

কুন্তলার ধমকে প্রভু কিশোর ঠাকুর হকচকিয়ে যান। সাফাই তৈরি করতে জিভ আড়ষ্ট হয়ে পড়ে—

"না, না, তা নয়, তা নয়। ওসব কি বুঝতেই পারছি না মোটে।'

"বুঝতে পারছেন না? জানেন না আপনি?"

"সত্যি জানি না।"

"তাই নাকি?"

"আপনার এ ঘরে আপনি না-থাকলে কেউ ঢুকতে পায় না। এখানে আয়নার পেছনে সাড়ি-ব্লাউজ-পরচুলা এল কোত্থেকে?"

"কেউ রেখে গিয়েছে নিশ্চয়।"

"ভূতের কাণ্ড, কেমন? আপনি থাকতে ভূতের আনাগোনা? আমাকে কচি খুকি ঠাওরাবেন না।"

"কি যে আবল তাবল বকছো, কুন্তলা! আজ তোমার মাথাটা বেশ গরম দেখছি।"

"ঠাকুর!"

কুন্তলা কাঁপে—

"এসব কি, বলতেই হবে। কোনও ওজর শুনবো না। বলুন, ব-অ-লু-উন!"

অবস্থা যে রীতিমত বেগতিক, প্রভু কিশোর ঠাকুর সেটা উপলব্ধি করলেন এবার।

কুন্তলার কপোলে অশ্রুমালা। প্রবল প্লাবনের সূচনা। তাকে ঠাণ্ডা না-করলে চলবে না।

প্রভু এগিয়ে গেলেন তার দিকে। হাসতে হাসতে আদরের আমেজে নতুন ভণিতা ধরলেন—

"আরে, তোমাকে একটু রাগাচ্ছিলাম। রাধার অভিশাপ মনে আছে তো—মরিয়া হইব নন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা। রাধার বেশে মহাভাবস্থ হব, ভেবেছিলাম। রাধা পরমা প্রকৃতি। রাধার ভাবই মহাভাব। তুমি না-এলে এতক্ষণে আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। বাধা পেলাম তোমার জন্যে।"

"ঠাট্টা নয়। গোপন করেছেন আমার কাছে। কেন করলেন? ওসব কেউ রেখে গিয়েছে, বললেন কেন?"

কুন্তলার চোখ তখনও ভিজে।

"আসল কথা শুনলে তুমি যে ঘাবড়িয়ে যেতে। আমি রাধার মহাভাবে মত্ত হলে তোমার দশা কি দাঁড়াবে!"

প্রভু কিশোর ঠাকুর এবার চাপা গলায় গান শুরু করলেন, "মরিয়া হইব নন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা।"

কুন্তলা অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

তার হাত দুটো ধ'রে মোলায়েম আওয়াজে প্রভু কলিটি গাইলেন বার কয়েক। তারপর কোঁচার কাপড় দিয়ে তার চোখ দুটো মুছে দিলেন।

কুন্তলা তখনও শান্ত হয়নি।

ঠাকুরের হাত ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো তাঁর চোখের ওপর চোখ রেখে—

"ঠাকুর! আপনার মুখে যা শুনলাম, সব ঠিক?"

"ঠিক, ঠিক, ঠিক। তিন সত্যি করলাম।"

কুন্তলার বিকার কাটলো আরও অনেক পরে।

দরজা খুলে সে বেরিয়ে গেলে প্রভু স্বগতোক্তি করলেন, "অনেক কষ্টে রেহাই পেয়েছি। আজ আর যাওয়া হল না। এখন সেই সামনের শনিবার পর্যন্ত পুরো একটা হপ্তা হা-পিত্যেশ ক'রে থাকা। কি ভাববে সে, কে জানে।'

টুনু এল।

প্রভু তাকে দেখেও দেখলেন না।

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। শেষে জিজ্ঞেস করলো, খাবার আনবে কিনা।

খাটে শুয়েই চরম ক্লান্তিতে শুধোলেন,

"খাবার? কি ব্যবস্থা আজকের?"

"মাংস-পরোটা।"

"শুধু মাংস-পরোটা? আর কিছু নেই?"

"না। কালকের দই রয়েছে একখানা।"

'উঁহু। রাত্তিরে দই নয়। শিক-কাবাব দেখ।"

"সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।"

"দোকান বন্ধ? রাত কটা?"

টুনু জবাব দিল, "প্রায় একটা।"

"আনো তবে মাংস-পরোটা।"

সতের

ঠিক এক হপ্তা পরে শনিবার। রাত নটায় প্রভু কিশোর ঠাকুরকে দেখা গেল মেনকা মার আশ্রমে। মোহিনী বেশ। তিনিই কথা বলছিলেন।

"গত হপ্তায় শরীরটা খুব খারাপ ছিল। এখনও ভাল নেই। নেহাৎ মনের জোরে আসতে পেরেছি।"

মেনকা মা মন্তব্য করলেন,

"না-আসাই উচিত ছিল।"

"না-এলে আরও কাহিল হতাম। মাথা ঘোরে অনবরত। চোখ চাইলে সব অন্ধকার দেখি। কালও বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম।"

"তা হবে। দেখে অবিশ্যি ওরকম মনে হয় না। ব্লাড-প্রেশার আছে নিশ্চয়।"

"প্রেশার টেশার নেই। আমার মত অবস্থা হলে টের পেতেন। কোনও রকমে ধড়ের মধ্যে প্রাণটা ধুক ধুক করছে।"

"একেবারে 'সখি, ধর ধর' ভাব, কেমন?"

"কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দেবেন না।"

"যাকগে। আপনাকে কিন্তু মেয়ের সাজে বড্ড মানায়।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন,

"রাস্তায় চেয়ে দেখে সবাই। আপনার বীরুও খাতির জমাতে চেষ্টা করে।"

"প্রথম দর্শনে আমিই তো ধরতে পারিনি। কিন্তু, মেয়েছেলের মত জামা কাপড় চুলইতো সব নয়। চাপলে গলাটা অবিশ্যি মিহি হয়। তবু, মেয়েদের আসল কোনও গুণ তো আপনার নেই। রান্না, নাচ-গান পারেন?"

"রাঁধিনি কখনও। তবে চেষ্টা করলে, পারি। আর নাচ-গানের কথা বলছেন? কথাকলি, কথক, মণিপুরী, সাঁওতালী,

আধুনিক—সব অভ্যেস ছিল। গান শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।”

“তাহলে তো আপনি ভয়ানক রকমের চৌকোষ। পরখ ক'রে দেখতে চাই।”

“গান ধরি ?”

“না, না। গান থাক আজকে। নাচ হ'ক খানিকটা।”

“ঘুঙুর আছে তো? তবলা বাজাবে কে? বীরু?”

“ঘুঙুর-তবলা কোথায় পাবো! এমনিই দেখান।”

প্রভু কিশোর ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন। তালে তালে পা ফেলে হাতের ভঙ্গি ভাঁজলেন কয়েকটা।

মেনকার মা সোফা ছেড়ে গেলেন আলমারির কাছে।

আলমারি খুলে তিনি হাতে নিলেন ছোট্ট একটা ক্যামেরা। ফ্ল্যাশ-বাল্ব লাগানো তার মাথায়।

প্রভু ঘুরে দাঁড়ান, অভিযোগ করেন—

“নাচতে হুকুম দিয়ে দেখবার নাম নেই।”

মেনকা মা ঘরের সব কটা আলো জেলে দেন। ফুটে ওঠে দিনের রোশনি।

নাচ থামিয়ে চোখ পিট পিট করতে করতে প্রভু কিশোর ঠাকুর বলেন—

“ওরেব্বাস! এত আলোয় কি হবে? চোখ ধাঁধিয়ে গেল যে।”

মেনকা মা উত্তর দেন—

“উঁ-হুঃ। নাচের জন্যেই তো আলোর ব্যবস্থা। বন্ধ করবেন না। এমন নাচ জীবনে দেখিনি। ফটো তুলবো কয়েকখানা।”

দুচোখ কচলিয়ে প্রভু পোজ নিলেন। একেবারে ত্রিভঙ্গমূর্তি, হাসি-হাসি মুখ।

ফ্ল্যাস-বাল্ব জ্ব'লে উঠলো। তারপরও ক্লিক ক্লিক আওয়াজ

হল কয়েকবার। চোখ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে মেনকা মা বললেন,

"নাচুন ঘুরে ফিরে।"

প্রভু এবার জোর কদমে হাত-পা চালাতে লাগলেন। মেনকা মা আরও কয়েকখানা স্ন্যাপ নিলেন। শেষে ক্যামেরাটা আলমারিতে রেখে এসে বসলেন নিজের জায়গায়।

প্রভু কিশোর ঠাকুর তখনও ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। মেনকা মাকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

জোর একটা তেহাই লাগিয়ে প্রভু দাঁড়ালেন সোফার সামনে।

"ঘুঙুর নেই, বাজনা নেই, তবলা নেই।"

কোনও সাড়া দিলেন না মেনকা মা।

তবু সগর্ব হাসিতে মুখ ভরিয়ে, মাথা নাড়িয়ে, কোমর দুলিয়ে প্রভু শুধোলেন—

"কেমন দেখলেন ?"

"মন্দ নয়।"

শুধু "মন্দ নয়!" প্রভু মুশড়িয়ে যান এই সংক্ষিপ্ত বেয়াড়া অভিমত শুনে।

মেনকা মা কিন্তু একেবারে নিরুত্তাপ।

প্রভু কিশোর ঠাকুর সলজ্জ ভাবে কায়দামাফিক ত্রুটি স্বীকার করলেন—

"অভ্যেস নেই আজকাল।"

মেনকা মা নির্বাক, নির্লিপ্ত।

প্রভু বসলেন এবার।

মেনকা মার কি যেন মনে পড়লো। তিনি মাথাটা দোলাতেই তারিফ শোনবার আশায় প্রভু সোৎসাহে কান খাড়া করলেন।

"জগদীশনাথ কিন্তু লোকটি ভাল।"

য়্যাঁ? কার নাম করছে? প্রভুর মনটা বিগড়িয়ে গেল। নাক ফুলিয়ে, কপালে রেখা ফুটিয়ে বললেন,

"ও আবার মানুষ। আস্ত একটা মোষ। আজকাল আসে নাকি?"

"আসতে দোষ কি।"

মেনকা মার খোঁচাটা বে-আব্রু। তবুও প্রভু সামলে নেন—

"না, দোষ ঠিক নয়। তবে, এখানে হাজরে দেওয়া কি সহজ কথা? তার মত মাথা-মোটা পেটুক কি অত ঝক্কি পোয়াতে পারে? বুদ্ধিও একেবারে ঠনঠন।"

"কেন পারবে না? ইচ্ছে থাকলে উপায় ঠাওরাতে কতক্ষণ? গোলমালের সময় তিনি তো এসেছিলেন আগে। তাঁর ওপর দেখছি, রাগটা কম নয়। এতদিন একসঙ্গে ছিলেন। কোনও চটাচটিতো চোখে পড়েনি।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর মাথা নিচু ক'রে থাকেন।

মেনকা মা কিন্তু থামেন না।

"জমিদারের ছেলে।"

প্রভু এবার মুখ খোলেন—

"রাখুন ওর বড়মানষি। জমিদার! চেহারায় তো খাঁটি জমাদার। জমি থাকলে আর আমাদের পথে আসতো না।"

"গায়ে বেশ জোর আছে।"

সারা দেহ ঝাঁকিয়ে প্রভু ফোঁস ক'রে ওঠেন—

"কি ক'রে জানলেন?"

"অত চেঁচাবেন না।"

মেনকা মা এবার রুক্ষ।

ঝামেলা বুঝে প্রভু ঠাণ্ডা মেজাজে রায় দিলেন—

"গায়ে জোর আছে, না হাতী।"

"দস্তুরমত পালোয়ান।"

"পালোয়ানির গল্প করেছে বুঝি? গুল, গুল। দমবাজ। চালবাজ। গ্যাস দিতে ওস্তাদ।"

"না, না। চালবাজ হতে যাবে কেন।"

"তবে কি কোনও প্রমাণ পেয়েছেন?"

"সেটা শুনে আপনার লাভ?"

ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে আন্দাজ ক'রে প্রভু কিশোর ঠাকুর এবার ভেঙে পড়েন। সাশ্রু অনুনয়ের গাঢ়তায় গলা বুজে আসে—

"বলুন, বলুন না।"

"দেখি, ভেবে।"

"দয়া ক'রে বলুন।"

প্রভু দুহাতের পাঞ্জা ঘষাঘষি করছিলেন।

"নাঃ। আজ নয়।"

"তবে, কবে?"

"আসছে শনিবার।"

"কেন, আজকে কি দোষ?"

"রাত কত হয়েছে, খেয়াল আছে? বাড়ি যান। গেরস্ত ঘরের বৌ। এরপর রাস্তায় কেলেঙ্কারি ঘটতে পারে।"

মেনকা মা মুখ ঘোরালেন।

প্রভু ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন।

"জলদি স'রে পড়ুন।"

কথা বাড়াতে সাহস হল না প্রভুর। উঠে বিদায় নিলেন—

"চললাম।"

মেনকা মা জোড়া পা তুলে দিলেন সোফার হাতলে।

আঠার

কাঞ্চন ব'সে কার্পেটের এক কোণে। বাবা জগদীশনাথ গদির ওপর টান হয়ে প'ড়ে আছেন। সিল্কের চাদরে গলা অবধি ঢাকা। একটা হাত বুকের ওপর। আর একটা হাতে চাপা প'ড়েছে চোখ দুটো। ঘুমোচ্ছেন কি জেগে আছেন, বোঝবার উপায় নেই।

কাঞ্চন ডাকে,

"বাবা, অ-বাবা।"

বাবা জগদীশনাথ নিস্পন্দ।

"বাবা, ঘুম এসেছে?"

সাড়া মেলে না কোনও।

"পা-টা টিপে দি-ই, বাবা?"

বাবা জগদীশনাথ নিথর।

কাঞ্চন হাত রাখে পায়ের ওপর।

এক ঝটকানিতে হাত যায় ছিটকিয়ে। চোখের চাপা না-সরিয়েই বাবা জগদীশনাথ খিঁচিয়ে ওঠেন—

"একটু শান্তিতেও থাকতে দেবে না?"

"শুধু সোমরসে শরীর টিকবে কেন, বাবা? ভোগ নেই। সেবা করতে দেবেন না........"

বাবা জগদীশনাথ নিঃশব্দ।

কাঞ্চন আস্তে আস্তে বাবা জগদীশনাথের হাঁটু ঘেঁষে এগিয়ে বসলো।

কপালের হাতটা নামিয়ে, মুখ তুলে, লাল চোখ পাকিয়ে বাবা চাইলেন তার দিকে।

কাঞ্চন স'রে গেল আগের জায়গায়, পায়ের নিচে।

বাবা জগদীশনাথ পেছন ফিরলেন।

সময় গড়াতে থাকে এই ভাবে। বাবা জগদীশনাথ ঘনঘন নিঃশ্বাস ছাড়েন।

কাঞ্চনও চুপচাপ। একবার নখে দাঁত বসায়, একবার কানের ওপর থেকে চুল সরায়, একবার হাতের রেখাগুলো লক্ষ্য করে।

হঠাৎ উঠে সে বাইরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো বাবা জগদীশনাথের পায়ে।

বাবা পা সরিয়ে নিলেন।

"এরকম জ্বালাবে তো……."

মাথা খানিকটা তুলে কাঞ্চন বললো—

"বাবা! আমি না-হলে যে আপনার একটি দিনও চলে না। আজকাল কেন এমন করছেন? কি অপরাধ হয়েছে আমার?"

"শরীর খারাপ শুনেও রেহাই দেবে না?"

"পা টিপলে ভাল লাগবে, বাবা।"

"পা, হাত, মাথা—কিছুই টিপতে হবে না।"

"বাবা!"

"আমার পা ছুঁয়ো না। স'রে ব'সো।"

"ছুঁতেও এখন দোষ, বাবা?"

"হ্যাঁ। একশোবার হ্যাঁ। হাজারবার হ্যাঁ। পা টেপার নিকুচি করেছে।"

"বাবা! আমি আজকাল চোখের বালি হয়ে দাঁড়িয়েছি।"

"বালি, কি অন্য কিছু, জানি না। তুমি আমায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছো।"

"বেশ, স'রে বসছি।"

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ তুলে বাবা জগদীশনাথ গর্জন করলেন—

"স'রে বসা নয়! নিকল যাও!"

"সোমরসের ঝোঁকে খামোকা মাথা গরম করছেন, বাবা—"

কাঞ্চন চোখ মুছলো।

দরজার দিকে আঙ্‌ল দেখিয়ে দাঁত কড়মড় করতে করতে বাবা জগদীশনাথ বীভৎস রকমের তাড়া লাগালেন—

"দূর হও!"

"পায়ে হাত বুলিয়ে দি-ই, ঘুম আসবে'খন।"

"না গেলে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করবো—"

বাবা জগদীশনাথ আচমকা উঠে বসলেন। চোখ লাল, মুখ হিংস্রতায় ভরা। কাঞ্চন এ মূর্তি দেখেনি কখনও। ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

ডান হাতটা সামনের দিকে ছুঁড়ে বাবা জগদীশনাথ প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়লেন—

"ফের দাঁড়ানো? ন্যাকামি?"

পড়ি-কি-মরি অবস্থায় কাঞ্চন এক ছুটে সিঁড়ি পর্যন্ত পঁওছালো।

নিচে থেকে আসছিল গৌরীবালা। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো,

"চল্লে?"

কাঞ্চনের থমথমে ভাব তার দৃষ্টি এড়ায়নি।

"হ্যাঁ। বাবার শরীরটা খুব খারাপ কিনা। কথা কইছেন না, চোখ চাইছেন না। বোধ হয় তন্দ্রা এসেছে একটু।"

"তা হোক। একবার দেখে যাই বাবাকে।"

কাঞ্চনকে একরকম ধাক্কা দিয়েই গৌরীবালা এগুলো।

বাবা জগদীশনাথ তখনও ব'সে। ফোঁস ফোঁস করছিলেন।

"আবার তুমি?"

বাবা জগদীশনাথের নিতান্ত কর্কশ আপ্যায়নে গৌরীবালার হাসিমুখ কালো হয়ে গেল।

"যাও।"

বাবার হুকুম ধারালো বর্ষার মত মনে বিঁধলেও গৌরীবালা বললো,

"হ্যাঁ, বাবা? কাঞ্চন বেড়ালের মত নুলো বাড়িয়ে পা টেপে। তাই বুঝি রাগ করেছেন?"

"তাতে তোমার কি? তুমি ইঁদুরের মত আঁচড়াও।"

"না, বাবা। ওর বয়েস হয়েছে তো।"

"তুমি কচি খুকি, কেমন?"

"গত অঘ্রাণে তিরিশে পা দিয়েছি, বাবা।"

গৌরীবালা ততক্ষণে কার্পেটে জায়গা নিয়েছিল।

এক লাফে দাঁড়িয়ে বাবা জগদীশনাথ তেড়ে গেলেন তার দিকে—

"যত সব হাভাতে মেয়ে-ছেলে!"

"বাবা-আ, বাবা গো ও—"

গৌরীবালা কঁকিয়ে উঠলো।

"মড়াকান্না ধরছো? ঢঙ? ঢের দেখেছি। অভী ভাগো! নইলে এক লাথিতে সিঁড়ি পার করবো।"

সিল্কের লুঙ্গি কোমরে আঁটতে আঁটতে বাবা ডান পা তুললেন।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি বাবা। এখুনি যাচ্ছি—"

গৌরীবালা তিন লাফে সিঁড়ি ধরলো। ভয়ে মুখ রক্তশূন্য। পেছন দিকে চেয়ে দেখার সাহস ছিল না তার। সামনে, সিঁড়ির শেষ মুড়োয় কাঞ্চন। সে নড়েনি সেখান থেকে।

"কি হল? হাঁপাচ্ছো যে?"

—কাঞ্চন রেখে ঢেকেই শোধ তুললো।

"কী আবার হবে? বাবা ব'সেছিলেন—"

গৌরীবালার উত্তর বাধো বাধো। সে সোজাসুজি কাঞ্চনের দিকে চাইতে পারছিল না।

"বললেন না কিছু?"

"তোমাকে যা বলেছেন। তা নিশ্চয়ই নয়।"

"সব শুনেছো?"

কাঞ্চনের প্রশ্নে বিদ্রূপের সঙ্গে কৌতূহলও ছিল।

"যা শোনবার, শুনে নেমে এলাম।"

"নেমে এলে, না, বাবা তাড়িয়ে দিলেন?"

"তাড়াবেন কেন? আমিই চ'লে আসছি।"

'ডাহা মিথ্যে কথা।"

"যাওনা বাবার কাছে, শুধিয়ে এস।"

"তোর জন্যেই তাহলে আমার কপাল ভেঙেছে!"

"তুই নচ্ছার! লজ্জা সরমের ধার ধারিস না।"

"পোড়াকপালী! আমি কেন নচ্ছার হতে যাব রে? তুই-ই নচ্ছার। বাবাকে গুণ করেছিস। এলো চুলে আসতে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।"

"ও সব তোর বিদ্যে। গুণ-জ্ঞান-তুক-তাক ছাড়া তোর আর আছে কি?"

"মুখ সামলাবি!"

"নিজের মুখ সামলা!"

কাঞ্চন রুখে যায়। গৌরীবালাও এগিয়ে আসে। সামনা সামনি দাঁড়ায় দুজন—একেবারে মুখোমুখি। বিঘৎখানেক ব্যবধান। দুজনেরই চোখে আগুন। দুজনেই নাক টানে, কোমরে কাপড় জড়ায়।

ব্যাপারটা গড়াতো অনেকদূর।

বাধা দিল বিশ্বনাথ আর বদ্রিনাথ। আর কেউ ছিল না ডেরায়। ঝগড়ার আওয়াজে তারা এসে দাঁড়িয়েছিল। হাতাহাতির উপক্রমে দুজনে দুজনকে টেনে নিয়ে গেল দুদিকে।

উনিশ

শনিবার রাতে প্রভু কিশোর ঠাকুরের সঙ্গে মেনকা মার বোঝাপড়া চলছিল। জগদীশনাথ-প্রসঙ্গে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে আসছিল। চেহারা দেখে মেনকার মার ধারণা, লোকটার গায়ে জোর আছে। পালোয়ানির কোনও প্রমাণ পাননি তিনি। একথা শুনে প্রভু কিশোর ঠাকুর বললেন,

"খেয়ে দেয়ে মোটা হলেও বাবা জগদীশনাথ আসলে ফাঁপা বেলুন। বাইরের খোলটা চুপ্‌সে গেলে আর কিছুই থাকবে না।"

মেনকা মা মাথা নাড়লেন সায় দিয়ে। প্রভুর উৎসাহ বেড়ে গেল, মুখে খই ফুটতে লাগলো।

"পাকা নাচিয়ে ছিলাম। অনবরত ডাক আসতো এখানে সেখানে। কত মেডেল-কাপ পেয়েছিলাম।"

"আছে সেগুলো?"

মেনকার মার প্রশ্নে প্রভু উত্তর করলেন,

"না। বিলিয়ে দিয়েছি।"

"ও। ....আজকাল বুঝি নাচ ভাল লাগে না?"

"ভাল লাগবে না কেন। কিন্তু, দেখাবো কাকে? আপনি অত ক'রে ধরলেন সেদিন। তাই কত বছর পরে নাচলাম।"

"চমৎকার নাচেন আপনি।"

"সত্যি ভাল লেগেছিল আপনার?"

"খাসা।"

"ঠাট্টা করছেন না?"

"আশ্চর্য মানুষ! ঠাট্টা আবার কি? মনের কথা।"

"তবুও, কি জানি......"

"জানজানির কি আছে?— নাচ দেখার পর থেকে রোজ বার-বার......"

মেনকা মা থামলেন একটু।

"য়্যাঁ? রোজ? বারবার? রোজ বারবার কি হয়?"

প্রভু মেনকা মার গা ঘেঁষে বসলেন। সর্বাঙ্গে ব্যাকুল আগ্রহ তাঁর। মুখটা ঝুঁকলো সামনে। জোড়া হাত এগিয়ে গেল।

মেনকা মা তাঁকে নিরস্ত করলেন—

"আপনি সামান্য ব্যাপারেই অধৈর্য হন। এটা আপনার বড় দোষ।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর বোকার মত চেয়ে রইলেন। তাঁর অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে দিলেন মেনকা মা—

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম। রোজ বারবার আপনার নাচের ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। কিন্তু, কিন্তু···এসব শুনে আপনার লাভ কি?"

"লাভ? কি লাভ আপনাকে কেমন ক'রে বোঝাবো?"

"থাক। আর বুঝিয়ে দরকার নেই।"

"য়্যাঁ? তবে?"

"তবে আর কি। কিছুই নয়। আচ্ছা, নাচ-গান ছাড়া ঐ ধরণের আর কিছু পারেন না?"

"থিয়েটারে নেমেছি অনেকবার। ভাল পার্ট করতাম।"

"সে তো খুব সহজ। অন্য কোনও বিদ্যে?"

"এমন কুকুর-বেড়ালের ডাক শোনাতে পারি যে, চোখে না-দেখলে মনে হবে একদম খাঁটি।"

"শোনান না।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর মুখ ঘুরিয়ে "মিউ, মিউ" করলেন।

"শাবাশ। ঠিক যেন মেনি বেড়াল।"

"কুকুরের ডাকটা শুনুন এবার।"

"না, না। কুকুর ছুটো ছাড়া রয়েছে। ছুটে এসে চীৎকার জুড়ে দেবে।"

"থাক তাহলে।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর মনমরা হলেন খানিকটা।

তাঁকে খুশী করবার জন্মে মেনকা মা আশ্বাস দিলেন—

"কুকুরের ডাকটা আর একদিন হবে। জোড়া য়্যালসেটিয়ানকে নিচের ঘরে আটকে রাখলেই চলবে।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর এ প্রস্তাবে সাড়া দিলেন না।

একটু হেসে মেনকা মা গানের কথা তুললেন—

"গাইতে পারেন, শুনলাম সেদিন। সেটা ঠিক তো?"

"নিশ্চয়। গানে আমার যথেষ্ট নাম ছিল।"

"কি গান?"

"টপ্পা, কেত্তন।"

"কোথায় শিখলেন এত?"

"আমাদের গ্রামে যাত্রাপার্টি ছিল। তার মাষ্টারের কাছে হাতে খড়ি। তারপর নিজের চেষ্টায় অনেকটা এগিয়েছিলাম। এ সব সাধনার জিনিস। কত কষ্ট করেছি।"

"বেশি না-চেঁচিয়ে একখানা শোনান দেখি।"

কিশোর ঠাকুর টপ্পা ধরলেন, "ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা, ঘুচলো ভবের আনাগোনা।" লালচাঁদ বড়ালের নকল ক'রে দু-একটা টানও দিলেন তাতে বাঁ-হাত নাড়তে নাড়তে।

গান কিন্তু অস্থায়ী ছেড়ে অন্তরার দিকে এগুলো না। খুশীভরা মুখে মেনকা মা বাগড়া দিলেন—

"থামুন এবার। পরীক্ষায় একদম ফার্ষ্ট।"

"তবুতো সবটা শুনলেন না।"

"ব্যস্ত কি! আর একদিন বাকীটা হবে।"

"তা বেশ, তা বেশ।"

মেনকা মা ফিরে গেলেন থিয়েটারের কাহিনীতে।

"আচ্ছা, আপনি থিয়েটারে কি ধরণের ভূমিকা নিতেন? রাজা,

ভাঁড়, দূত না কাটা-সৈনিক?—কোন পার্টে আপনি বেশি নাম করেছেন?"

"মেয়েছেলে সেজেছি বরাবর।"

"ও। তাই বলুন। সখের থিয়েটার। মানে ষ্টেজের যাত্রা। আজকাল কিন্তু যাত্রাদলেও পুরুষকে মেয়ে সাজানো উঠে যাচ্ছে।"

"মেয়ের পোষাকে আমায় কিরকম মানাতে পারে, তা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। পার্ট করতাম নিখুঁৎ। হাততালি পড়তো অনবরত।"

প্রভু গর্বে মাথা উঁচু ক'রে সিধে হয়ে বসলেন।

মেনকা মা বললেন,

"একখানা ছবি দেখেছিলাম, কর্দমে কমল।"

প্রভু মন্তব্য করলেন,

"বাংলা বায়স্কোপের নামে ঘেন্না আসে।"

"না, না। সে ছবি নয়। হাতে আঁকা। কি একটা পত্রিকায় বেরিয়েছিল অনেকদিন আগে। ঝাড়ু হাতে মেথরাণী, অপূর্ব রূপসী।"

"কর্দমে কমলের" রহস্য প্রভুর মাথায় গেল না। চুপ ক'রে থাকলে বোকামি ধরা পড়বে। তাই সাদা-মাঠা সমঝদারি জানালেন,

"নিশ্চয়ই ভাল আর্টিষ্ট।"

"হায় রে! একেবারে হাঁদা গঙ্গারাম। আর্টিষ্ট চুলোয় যাক। আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে কদিন ধ'রে, আপনাকে ঐ রকম বেশে কেমন মানায় দেখতে। কি জানি, কি মনে করবেন ভেবে কথাটা পাড়িনি এতক্ষণ।"

"এ আর এমন বেশি কি।"

"রাজি আছেন?"

"আদেশ দিলেই পারি। নতুন ঝাঁটা, বালতি আনিয়ে রাখবেন।"

"আনানোই আছে। আনকোরা। ঐ জানলার ধারে বেড-শীট দিয়ে ঢাকা।"

প্রভু কিশোর ঠাকুরের খটকা লাগলো খানিকটা। এত আগ্রহ! এ রকম তোড়জোড়! ঝাঁটা-বালতি কিনিয়ে এনে রেখে দিয়েছে ঘরে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টি জ'মে উঠলো তাঁর চোখে।

তাঁর মনের ভাব ধরতে পেরেই যেন মেনকা মা নিজে থেকে প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করতে চাইলেন,

"ইচ্ছে না-থাকে, দরকার নেই। গভীর রাতে চোখ বুজলে যখন আপনার চেহারা ভেসে ওঠে মনের পর্দায়, তখন ......"

মেনকা মা বেশ লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

সারা দেহে শিহরণ নিয়ে প্রভু গেলেন জানলার কাছে। ঢাকা সরিয়ে বাঁ হাতে নিলেন বালতি। ডান হাতে ঝাঁটা বাগিয়ে ধ'রে শুধোলেন,

"কেমন?"

—উত্তরের অপেক্ষা না-ক'রে সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলেন,

"ছি, ছি, এত্তো জঞ্জাল।"

এতটা মেনকা মার ধারণায় আসেনি। গানের প্রথম কলিতে তিনি বিস্মিত হলেন। দ্বিতীয় কলিতে সোফার কোন থেকে ক্যামেরা নিলেন। প্রথম কলি পুনরারম্ভের আগেই উঠে জ্বেলে দিলেন হাজার বাতির পাঁচটা আলো। প্রভু কিশোর ঠাকুর আবার দ্বিতীয় কলিতে ঘুরে আসতে আসতেই ফ্ল্যাশ-বাল্বের তীব্র চমক লাগলো সারা ঘরে।

পটাপট খানকয়েক ফটো তুলে মেনকা মা ক্যামেরাটা রাখলেন যথাস্থানে। প্রভু কিশোর ঠাকুর গাইছিলেন,

"হরদম লাগাতা ঝাড়ু......"

"বা ভাই, বা ভাই। আজ আমার চোখ দুটো সার্থক। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে—সব সময় মনে পড়বে এই দৃশ্য।"

প্রশংসা শুনে প্রভু কিশোর ঠাকুর বড় একটা পাক দিলেন। পরচুলা ছুটে গেল মাথা থেকে।

'দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। বিশ্রাম করুন এবার।"

"আমার যা দম রয়েছে, তাতে আরও ঝাড়া একঘণ্টা একসঙ্গে নাচ-গান চালাতে পারি।"

"আচ্ছা। দেখা যাবে পরখ ক'রে।"

"এখনই দেখুন।"

"অন্য একদিন।"

"আর একদিন কেন?"

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে ওপরের দিকে চোখ রেখে মেনকা মা বললেন,

"এরপর তো কত দেখবো, কত শুনবো।"

প্রভু পরম পরিতোষে পরচুলাটা মাথায় বসাতে যাচ্ছিলেন। মেনকা মা অমনি "দাঁড়ান" ব'লে চট ক'রে গেলেন আলমারির সামনে। হাতে ক্যামেরা। প্রভু কিছু আন্দাজ পেলেন না। আলমারি খুলে চোস্ত হাতে ক্যামেরার লাগোয়া ঢাকনিতে নতুন ফ্ল্যাশ-বাল্ব জুড়লেন। প্রভু কিশোর ঠাকুরের মনে হল, চুল ছাড়া ভাল দেখাচ্ছে নিশ্চয়।

"এদিকে ফিরুন না একবারটি।"

মেনকা মার কথায় প্রভু আলমারি-মুখো হয়ে দাঁড়ালেন। মেনকা মা ক্যামেরায় চোখ লাগালেন, ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বললো, আওয়াজ হল ফটো তোলার।

প্রভু কিশোর ঠাকুর একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন।

মেনকা মা আবার এসে সোফায় বসলেন।

পরচুলাটা আঁটতে আঁটতে চিন্তিত মুখে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন,

"ফটোর সব তৈরি থাকে আপনার?"

"হ্যাঁ। এটা আমার নেশা।"

"এখানে থাকবার সময় দেখিনি তো।"

"কি মনে করবেন ভেবে আপনাদের সামনে বার করিনি। এখন তো আর মনে করাকরির ভয় নেই।"

প্রভু কিশোর ঠাকুরের অজানা আশঙ্কা কেটে যায়। জায়গা নেন গিয়ে সোফায়।

মেনকা মার চাউনি কিন্তু উদাস। ভাবাবিষ্টের মত তিনি বলতে থাকেন—

"বাবা মা কত চেষ্টা ক'রেছিলেন নাচ-গান শেখাতে। রোজ মাষ্টার আসতো। ফাঁকি দিতাম বরাবর। বয়েস বেড়ে গেল। মা কত বকতেন, গায়ে মাখিনি।"

কিশোর ঠাকুর জুড়ে দেন সাগ্রহে—

"খুশী হলে, আকর্ষণ থাকলে, খাটলে যে কোনও বয়েসে শেখা যায়।"

"এখন ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু, কি ক'রে শিখবো, কার কাছে শিখবো।"

"কেন? আমি আছি।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর উৎসাহে সিধে হলেন।

"মাথা খারাপ! আবার সেই সা-রে-গা-মা, ধুপধাপ পা ফেলা! আমি নাচ-গান আরম্ভ করলে ভক্তেরা সব ভেগে যাবে।"

"ছাতের ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে রেওয়াজ চালালে কেউ টের পাবে না।"

"হুঁ। আমি না হয় লুকিয়ে চুরিয়ে আরম্ভ করবো। কিন্তু, দুদিন পরে তো আপনার টিকিটি দেখতে পাব না।"

"হুকুম হলে রোজ আসবো।"

"রাখুন ও সব মন-রাখা কথা। যে লোক আপনি। আজ এখানে এসে মিঠে বুলি কপচাচ্ছেন, কাল আর এক জায়গায় অন্য কারুর মন ভেজাবেন স্তব-স্তুতিতে।"

"আমাকে, আমাকে অতটা হীন ভাবেন আপনি ?"

প্রভু কিশোর ঠাকুরের চোখ ভিজে উঠলো, মাথার ঝাঁকুনিতে পরচুলা ঢিলে হয়ে গেল। দুহাতে মুখ ঢেকে তিমি ফোঁপাতে আরম্ভ করলেন।

মেনকা মা তাঁর পরচুলাটা নামিয়ে রাখলেন আস্তে আস্তে। মাথায় হাতও বুলিয়ে দিলেন খানিকটা। সঙ্গে সঙ্গে ফোঁপানি বন্ধ। প্রভু মুখের হাত সরালেন। ভাবালু ভরা চোখে চাইলেন মেনকা মার দিকে। তারপর আচম্বিতে লাফিয়ে উঠলেন তড়াক ক'রে।

"কি প্রমাণ দোবো ? বুক চিরে দেখানো যায় না। তবু, তবু..................."

—আবেগে তাঁর কথা আটকিয়ে গেল।

"থিয়েটার-সিনেমায় নামলে বেশ পশার হত আপনার।"

এটা মেনকা মার প্রশস্তি, বিদ্রূপ, না অভিযোগ ঠাওরাতে না-পেরে প্রভু চাপা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—

"সব হিসেব-নিকেশ শেষ হয়ে গেলেই তো আপনি খুশী ? আমার নামটা শুধু থাকবে প'ড়ে। আসা না-আসার বাইরে পাড়ি দোবো আমি। এ দেহ ছাই হয়ে মিলে যাবে হাওয়ায়। এমন দিনই তো চান আপনি ? বেশ, তাই-ই হবে।"

"না, না। অত কাণ্ডের দরকার নেই। স্রেফ কান ধ'রে প্রতিজ্ঞা করুন, কখনও ভাঁওতা দেবেন না আমার কাছে, জালিয়াতি করবেন না।"

"আমি ভাঁওতাবাজ ? জালিয়াৎ ?"

"তা নয়, তা নয়। তবে হতে কতক্ষণ। শেষে আমি সারা জীবন পস্তাই আর কি।"

প্রভু মেনকা মার চোখে চোখ রাখেন। মেনকা মা স্থিরদৃষ্টি। প্রভু কিশোর ঠাকুর চোখ নামান, আবার ওঠান। মেনকা মার চোখ নড়ে না।

"কি দেখছেন বারবার ?"

এ প্রশ্নে প্রভুর একটু লজ্জা হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলিয়ে মুচকি হাসি শুরু করলেন।

"না-হেসে ব'লে ফেলুন। লজ্জার কি ?"

"কান ধ'রলে আপনি খুশী ?"

"হুঁ।"

"তাহলে কবুল করছি, কখনও কোনও দিন আপনাকে ভাঁওতা দোবো না, আপনার কাছে মিছে কথা বলবো না।"

"কানমলায় হচ্ছে না, ঠাকুর। দু হাতে দু কান পাকড়িয়ে দাঁড়ান খানিকক্ষণ। তারপর শপথ করুন।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর কান ধ'রে জিজ্ঞেস করলেন—

"দিব্যি গালতে হবে ?"

"আগে দশবার ওঠা-বসা, তারপর প্রতিজ্ঞা।"

সোফা ছেড়ে সামনে গিয়ে প্রভু আস্তে আস্তে বৈঠক শুরু করলেন। জোরদার আলো কটা জ্বালাই ছিল।

মেনকা মা আবার ক্ষিপ্রগতিতে আলমারির কাছে হাজির হলেন, ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ-বাল্ব লাগালেন, সোফাতে ফিরে এসে ক্যামেরাটা ধরলেন তাগ ক'রে। ফটো উঠলো একখানা।

প্রভু হতভম্ব। আটবার ওঠ-বোসের মধ্যে এত কাণ্ড। বন্ধ করতে সাহস হল না। কসরতের শেষে কি বলবেন মাথায় এল না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ক্যামেরাটা দেখতে লাগলেন।

"এইবার শপথ।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর হুকুম তামিল করলেন—

"সব ঠাকুর-দেবতার দিব্যি, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, শ্রীমতী মেনকা দেবীর কাছে কখনও ভাঁওতা দোবো না, কখনও মিথ্যে বলবো না।"

"দেবী কেন ?"

"ওমা! আর কিছু বলতে পারি কি ?"

মেনকা মা বার-দুই মাথা ওপর-নিচ ক'রে বললেন—

"জ্ঞান টনটনে।"

প্রভুর মনটা তোলপাড় করছিল তখনও। কান ছাড়ার কথা খেয়াল হয়নি।

"কতক্ষণ ওভাবে থাকবেন? প্রতিজ্ঞা ক'রে বুঝি নিজের ভুল বুঝতে পারছেন?"

প্রভু জবাব দিলেন না। দুশ্চিন্তা পাকাচ্ছিল তাঁর মাথায়—এত ফটো তুলছে কেন? কি উদ্দেশ্য!

"আরে! একদম বোবা হয়ে গেলেন যে?"

"না। ওঠ-বোসের তো অভ্যেস নেই। পায়ে খিল ধরেছে।"

"এবার থেকে ধাত পাল্টাবে। কিন্তু, এখুনই ধাপ্পা দিলেন।"

"কি রকম?"

"পায়ে খিল, অথচ ঠায় দাঁড়িয়ে। কান ছাড়ার নাম নেই।"

"ভাবছিলাম কি করি।"

প্রভুর নিস্তেজ কৈফিয়ৎ এড়িয়ে মেনকা মা স্বগতোক্তি করলেন,

"এখন থেকে আমি নিশ্চিন্ত।"

সোফায় জায়গা নিতে নিতে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন,

"কেন?"

"আপনার প্রতিজ্ঞা শুনে।"

মাথায় পরচুলাটা এঁটে একবার ন'ড়েচ'ড়ে প্রভু শুধোলেন—

"এত ফটো দিয়ে কি হবে আপনার?"

প্রশ্নটি ছিল ওজন করা, অলঙ্কারহীন, উচ্ছ্বাস-বর্জিত।

মেনকা মা জবাব দিলেন হাসতে হাসতে—

"এই সময়ে অসময়ে উল্টে পাল্টে দেখবো আর কি।"

"ও" ব'লে প্রভু উঠলেন।

“এত তাড়াতাড়ি যে ?”

“না। রাত হয়েছে।”

মেনকা মার উদ্দেশ্যে উত্তর দিতে দিতে তিনি একেবারে দরজায় পৌঁছেছিলেন।

“রুমালটা ফেলে গেছেন ঠাকুর।”

ফিরে এসে রুমাল নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে প্রভু চ’লে গেলেন।

কুড়ি

মঙ্গলবার বাবা জগদীশনাথ এলেন চটকদার সাজে। গোলাপী সিল্কের মিহি চাদরে পাগড়ির নতুন আভিজাত্য। কানে আতর-মাখানো তুলো গোঁজা। গন্ধটা বেশ কড়া। নতুন গগ্‌ল্‌স চোখে। দু-হাতে ছ-আঙুলে ছটা আংটি। ফিন্‌ফিনে আদ্ধির হাঁটু-ঢাকা কলিদার পাঞ্জাবি। বোতাম কটা হীরের। বুকে সোনার চেন। চেনে বাঁধা সোনার ঘড়িটা দেখা যায় জামার ভেতর দিয়ে। গলা বেড়িয়ে দু-কাঁধ ঘুরিয়ে ঝোলানো চওড়া কল্কাদার দোশালা। তার আড়াল থেকে সোনার সরু হার বেরিয়ে আছে খানিকটা। মোটা সিল্কের পায়জামা নেমেছে গোড়ালি ছাড়িয়ে। পায়ে গোলাপী রেশমী মোজার সঙ্গে জরির নক্সাওয়ালা সাদা চামড়ার নাগরা। হাতে হাত-আড়াই লম্বা রূপো-বাঁধানো কুকুর-মুখো লাঠি। কুকুরের চোখে বসানো চুণি, কপালে পান্না।

মেনকা মা তাঁর সাজ-পোষাক দেখলেন। এক হপ্তায় তিনি যে বেশ রোগা হয়েছেন, এটাও লক্ষ্য করলেন।

ঘরে ঢুকে বাবা জগদীশনাথ চেয়ারে বসলেন ছড়ি হাতে নিয়ে।

মেনকা মা মাথা নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলেন—

"উঁহু। বসা চলবে না। আগে লাঠিটা রেখে আসুন কপাটের পাশে।"

বাবা জগদীশনাথ আদেশ পালন করলেন।

"লাঠি এনেছেন আবার কি মনে ক'রে? লাঠির প্যাঁচ না-দেখিয়ে ছাড়বেন না?"

মেনকা মার মোলায়েম সওয়ালে বাবা জগদীশনাথ অপ্রতিভ জবাব দিতে গেলেন—

"মানে, যদি কিছু মনে না করেন, মানে, তাহলে……"

তাঁকে থামিয়ে দিলেন মেনকা মা—

"তাহলে আবার কি। ষণ্ডামি-গুণ্ডামির কথা ভাবলেই আমার ভীরমি আসে।"

"না, না। মানে, আপনি ভীরমি গেলে দেখবে কে। তবে কিনা, সেরা গুরু হাতে ধ'রে শিখিয়েছিলেন। লাঠি ঘুরিয়ে তিনি দু-চারশো লোক হঠাতে পারতেন"—

গুরু-মাহাত্ম্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বাবা জগদীশনাথ ডান কান স্পর্শ করলেন।

"কানে হাত দিলেন যে ?"

"মানে, ওস্তাদের নাম উঠলে ওরকম করতে হয়। আমার গুরুও তাঁর ওস্তাদের কথায় কান ছুঁতেন।"

"ভাল। নতুন জিনিস জানলুম একটা। কিন্তু, কানে তুলো গুঁজেছেন কেন ? আমার কথা অসহ্য লাগে বুঝি ?"

হাত কচলাতে কচলাতে বাবা জগদীশনাথ উত্তর করলেন—

"মানে, কি যে বলেন। আপনার কথা শোনবার জন্যেই তো আসি এখানে।"

"তবে ?"

"মানে, আতর, আতর আছে তুলোয়। লক্ষ্ণৌ শহরের মাল।"

"তা কানে কেন ?"

"বাবাকে দেখেছি।"

"তাই ব'লে আপনিও কান-ভর্তি তুলো নিয়ে আসবেন আমার সামনে ? পিতৃভক্তি তো বেশ জোরদার !"

"মানে, বড় ঘরের ছেলেরা কানে আতর মাখানো তুলো রাখে খানিকটা। মানে, গোঁফে আতর লাগায়, মানে, রুমালে আতর ঢালে। খোসবাই ছড়ায় সব দিক থেকে।"

"একদম মাথা খারাপ।"

"মানে, আমার সবটাতেই আপনি ঠাট্টা করেন।"

"ঠাট্টা নয়। আপনি একদম নিরেট। সেইজন্যে সমঝাতে হয় মাঝে মাঝে। তা ছাড়া, আপনি বড্ড বেশি হামবড়া।"

"বেশ। এখন থেকে যা হুকুম করবেন, মানবো। আর, মুখ বুজে থাকবো।"

"বাঁচলাম। বকতে শুরু করলে আপনাকে থামানো দায়। শুনতে বিরক্তি লাগলেও নিস্তার নেই।"

বাবা জগদীশনাথ নিরুত্তর রইলেন।

"রাগ করুন, মনে মনে গালাগালি দিন, ক্ষতি নেই। আগে কানের তুলো জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে আসুন।"

বাবা জগদীশনাথ উঠে হাঁড়ি-মুখে তুলো পার করলেন জানলা দিয়ে।

"আপনি কিন্তু বড্ড সেকেলে। প্রভু কিশোর ঠাকুর হাল ফ্যাসানের চাল-চলন, পোষাক-আষাকে চোস্ত।"

নির্বাক মানুষটি যেন তড়িতাহত হলেন। আপাদমস্তক ঝাঁকুনি লাগিয়ে হাত গোটালেন সঙ্গে সঙ্গে। মুখের অস্পষ্ট রেখাগুলো কাঠিন্যে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। দাঁতে দাঁত চেপে ভাঙা গলায় হুঙ্কার ছাড়তে লাগলেন বাবা জগদীশনাথ—

"কিশোর ঠাকুর! প্রভু না শেয়াল! মেনীমুখো! বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো, হা ঘ'রে, লক্ষ্মীছাড়া!"

"আপনিও তো তাই! কম যান নাকি?"

দাঁত আল্লা ক'রে বাবা জগদীশনাথ রুখে দাঁড়ালেন,

"আমিও তাই? কম যাই না? ব্যাটা বনেদিয়ানা দেখেছে কোনওদিন?"

"রাখুন আপনার বনেদিয়ানা। আপনি একটুও স্মার্ট নন। জংলি।"

মুষ্টিবদ্ধ বাঁ হাত তুলে ডান হাতে বুক ঠুকে বাবা জগদীশনাথ চীৎকার জুড়ে দিলেন—

"বটে? ব্যাটাকে হাতের কাছে পেলে য়্যায়সা ধোবীপট কষবো যে, হাড়গোড় সব ছাতু হয়ে যাবে! ব্যাটাকে……"

"অমন গাঁক গাঁক ক'রে চেঁচাবেন তো…………"

"চেঁচাবো না? ভয়ে মুখ বন্ধ ক'রে থাকতে হবে?"

"বলেছি না, ষণ্ডামি-গুণ্ডামি আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না?"

মেনকা মার কথায় বাবা জগদীশনাথ আস্ফালন বন্ধ করলেন। কিন্তু, চেয়ারে ব'সে মেজাজ ঠিক করতে সময় লাগলো খানিকটা। পাশের পকেট থেকে বাহারি রুমাল বার ক'রে মুখ মুছলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। চোখের তারা ছটো ঘুরপাক খেতে খেতে শান্ত হয়ে এল। ঘরে কোনও শব্দ নেই। ভেতরে ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ আর বাইরে শালিকের ঝগড়া চলছিল।

নীরবতা ভাঙলেন মেনকা মা—

"কি? চটেছেন?

"না, মানে……………"

"তবে কি বুকুনির ভাঁড়ার খালি হয়ে গেছে?"

"না, মানে, আপনার সামনে পড়লে এমনিতেই আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। মানে, তার ওপর………"

"আমার নিন্দে করতে চান?"

"না, মানে, নিন্দে নয়।"

"যাক গে।………লাঠি-সোঁটা, তীর-ধনুক, নেশা-ভাঙ ছাড়া আর কিছুতো আপনার মগজে নেই যখন…"

বাবা জগদীশনাথ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বললেন—

"দেখুন তো। ভুলেই গেছিলাম। আজও মনে আসেনি। আমি যৌগিক আসন জানি।"

"তাহলে তো আপনি যোগিরাজ—বড়দরের গুণী। দেখান না দু-একটা।"

বাবা জগদীশনাথ উঠে দাঁড়িয়ে পাগড়ি-চশমা রাখলেন সোফার কোণে। আঙুল থেকে আংটিগুলো টেনে নিয়ে ফেললেন মেনকা মার পাশে। পাঞ্জাবিটা খুলে ছড়িয়ে দিলেন চেয়ারের পিঠে। আর কিছু করার আগেই মেনকা মা বাধা দিলেন—

"আর নয়।"

"আচ্ছা। এতেই পারবো।"

পরমোৎসাহে বাবা জগদীশনাথ চলে গেলেন দেওয়ালের পাশে। দেওয়াল-মুখো উবু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে এক হ্যাঁচকায় পা-ছুটো তুললেন ওপরে। হাতজোড়া রইল মাথা আগলিয়ে। দশ-পনের সেকেণ্ড এই ভাবে থেকে পা নামালেন।

"এটা শীর্ষাসন। সবাই পারে না।"

মুখে বিজয়ীর দম্ভ নিয়ে বাবা জগদীশনাথ তারিফের প্রত্যাশায় চেয়ারের পেছনে দাঁড়ালেন।

"আর কোনও আসন দেখাতে হবে না।"

ভয়ানক রকম নৈরাশ্য নিয়ে বাবা জগদীশনাথ প্রশ্ন করলেন,

"কেন?"

"রামো! একদম ভাল্লুক।"

"ভাল্লুক? ভাল্লুক আসবে কোত্থেকে?"

"আপনি। আপনি গো মশাই।"

বাবা জগদীশনাথের প্রতিবাদ মূর্ত হল কর্কশ আর্তনাদে—

"আমি? আমি ভাল্লুক?"

মাথা নিচু ক'রে তিনি চেয়ারের পিঠটা ছু-হাতে চেপে ধরলেন।

মেনকা মা নীরবে হাসছিলেন।

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বাবা জগদীশনাথ পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন, পাগড়িটা মাথায় চাপালেন, গগ্‌লস হাতে নিলেন। মেজাজটা কিন্তু নরম হয়ে আসছিল। ঠোঁট কামড়ানো বন্ধ ক'রে আবার চেয়ারে হাত রেখে দ্রুত আলোচনা চালাতে লাগলেন মনে

মনে, "ভাল্লুক! ভাল্লুকটা গালাগাল বটে। কিন্তু হাসছে তো। হাসছে কেন? গাল দিতে হাসে না কেউ। ঠাট্টা হতে পারে। বাবা রাগলে উল্লুক বলতেন, ছাগলও বলতেন। খুশী থাকলে বাঁদর আর গাধা। সাঁওতাল পরগণায় ভাল্লুক ছিল অত। কিন্তু, বাবা কখনও ভাল্লুকের নাম মুখে আনতেন না। ওটা গালাগাল নয়। তবে কি? অন্য কিছু নিশ্চয়। তা হলে, তা হলে……"

অনভ্যাসের দোষে বাবা জগদীশনাথের মানসিক বিশ্লেষণ আর এগুলো না। খেই হারিয়ে গেল। ঢোঁক গিলে কানের পাশে হাত নিলেন একবার। খড়কেটা নেই। রেখে আসতে হয়েছে মেনকা মার ভয়ে। রুমাল নিয়ে ঘাড়ে ঘসলেন বার কয়েক। "নাঃ, চটেনি তো! হাসছে এখনও।"—আবার মানসিক বিশ্লেষণ শুরু করলেন। আশার আলো নজরে এল। অস্পষ্ট আওয়াজ করলেন তিনি।

"মনমরা হয়ে গেলেন একদম? খাঁটি খাঁটি নাবালক।"

মেনকা মার কথায় বাবা জগদীশনাথ খানিকটা জোর পেলেন। চেয়ারে বসলেন এবার।

"না, তা, মানে, মনমরা হইনি। মানে, আমাকে ভাল্লুক বল্লেন কিনা, তাই।"

সাফাই শেষ হবার আগেই মেনকা মা খোলা হাসি জুড়ে দিলেন।

বাবা জগদীশনাথ আবার বোবা হয়ে যান। মেনকা মার হাসি থামতে তাঁর ঠোঁট দুটো নড়ে খানিকটা, 'ম্যা, ম্যা, ম্যা' আওয়াজ বেরোয় গলা থেকে।

"আহা, পেটের কথা চেপে রেখে লাভ কি? যা মনে আসছে, খোলসা ক'রে ফেলুন।"

"মানে, আপনি কি আমার সঙ্গে মস্করা করছেন?"

"নিশ্চয়ই না।"

"মানে, যা-তা বললেন একটু আগে।"

"ওমা! সে আবার কি?"

"মানে গালাগাল......."

"গালাগাল দিলুম কখন?"

"মানে, খা-খা-খাতির করলেন?"

"সে তো বরাবরই করছি। নতুন আর কি?"

"মানে, তা-তা তাহলে ভাল্লুক........"

"হো-হো-হো-হো, হি-হি-হি-হি, ভাল্লুক? আপনি ভাল্লুক ছাড়া কি? হি-হি-হি-হি, আস্ত জাম্বুবান। গায়ে যেন কালো কম্বল আঁটা। হো-হো-হো-হো, পেটে খিল ধ'রে যাবে আমার, হি-হি-হি-হি!"

মেনকা মার হাসিতে বিরাম নেই। শেষ পর্যন্ত মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কোঁক, কোঁক, কোঁক, কোঁক, খি, খি, খি, খি আওয়াজের ঝোঁকে ঝোঁকে তিনি মাথা চালতে লাগলেন।

হাসি কমতে বাবা জগদীশনাথ আবার জিজ্ঞেস করলেন,

"মানে, আমার গায়ে খুব চুল তো? ওগুলো উঠিয়ে ফেলবো কি?"

"হি-হি-হি-হি, আপনার খুশী।"

বাবা জগদীশনাথ খানিকটা আশ্বস্ত হলেন।

হাসি থামিয়ে মেনকা মা আংটি কটা নাড়াচাড়া আরম্ভ করলেন। বাবা জগদীশনাথ সেগুলোর দিকে হাত বাড়াতেই বললেন,

"থাক না একটু, দেখি। জমিদারি জিনিস!"

বাবা জগদীশনাথ মহা খুশী। মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে আংটি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুরু করলেন—

"জানেন, মানে, ওপাশের ঐ বড়টা, হ্যাঁ, ঐটে। কমল-হীরে বসানো। ঠাকুর্দা পরতেন। মানে, দাম হাজার আষ্টেকের কম নয়।"

মেনকা মা আংটিটা তুলে ধরলেন।

কমল-হীরে। নামটা শোনা। চোখ দুটো তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বাবা জগদীশনাথের মুখেও তুবড়ি ছুটছিল—

"পান্নার আংটিটা মানে, বাবা খুব পছন্দ করতেন। চুণি বসানো ঐ ছোটোটা মার। আর মুক্তোর ওটা মানে......."

বাবা জগদীশনাথ থামেন।

পান্না-চুণি খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মেনকা মা প্রশ্ন করেন,

"হাঁ, মুক্তোরটা কার হাতের?"

"মানে, এক বুড়ীর উপহার।"

"ঠাকুমা কি দিদিমা বোধ হয়।"

"না, মানে, ভক্ত একজন।"

"বাকি দুটো?"

"মানে, ও দুটো-ও পাওয়া।"

"আপনার ভক্তেরা তো বেশ দামী দামী জিনিস দেয়।"

"তা দেয়।"

বাবা জগদীশনাথ আবার আংটি-কটা নিতে যাচ্ছিলেন। সেগুলো মুঠোয় রেখে মেনকা মা চোখ পাকিয়ে চাইলেন। তারপরই কপট ধমক—

"এই সম্পত্তি পাঁচ মিনিট রেখে বিশ্বাস হচ্ছে না। যদি বলি, সিন্দুকের চাবি এনে দিন, তাহলে তো মাথায় ডাণ্ডা মারবেন মনে হচ্ছে।"

বাবা জগদীশনাথের কাছে মেনকা মার মনটা কদিন কুয়াশায় ঢাকা ছিল। এবার সবই যেন সাফ হয়ে আসে।

সিন্দুকের চাবি চাইবে। তাতো চাইবেই। পাকা গিন্নী। চাপা হলেও পেটের কথা আস্তে আস্তে বেফাঁস করছে। তবে, বেয়াড়া কপচানো চলবে না। কখন কিসে চ'টে যাবে, ঠিক কি? পরম আনন্দে বাবা জগদীশনাথ হাতজোড় করলেন।

"হাতজোড়ের কি আছে।"

মেনকা মার সাদা-মাঠা মন্তব্যে বাবা জগদীশনাথ একবারে মাথা নুইয়ে বললেন,

"মানে সব আংটি আপনার কাছে থাক।"

"না বাবা, পরের জিনিস।"

"য়্যাঁ? আপনি আমায় মানে, এখনও পর ভাবেন?"

"না, না। এমনিই তামাসা করছিলাম। নিন।"

সন্ত্রস্ত বাবা জগদীশনাথ নিতান্ত কাতর আবেদন জানালেন—

"মানে, ওগুলো রাখুন।"

"না। দরকার নেই।"

"দয়া করুন, মানে, দয়া করুন আমাকে।"

"আচ্ছা, এত অনুরোধ যখন, তুলে রাখছি এখনকার মত।"

মেনকা মা আংটি কটা আঁচলের খুঁটে বাঁধেন।

বাবা জগদীশনাথও আশ্বস্ত। আলগা হয়ে বসেন চেয়ারে। তারপর ঘড়ির চেনটা দেখিয়ে বলেন—

"এটা ঠাকুর্দার। ঘড়িটা বাবার।"

"একদিন আপনার মুখেই শুনেছিলাম, সব সম্পত্তি ফুঁকে যায় আপনার হাতে। এখন দেখছি, সেকথা মিথ্যে।"

"না, মানে তা নয়। রূপোর জিনিস, সাধারণ গয়না, বাসন-পত্র বেচেছিলাম জলের দরে। মানে, অজ পাড়াগাঁ। ভাল খদ্দের জুটবে কোত্থেকে। দামি জিনিস কয়েকটা নিয়ে গেছিলাম ভাগলপুর, মানে, অনেক বাঙালী সেখানে। ভেবেছিলাম ভাল টাকা দেবে। ওমা, এক উকিল বলে কিনা, চোরাই মাল। শুনে মনটা খারাপ হয়ে যায়। ঠিক করলাম, বেচবো না। মানে, জমি গেল সব, বাড়ি গেল, খাট-পালঙ-তৈজস-পত্র গেল। খানিকটা আফশোষে আর খানিকটা মায়ায় পড়ে সেগুলো মাটিতে পুঁতে রেখেছিলাম। কেউ জানতো না। জেল থেকে ফিরে বার করি। পরে আর বেচিনি। তাই এখনও আছে।"

"শুধু কটা আংটি আর ঘড়ি, ঘড়ির চেন ?"

"না।"

"আর কি আছে ?"

"মানে। মার জিনিস কয়েকখানা।"

"নিশ্চয়ই জড়োয়া।"

"হ্যাঁ।"

"ভাল প্যাটার্ণের নয় বোধ হয়।"

"মানে, আমি ঠিক বুঝি না।"

"আজকাল ওসব পরলে লোকে ঠাট্টা করে।"

"হ্যাঃ। ঠাট্টা করলেই হ'ল ? মানে, সাতনরী, মুক্তোর কণ্ঠী—এসব দেখেছে কজন ?"

"আমিও দেখিনি।"

"মানে, দেখবেন ?"

"থাকগে।"

"না, না। থাকগে কেন ?"

"আপনার ইচ্ছে।"

"আমার ইচ্ছে ? মানে, তা হলে আলবৎ দেখাবো, হাজার বার দেখাবো।"

"বেশ, বেশ। তা এখনই ডেরায় দৌড়োবেন নাকি ?"

"না, মানে......"

"তবে চুপ ক'রে বসুন।"

বাবা জগদীশনাথের উৎসাহে কিন্তু ভাঁটা পড়লো না। নষ্ট-সম্পত্তির ঢালাও বিবরণ দিতে লাগলেন। গয়না-গাঁটি, বাসন-পত্র থেকে শাল-গালচেয় পৌঁছালেন। মেনকা মা চুপ ক'রে ছিলেন। দশখানা ছড়ি আর আটটা লাঠির ফিরিস্তি শেষ হতে তিনি উপসংহার ঘটিয়ে দিলেন—

"একদিনে এত খবর! সব ভুলে যাব যে।"

একটু লজ্জা পেয়ে বাবা জগদীশনাথ কবুল করলেন—

"হ্যাঁ, মানে অনেক জিনিস। ভুলতে পারেন। থাক তাহলে আজ।"

"আমাকে এবার উঠতে হবে। ইচ্ছে করলে বসতে পারেন।"

"বসবো? মানে, আপনি ঘুরে আসছেন?"

"না। কত কাজ রয়েছে।"

"ও। মানে, এখন চলে যাব?"

"সামনের মঙ্গলবার আসছেন?"

"নিশ্চয়। রাগ না-করলে, মানে, আপনি বিরক্ত না-হলে তার আগেই হাজির হতে পারি।"

"সবুর করুন। আরও কিছুদিন পরে।"

বাবা জগদীশনাথ ধীরে সুস্থে বেরুলেন ঘর থেকে। সিঁড়ির মাথায় ছড়িটা ঠুকে গান ধরলেন গুণগুণ ক'রে। নিচে নেমে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে রাস্তায় পড়লেন।

একুশ

চারদিন বাদে প্রভু কিশোর ঠাকুর রুটিন মত উপস্থিত হন আশ্রমে।

সোফায় বসামাত্র মেনকা মার আফশোয—

"এঃ। শরীরের অবস্থা কি করেছেন? চোখের কোল ব'সে গেছে। মুখ কালো। কি হয়েছে আপনার?"

"কি হয়েছে জিজ্ঞেস করছেন? বোঝেন না? আপনিই তো দায়ী।'

"তাই নাকি? জানতুম না। তবে, আমি দায়ী হলেও শরীরটা তো আপনার।"

"আমার শরীর গোল্লায় গেলে আপনার কি যায় আসে?"

"বটে? আচ্ছা, বসুন। আসছি এখুনি।"

মেনকা মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। প্রভু কিশোর ঠাকুরও চট ক'রে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তার ভেতরে লাগানো আয়নায় মুখখানা দেখে নিলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

ফিরে এসে মেনকা মা অনুযোগ আরম্ভ করলেন—

"চোরের ওপর রাগ ক'রে যারা মাটিতে ভাত খায়, তাদের মত বোকা নেই দুনিয়ায়।"

ডান হাতটা তাঁর আঁচলে ঢাকা। প্রভু কিশোর ঠাকুর তাঁর সব কথা গিলছিলেন। হাতের দিকে নজর পড়েনি।

"দেখি, দেখি শ্রীমুখ" ব'লে মেনকা মা চিবুকে হাত দিতে তাঁর চোখ দুটো বুজে এল।

"সত্যি? কি দশা হয়েছে আপনার!"

প্রভু কিশোর ঠাকুর একেবারে বুঁদ হয়ে যান। এর মধ্যেই এতটা! মেয়েছেলের মন! হঠাৎ নাড়া পেলে ভেতরকার আবেগ প্রকাশ ক'রে ফেলে।

ওর সয় না প্রভুর। হাতে হাতে পাকা করতে হবে—গরম গরম। দেরি করলেই বিপদ। মাথা বেঠিক হতে কতক্ষণ।

কিন্তু, চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল তখনই।

জোরে মাথা নেড়ে প্রভু আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—

"কী? কী ঘ'ষে দিলেন চোখটার নিচে?"

মেনকা মা তবুও চিবুক ছাড়লেন না। প্রভু কিশোর ঠাকুর বাঁ হাতে মেনকা মার ডান হাতটা ধরলেন, আর, নিজের ডান হাতটা দিলেন চোখে।

"দাঁড়ান", ব'লে মেনকা মা এক ঝটকায় হাত ছাড়ালেন। তাঁর তিন আঙুলের ডগা দিয়ে চেপে ধরা রয়েছে তুলো। সেটা ভাল ক'রে দেখে নিয়ে স'রে গেলেন সোফার কোণে।

প্রভু কিশোর ঠাকুর হতভম্ব।

মেনকা মা পা নাচান।

প্রভু ডান চোখের নিচেটা রগড়াতে থাকেন।

"রগড়িয়ে আর কি হবে?"

মেনকা মার কথায় প্রভু হাত নামিয়ে দেখলেন সঙ্গে সঙ্গে। চুপ ক'রে থাকা দায়। তাই জিজ্ঞেস করলেন মন-মরা গলায়—

"কেন?"

"ঠাকুর! আমার কাছেও অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন।"

মেনকা মার চোখ দুটো চকচক করে। তাঁর এরকম অদ্ভুত চাউনি প্রভু কিশোর ঠাকুরের এক নতুন অভিজ্ঞতা। ভয় পেয়ে যান।

কিন্তু, হার মানলেই সব মাটি। বেহাত হয়ে যাবে একদম। প্রভু ঘায়েল হবার কোনও লক্ষণ দেখান না। বিব্রত, বেয়াড়া ভাবটা চকিতে উবে যায়। ইনিয়ে বিনিয়ে তিনি নতুন ভণিতা ধরেন—

"বেশ লোক আপনি! আপনার নজরকে বলিহারি। কাজল নিয়ে এত কাণ্ড! যেন কত অপরাধ করেছি! আমি তো ভয়ে

কাঁটা। চোখে কাজল দিয়েছিলাম মেক-আপটা মানিয়ে নেবার জন্যে। জানতাম না। আর কখনও ছোঁবো না।”

“ঘোমটা টেনে আসেন। লোকে রাস্তায় মাথার কাপড় তুলে ধ’রে চোখ দেখে নাকি?”

“তা কেন হবে। তবে কিনা........”

“চোখের পাতায় কিন্তু কাজলের চিহ্ন নেই।”

“মুছে গেছে নিশ্চয়।”

“শুনুন। নিচের কালো রংটা কাজল নয়। তুলোয় লেগে রয়েছে। দেখুন না নিজে।”

মেনকা মা তুলোটা ছুঁড়ে দিলেন প্রভু কিশোর ঠাকুরের কোলে।

প্রভুর মুখ ক্ষণিকের মত রক্তশূন্য হয়ে গেল। দেওয়াল, জানলা, আলমারিতে চোখ বুলিয়ে শেষে মাথা নোয়ালেন।

“আরে। লজ্জার কি আছে এতে?”—

মেনকা মার ন্যাড়া বিদ্রূপে প্রভু ন’ড়ে বসলেন। তারপর, তুলোটা নিয়ে নাকের কাছে ধরলেন আস্তে আস্তে, কিন্তু, ঘাড় তুললেন না।

“স্পিরিট লাগিয়ে ছিলাম। বুঝতেই পারছেন।”

প্রভুর মাথায় দুশ্চিন্তা কিলবিল করছে। সব বুঝি ভেস্তে গেল! এমন লজ্জায় পড়েননি জীবনে। এতটা বাড়াবাড়ি না-করলেই হত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রভুর মগজ খেলে না আর, কথা যোগায় না।

মেনকা মা পা নাচাচ্ছিলেন। প্রভু চেয়েছিলেন তাঁর হাঁটুর দিকে। মেনকা মা উঠলেন সোফা থেকে।

প্রভুর দুর্ভাবনা বেড়ে যায়। আবার কি করবে, কে জানে! গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে।

মেনকা মা গিয়ে আলমারি খুললেন। পেছন থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি চালিয়েও প্রভু বুঝতে পারলেন না তাঁর পরবর্তী কার্যক্রম।

বাবা জগদীশনাথের আংটি কটা নিয়ে এলেন মেনকা মা।

প্রভুর অবস্থাও ভয়ানক রকম কাহিল। ওঠা দায়, বসা দায়, যাওয়া দায়।

কিন্তু, সঙ্কটের মেঘ স'রে গেল। আংটিগুলো সামনে রেখে মেনকা মা বললেন,

"দেখুন এগুলো।"

যাক! তাহলে এবারের মত ফাঁড়া কাটলো! প্রভু কিশোর ঠাকুর পরম আগ্রহে পর পর ছটা আংটিই তুলে পরখ করলেন।

"কি রকম জিনিস?"

ষোল আনা সাহস ফিরে এসেছে প্রভুর। মেনকা মার কথায় উত্তর দিলেন পাকা জহুরীর মত—

"বেশ দামী। গিণি সোনা। পাথরগুলোও খাঁটি।"

"ছেঁদো কথা বাদ দিন। কোনটা কি পাথর ধরতে পারছেন?"

"এটা পোখরাজ।"

"হায়রে! জমিদারি চোখ চাই ঠাকুর! হীরে-জহরৎ চেনা অত সহজ নয়। এটা কমল-হীরে।"

জমিদারি চোখের উল্লেখে একটু অস্বস্তি বোধ করলেও প্রভু কিশোর ঠাকুর দমবার পাত্র নন। শুধরে নেন তিনি—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কমল-হীরেই তো বটে। তাড়াতাড়িতে বুঝতে পারিনি।"

"কমল-হীরে দেখেছেন এর আগে?"

"কতো-ও।"

"এটার দাম আন্দাজ করুন তো।"

"আন্দাজের কি আছে? এই শ পাঁচেক হবে আর কি।"

"হীরে-মুক্তো যাচাই করা আপনার সাধ্যি নয়। দশ হাজার দিলেও এরকম সরেস জিনিস মিলবে কিনা, সন্দেহ।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর আর একদফা ঘায়েল হন।

"কার আংটি এগুলো, জানেন?"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে প্রভু নির্বাক থাকেন।

"বলুন না—"

মেনকা মা তাড়া দেন।

"কি ক'রে বলবো।"

"আন্দাজ করুন।"

"কোনও বড়লোক শিষ্যের হবে।"

"হুঁ-হুঁ, বাবা, ধরতে পারলেন না তো! আবার আপনার হার।"

নতুন বোকামি প্রমাণ হওয়ায় প্রভু কিশোর ঠাকুর একদম মুশড়িয়ে যান।

"জগদীশনাথের আংটি এগুলো।"

ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে প্রভু কিশোর ঠাকুর সোফা ছাড়লেন। মুখ তাঁর ফেটে পড়ছে।

"ওকি মশাই, এত তাড়াতাড়ি চললেন যে?"

সম্ভাষণটা চাবুকের মত।

"থেকে আর লাভ কি?"

'আরে, চটেন কেন? বসুন, বসুন। সবটা শুনুন।"

প্রভু কিশোর ঠাকুরের নৈরাশ্য কাটলো না। তবুও বসলেন আবার।

"এগুলো গচ্ছিত আছে। একটাও আমার হাতে লাগে না। এই দেখুন।"

মেনকা মা একটা একটা ক'রে ছটা আংটি প'রে দেখালেন।

প্রভু কিশোর ঠাকুরের মনে আশার ছোঁয়াচ লাগলো।

"জগদীশনাথের আঙুল যে মোটা। একদিন এসেছিল এগুলো চাপিয়ে। আমার মুখে যা-তা শুনে লজ্জার খাতিরে রেখে গিয়েছে।"

মেনকা মার গলায় সান্ত্বনার আমেজ।

প্রভুও অমনি উৎসাহে জুড়ে দিলেন—

"ও যে ধুরন্ধর। অমনি অমনি দামী মাল রেখে যাবে আপনার কাছে? পাথর কখানা নিশ্চয় ঝুঠো। গিলটির মালে কাঁচ বসানো।"

"আজ্ঞে না, প্রভু। আমার এক জহুরী শিষ্যকে দিয়ে যাচাই করিয়েছি।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর এবার দুর্বলতার বদলে তাচ্ছিল্য দেখান—

"রাখুন আপনার যাচাই। নিশ্চয়ই বদ উদ্দেশ্য আছে। যবে হোক, টের পাইয়ে দেবে। তখন পস্তাবেন।"

"উদ্দেশ্য আর কি। নিয়ে যাবে দু-একদিনের মধ্যে।"

প্রভু আগেই হাঁফ ছেড়েছেন মনে মনে। উপহার যখন নয়, তেমন কিছু ভয়ের সম্ভাবনা নেই। মেজাজটা তাঁর ঠিক হয়ে এসেছিল। মাতব্বরি কায়দায় মন্তব্য করলেন—

"আমার অনেক জানা আছে। পাকা ধড়িবাজ। বড়মানুষি দেখিয়েছে। আমি হলে ফেরত নেবার নামও মুখে আনতাম না।"

"সবাই তো আর আপনার মত দিলদরিয়া নয়।"

মেনকা মার প্রশংসায় পুরো খোশমেজাজে প্রভু বললেন—

"ওগুলো চোরাই। পুলিশের ভয়ে রেখে গেছে এখানে। আপনি নেহাৎ সরল। লোকটাকে চিনলেন না এখনও।"

"তা হবে"—

মেনকা মা তর্ক এড়িয়ে যান।

"ও এলে নজর রাখবেন একটু। চার মাসে বেশ চিনেছি। বাস্তু-ঘুঘু একটি। হাতটানও আছে।"

"কি ক'রে জানলেন?"

"অনেক মানুষ চরিয়েছি। এক নজরে পরখ ক'রে নি-ই। অভিজ্ঞতা আছে যথেষ্ট।"

"ও।"

ভাল রকম সাড়া না-পেয়ে প্রভু কিশোর ঠাকুর দ'মে গেলেন খানিকটা। আবার উঠলেন, ঘোমটা টানলেন, ভ্যানিটি ব্যাগটা তুললেন।

মেনকা মা অন্যমনস্ক ছিলেন। প্রভু বাইরে যেতে ডাক দিলেন—

"আরে, শুনুন। একদম ভুলে গেছি। সামনের মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটায় আসবেন। জল-খাওয়া, খাওয়া এখানেই। মনে থাকবে তো?"

প্রতিপদের পর একেবারে পূর্ণিমা। আনন্দে অবশ হয়ে এল দেহ। ফিরে বসতে যাচ্ছিলেন প্রভু কিশোর ঠাকুর।

কিন্তু মেনকা মা দাঁড়িয়ে পড়েছেন ততক্ষণে। বসার সুযোগ ছিল না আর। আশমানমুখী মন নিয়ে প্রভু সিঁড়িমুখো হলেন।

বাইশ

মঙ্গলবার ভোর ছটায় এলেন বাবা জগদীশনাথ। লাঠি-ছড়ির বদলে, হাতে তাঁর কাগজে মোড়া ছোট একটা বাক্স। চেয়ারে ব'সে কাগজের ভাঁজ খুললেন। বাক্সটা ভেলভেটের। বিবর্ণ। পেতলের জোড়া খিল সবুজ হয়ে এসেছে। দেখলেই বোঝা যায়, রীতিমতো পুরোনো।

কোলের ওপর বাক্স রেখে বাবা জগদীশনাথ খিল দুটো সরালেন, সাবধানে ডালাটা তুলে শুইয়ে দিলেন।

মেনকা মা একটু সিধে হয়ে দেখলেন ভেতরটা। জোড়া চোখ জ্ব'লে উঠলো একবার। তারপর মাথাটা ঝুঁকলো সামনের দিকে।

বাবা জগদীশনাথ পরম পরিতোষে তুলে ধরলেন মুক্তোর কণ্ঠী। বেশ ময়লা পড়েছে মুক্তোগুলোয়।

"মা পরতেন। মানে, খাঁটি মুক্তো।"

কথার সঙ্গে হাত দুটো তাঁর এগিয়ে গেল মেনকা মার দিকে।

"দিন।"

মেনকা মার আগ্রহে সঙ্কোচের বালাই ছিল না।

"না, হাতে দোবো না। মানে, গলাটা বাড়ান। দেখি, পরলে আপনাকে কেমন মানায়।"

"মার জিনিস। স্নান না-সেরে গায়ে ওঠাবো কি ক'রে।"

কণ্ঠী-সমেত জোড়া হাত বাক্সের মধ্যে রেখে বাবা জগদীশনাথ বললেন,

"এসব মানেন আপনি?"

"আচ্ছা লোক! শনি-মঙ্গলবার তো একটু বুঝে সুঝে চলতে হয়।"

বাবা জগদীশনাথের উত্তপ্ত উৎসাহে জলের ছিটে পড়লো। বাক্স

থেকে হাত বার করলেন। ডালাটা আটকিয়ে চাইলেন মেনকা মার দিকে। তারপর বাক্সটা রেখে দিলেন তাঁর পাশে।

মেনকা মা ডালা খুললেন সঙ্গে সঙ্গে।

"আগেকার প্যাটার্ণই আলাদা।"

মেনকা মার কথায় বাবা জগদীশনাথ যেন নিজের বক্তব্য খুঁজে পেলেন। জুড়ে দিলেন,—

"মানে, আসছে মঙ্গলবার আমি আসার আগে চান-টান সেরে রাখবেন।"

"ওরে বাপরে। রাত থাকতে স্নান। নিউমোনিয়া ধরবে।"

"মানে, একটা দিন শুধু।"

"দেখবো। আজ তাহলে নিয়ে যান।"

মেনকা মা নিতে বললেন, কিন্তু, ডান হাতটা তাঁর বাক্সের ওপর রইলো।

"মানে, আপনার কাছেই থাকবে"—

বাবা জগদীশনাথের গলা বুজে এল আবেগে।

মেনকা মা বাক্সটা তুলে রাখলেন আলমারিতে। ফিরে এসে শুরু করলেন প্রশস্তি—

"আজকাল যত ফুঁকো বাহারের ঘটা। মা কি কণ্ঠীটা কিনেছিলেন ?"

"না। মানে ঠাকুদ্দা দিয়েছিলেন মুখ দেখে।"

"মুখ দেখে মুক্তোর কণ্ঠী দেবার মত কটা লোক মেলে এ আমলে ? জমিদারী মেজাজ, খানদানী পছন্দ কি সাধারণ কথা! আঙুল ফুলে কলাগাছ হলেও ও দুটো আপনি আপনি গজায় না।

বাবা জগদীশনাথের মন ভ'রে ওঠে। কিন্তু বাড়াবাড়ি করেন না। বিনম্র গর্বের সঙ্গে জের টানেন—

"মানে, বনেদিয়ানা তো ফরমাইসী চীজ নয়।"

"সত্যিই তাই" ব'লে মেনকা মা উঠে বাইরে গেলেন।

ফিরলেন চা-পর্বের সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে। বাহকের হাতে মস্ত বড় ট্রে। তাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ। একখানা প্লেটে সন্দেশ, রাজভোগ, পেস্তার বরফি। আর একখানায় কচুরি, সিঙ্গাড়া, ডালমুট, চপ, কাটলেট।

বাবা জগদীশনাথের সামনে টিপয় টেনে এনে মেনকা মা তার ওপর কাপ-ডিস, প্লেট রাখলেন। জোর ক'রে সব কটা খাওয়ালেনও।

চা-পর্ব শেষ হতেই এল ডিশে সাজানো পান, জর্দার কৌটো। একসঙ্গে গোটা চারেক পান মুখে পুরে জর্দার কৌটো খুলতে খুলতে বাবা জগদীশনাথ পানের প্রশংসা করলেন—

"খাসা পান।"

"খোঁজ ক'রে আনিয়েছি। সঙ্গে সেরা বেনারসী জর্দা। আপনি পান-খোর। আজকাল ডিবে নিয়ে আসেন না। কাল রাত্তিরে খেয়াল হতে লোক পাঠিয়ে অর্ডার দিয়েছিলাম।"

এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু বাবা জগদীশনাথ মাথার পাগড়ি নামাননি, চামড়া-ঘেরা নীল চশমা খোলেননি।

পানের ডিশ খালি হতে—মেনকা মা ঠাট্টা করলেন—

"আজ কি খুব বেশি লজ্জা ধরেছে? পাগড়ি-চশমা আর কতক্ষণ থাকবে?"

নিস্তেজ মুখে বাবা জগদীশনাথ ব'সে রইলেন।

সাড়া দেওয়ার লক্ষণ দেখালেন না।

"কি হল? কথা বন্ধ করলেন নাকি?"

ফচ্ ক'রে খানিকটা পানের পিক বেরিয়ে এল বাবা জগদীশনাথের মুখ থেকে। তিনি তাড়াতাড়ি রুমালটা বার করলেন।

এদিকে মেনকা মা আচম্বিতে টান দিলেন পাগড়ি ধ'রে।

"আরে, চুল কি হল? খুলুন তো দেখি চশমাটা।"

বাবা জগদীশনাথ যেন পাথরের মূর্তি।

মেনকা মা ছাড়লেন না। দু-হাতে গগ্‌লস উঠিয়ে নিলেন।

"য়্যা ? ভুরু শুদ্ধু লোপাট ?"

প্রথম বিস্ময়ের ঝোঁক কাটিয়ে মেনকা মা প্রশ্ন করলেন—

"চুল-ভুরু তো নিকেশ। এখন আবার চোখ বুজছেন কেন ?"

বাবা জগদীশনাথ পিটপিট ক'রে চাইলেন।

কৌতূহল আর কৌতুকের বাঁকা হাসি মিশিয়ে মেনকা মা ফের জিজ্ঞেস করলেন—

"ব্যাপারখানা কি ? মাথা খারাপ হয়েছে, না, নেশার ঝোঁকে এই কাণ্ড করেছেন ?"

নাচার হয়ে বাবা জগদীশনাথ মুখ খুললেন অগত্যা—

"মানে, আপনি, মানে, সেদিন আমাকে ভাল্লুক বলেছিলেন...."

"ভাল্লুক বলেছি, তাতে হয়েছে কি ? আপনি কি আসল ভাল্লুক ?"

"সেইজন্যে, মানে, সেইজন্যে আমি, মানে, মনে করলুম........"

বাবা জগদীশনাথ বিষম খেলেন।

মেনকা মা নিরস্ত করলেন তাঁকে—

"থাক, আর শুনতে চাই না।"

তবুও কাসতে কাসতে বাবা জগদীশনাথ করুণ নিবেদন জানালেন,

"মানে...খক্-খক্...জামাটা খুললে...খক্.... বুঝতে পারবেন.... খক....মানে, খক....জামাটা খুলি ?"

"আবার জামা খুলবেন ? এতেই র'ক্ষে নেই। এতদিনে বুঝলুম, আপনি হয় পাগল, না-হয় ছাগল।"

চেয়ারের মধ্যে ভেঙে পড়েন বাবা জগদীশনাথ। তাঁর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি স'রে যায়। চোখ ছলছল করে, পানের পিক চিবুক বেয়ে জামার ওপরে গড়ায়। মাথায় কয়েকবার হাত বুলিয়ে তিনি জোড়া ভ্রূর জায়গাটা ঘষতে থাকেন।

"ওতে আর কি চুল গজাবে ? নিন, চশমাটা চোখে আঁটুন।"

বাবা জগদীশনাথ নির্দেশ-পালন করলেন।

"নাঃ। পাগড়িটাও বসান মাথায়। এরকম বীভৎস দৃশ্য দেখলাম রাত পোয়াতে। দিনটা ভাল কাটলে হয়।"

জবাব দেওয়ার কিছু ছিল না। মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। উপায় নেই। বাবা জগদীশনাথ বসেই রইলেন। আকাশ পাতাল ভাবছেন আর অনুশোচনা হচ্ছে। ভাল্লুক বলেছে, বলেছে। তার জন্যে এতটা না-করলেই হত। চুল গজাতে বেশ সময় লাগবে। ততদিন না আসা! অসম্ভব!

বাবা জগদীশনাথ চমকে উঠলেন মেনকা মার স্বগতোক্তিতে—

"কটা বাজলো?"

বাবা জগদীশনাথ মুখ তুলতেই মেনকা মা দেওয়ালের ঘড়ি দেখে বললেন—

"সা-আতটা-আ! বেশ বেলা হয়েছে।"

বাবা জগদীশনাথ শুধু নড়লেন একটু।

"আজ এখানে দুটি না-খেয়ে গেলে ছাড়বো না"

খানিকটা সাহস ফিরে পেলেন বাবা জগদীশনাথ। আরম্ভ করলেন আগের কৈফিয়ৎ—

"মানে, আপনি আমাকে ভাল্লুক বলেছিলেন। তাই বাজার থেকে লোমনাশক লোশন আনিয়ে মেখেছি। তা, মানে, আপনি পছন্দ না-করলে মাসখানেক না হয় আসবো না। ততদিনে, মানে চুল গজিয়ে যাবে অনেকটা।"

"একদম গোবর-গণেশ। যাকগে, যা করবার করেছেন। পেট ভ'রে খাবেন, তাহলেই সব কসুর মাপ।"

বাবা জগদীশনাথের হিম্মৎ ফিরে এল। মনে হল, পাগল-ছাগল গোবর-গণেশ আদরের কথা। মেনকা মা নিশ্চয়ই প্রসন্না। তা নইলে খাবার নেমন্তন্ন করবে কেন। পেট ভ'রে খেলে কসুর মাপ করবে। সেটা কি অমনি?

খুশীতে শুধোলেন—

"খেতে হবে? মানে ভাত টাত?

"হ্যাঁ। আপত্তি আছে নাকি?"

"না, না। নিশ্চয় খাব।"

"বেশ, বেশ। এইতো ভাল ছেলের মত কথা।"

"চলুন তাহলে।"

"এখুনি খাব কি ক'রে?"

"আরে গঙ্গারাম! সকাল সাতটায় কি কেউ নেমন্তন্ন খাওয়ায়? আমার সঙ্গে ছাতে চলুন।"

বাবা জগদীশনাথ মেনকা মার পেছনে গিয়ে উঠলেন ছাতে। মনটা তাঁর ভরপুর। ছাতটা মস্ত বড়, উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। ঘরে ব'সে নিবিড় আলাপে অসুবিধে হচ্ছে। তাই বোধ হয় ছাতে যাওয়া। সহাবস্থানের সময় মাঝে মাঝে বিকেলে ছাতে বসা হত। সেটা ভোলেননি বাবা জগদীশনাথ।

ছাতের একদিকে একটা ঘর। মাঝখানে পার্টিশন করা। পার্টিশনের মধ্যে ছোট কপাট। বাইরে দুটো কুঠরীর আলাদা আলাদা দরজা। অ্যাসবেষ্টসের চাল। জানলা নেই কোনও।

আশ্রম বাসের সময় বাবা জগদীশনাথ বরাবর জোড়া দরজায় তালা ঝুলতে দেখেছেন। তাঁর কোনও অনুসন্ধিৎসা ছিল না। প্রভু কিশোর ঠাকুর একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভেতরে কি আছে। মেনকা মা জবাব দিয়েছিলেন, "পাঁচ রকমের ভাঙা-চোরা জিনিস রাখা হয় কুঠরি দুটোয়। ফুরসৎ পেলেই পরিষ্কার করাবো।" জগদীশনাথ তখন শুনেছিলেন। এতদিন পরে কথাটা মনে পড়লো।

একটা দরজার তালা খুলে মেনকা মা বাবা জগদীশনাথকে ভেতরে ঢুকতে বললেন। বাইরের স্যুইচ টিপে আলো জ্বাললেন।

কামরাটা ছোট্ট। চেয়ার রয়েছে একখানা, তার সামনে খুদে টুল। অন্য কোন আসবাব নেই।

বাবা জগদীশনাথ দেখতে লাগলেন চারদিক। এইরকম ঘরে ঢোকার পরে কি ঘটতে পারে, আন্দাজ ক'রে উত্তেজনায় তাঁর সর্বাঙ্গে শিহরণ লাগলো।

"আরে! হাঁ ক'রে রইলেন যে! বসুন চেয়ারে।"

"য়্যাঁ? তা, মানে, আপনি চেয়ারে বসুন, আমি টুলটায় বসি।"

"আমি থাকছি না এখানে।"

"তাহলে?

মেনকা মা উত্তর দিলেন চটপট—

"নিচে এখুনি একজন হাজির হবে। সে চ'লে গেলে আপনি নামবেন, স্নান সারবেন। তারপর খাওয়া। আপনি বসুন হাত-পা ছড়িয়ে। ওপরের গর্ত দিয়ে হাওয়া আসবে। কোনও অসুবিধে হবে না। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আমি ফিরছি।"

"দেরি করবেন না তো?"

"বেশি দেরি হবে না। তিনদিন ধ'রে খাওয়াবার যোগাড় করছি। আপনি খাইয়ে লোক। দু-একটা জিনিস আমি নিজের হাতে রাঁধবো। তাতে আর কত সময় লাগবে?"

আকস্মিক প্রত্যাশা অপূর্ণ রইলেও কৃতকৃতার্থ বাবা জগদীশনাথ চেয়ারে গিয়ে বসলেন। মেনকা মা বাইরের শিকল টেনে আলো নিভিয়ে দিলেন।

ছাতের ওপর পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে বাবা জগদীশনাথ উঠলেন আবার। মেনকা মার সামনে পাগড়ি-চশমায় হাত দিতে সাহস হয়নি। এখন সে দুটো রাখলেন চেয়ারের ওপর। গরম লাগছিল খুব। গেঞ্জি, পাঞ্জাবি খুলে ছড়িয়ে দিলেন চেয়ারের পিঠে। পাগড়িটা চাপালেন টুলের মাঝখানে! হাতড়িয়ে পাগড়ির ফাঁকে রাখলেন চশমা আর ঘড়ি। চেয়ার টেনে নিলেন দেওয়ালের গায়ে।

ভাল দেখা যাচ্ছিল না। তবু অসুবিধে হল না। তারপর জুতো খুলে পা তুলে চেয়ারে অধিষ্ঠান। মনে মনে আওড়াতে লাগলেন, "দেড় ঘণ্টা, না-হয়, জোর দু-ঘণ্টার মধ্যে আসবে। তা, ছাতে পায়ের আওয়াজ পেলেই জামা-টামা প'রে নোবো। ততক্ষণ বসি একটু হেলান দিয়ে।"

চেয়ারের পিঠ ছাড়িয়ে বাবা জগদীশনাথের মাথা ঠেকলো গিয়ে পাঁচিলে। দেখতে দেখতে ঘড়ঘড় ক'রে নাক ডাকা আর দরদর ক'রে ঘাম ঝরা শুরু হল তাঁর।

তেইশ

পাক্কা সাড়ে সাতটায় প্রভু কিশোর ঠাকুরের আবির্ভাব হল। তাঁর হাতেও কাগজে মোড়া কি একটা। মেনকা মার পাশে বসতে বসতে শুধোলেন—

"এতে কি আছে, জানেন ?"

মেনকা মা নিরালম্ব মন্তব্য করলেন,

"জানা সম্ভব নয়।"

"আন্দাজ করুন।"

"আমসত্ব ?"

"উঁহু। ধরতে পারলেন না। দেখুন।'

নিতান্ত সন্তর্পণে প্রভু মোড়কটা খুললেন। খান-কয়েক কাগজ। তার নিচে তূলো।

মেনকা মা একটু উৎসুক হলেন।

তূলোর আবরণ থেকে বেরুলো রূপোর ছোট বাঁশী একটা।

"বৃন্দাবনের জিনিস। মোহন বাঁশী। যোগাড় করতে গিয়ে মরতে বসেছিলাম। লাখ টাকা কবুল করলেও এর জুড়ি মিলবে না।"

প্রভু কিশোর ঠাকুরের হলফে মেনকা মা অবিশ্বাসের প্রশ্ন করলেন—

"বটে ?"

'বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

প্রভুকে ক্ষুণ্ণ দেখে মেনকা মা বললেন—

"বেশ। বিশ্বাস করলুম। কিন্তু, এটা আমার কাছে কেন ? আমার ঘরে মোহন বাঁশী দেখলে ভক্তেরা কি ভাববে ?"

"বৃন্দাবনে একটা মন্দিরে কৃষ্ণ-বিগ্রহের হাতে ছিল।"

"হাত সাফাই ক'রে এনেছেন, কেমন ?"

"না, না। পাণ্ডার কাছ থেকে পাওয়া।"

"থাক। অত কাহিনী শুনতে চাই না। কাগজে মুড়ে রাখুন। যাবার সময় নিয়ে যাবেন।"

"আমার এ উপহার গ্রহণ করবেন না আপনি ?"

প্রভু কিশোর ঠাকুরের চোখ ভিজে উঠলো।

"আমি এটা দিয়ে কি করবো ?"

"আলমারিতে রাখবেন। জাগ্রত জিনিস।"

"নিজে নিজেই বেজে ওঠে নাকি ?"

"না।"

"মরুকগে, দিন", বলে মেনকা মা বাঁশীটা নিলেন হাতে। একবার ঘুরিয়ে দেখলেন। তারপর মুচকি হেসে রেখে এলেন সেটা আলমারিতে। হাসিও মিলিয়ে গেল। মুখে ফুটে উঠলো থমথমে ভাব।

প্রভু কিশোর ঠাকুর কিন্তু কথার ফোয়ারা ছোটাচ্ছিলেন। বাঁশীটার খবর পেয়েছিলেন এক বৈরাগীর কাছে। ওটা যোগাড় করতে তাঁকে দিনের পর দিন ভাঁওতা দিতে হয়েছে, রাতের পর রাত ঘুরতে হয়েছে বৃন্দাবনের অলিতে গলিতে। হাতাবার পর পড়েছিলেন একদল ডাকাতের পাল্লায়। বন্দুক-বল্লম-ঢাল-তরোয়াল নিয়ে তারা বেজায় তাড়া করেছিল। যমুনায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, কাছিমের কামড় খেয়ে কোনও রকমে বেঁচে যান।

মেনকা মা থামালেন তাঁকে—

"আরও যা হয়েছিল, বাদ দিলেন কেন ?"

প্রভু কিশোর ঠাকুর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

"কি রকম ?"

"কি রকম ? ভুলে গেছেন বুঝি ? শুনুন তাহলে। যমুনা পেরিয়ে বাঁশীটা পেট-কাপড়ে বেঁধে আপনি ছুটতে আরম্ভ করলেন। সে কি ছুট। পেছন থেকে বন্দুক ছোঁড়ে, গুলি বেরিয়ে যায় শাঁ শাঁ

ক'রে কান ঘেঁষে। শড়কি চালায়, গোড়ালির পাশে এসে পড়ে। আপনি দৌড়োচ্ছেন তো দৌড়োচ্ছেন। বাঁই বাঁই ক'রে দৌড়োচ্ছেন। মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, গা দিয়ে কুল-কুল ক'রে ঘাম বেরুচ্ছে। তবুও আপনি ছুটছেন। সামনে পড়লো রেল-লাইন। গাড়ি আসছিল একখানা। তার একটা কামরা তাগ ক'রে আপনি এক লাফে হাতল ধ'রে ঝুলে পড়লেন।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর বেমালুম সব হজম করলেন। কাহিনীর গোড়ায় চোখ দুটো তাঁর বড় হয়ে উঠেছিল। মেনকা মা যখন শেষ করলেন, তাঁর মুখ তখন ভাবলেশহীন।

"কি ? পরের ঘটনাগুলো শুনবেন ?"

"বেশ গল্প বানাতে পারেন আপনি।"

"আজ্ঞে না। এ ব্যাপারে আপনি আমার গুরুদেব।"

"ঘ্যাঁ ? তাহলে আমাকে খাঁটি খাঁটি তামাসা করলেন এতক্ষণ ?"

"কি মনে হয় ?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে, যে বৈরাগীটা আমাকে প্রথম খবর দিয়েছিল, তাকে নিয়ে এলে প্রমাণ পাবেন, আমার কথা আগাগোড়া সত্যি কিনা।"

"সুন্দর প্রস্তাব। উত্তম কথা। যান, বৈরাগীকে ডেকে আনুন। সে বোধ হয় যমুনা-ধামের ধারে কাছে চ'রে বেড়াচ্ছে।"

"সবটাতেই আপনার সন্দেহ। তাকে এখনই পাব কোথা থেকে ? সময় লাগবে। খোঁজ করতে হবে, আখড়ায় আখড়ায় লোক পাঠাতে হবে।"

"অত হাঙ্গামার দরকার নেই। বৈরাগী এখন তার আখড়ায় নাম জপ করতে থাকুক। চা, খাবার আসছে। খেয়ে চলুন ছাতে। ছোট ঘরটায় বসতে হবে একটু। জাঁদরেল এক বুড়ো আসবে সাড়ে আটটার পর। সে চ'লে গেলে নিচে নামবেন। স্নান হয়নি তো ?"

"শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করছে। আজ আর নাওয়া-ধোওয়া নয়।"

"বেশ, বেশ। ও পাটে যে আপনার অরুচি, তা ভুলে গেছিলাম। রান্না হয়ে যাবে এগারটার মধ্যেই। খানিকটা গল্প ক'রে খিদে বাড়িয়ে খাবেন অখন।"

"দেখুন, একটা নিবেদন জানাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু আপনার ঠাট্টায় সব গোলমাল হয়ে গেল।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর বিনয়ে থামলেন।

"বলুন না। অত সমীহ কিসের?"

"খাবার সময় আপনিও বসবেন তো সঙ্গে?"

"বসবো, দাঁড়াবো, ভেতরে বাইরে দাপাদাপি করবো, হাঁফাবো। অতিথি-সেবা কি সাধারণ ব্যাপার? তার ওপর, যে সে নয়। প্রভু কিশোর ঠাকুরের অন্ন-ভোগ। সাধারণ কাণ্ড?"

"আঃ। সব কথা আপনি হেসে উড়িয়ে দেন। আমি বলছিলাম, একসঙ্গে খাবেন তো?"

"একসঙ্গে খেতে হবে?"

"হ্যাঁ। একটা বছর পুরো আমি আর জগদীশনাথ এক ঘরে খেতাম। আপনি বসতেন আলাদা ঘরে। কিন্তু, আজ তো আর সে নেই।"

"হ্যাঁ। তা বটে। আচ্ছা, দেখি কতদূর কি দাঁড়ায়।"

চা-সিঙাড়া-সন্দেশ এসে গেল। প্রভু খেলেন সব। চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতেই মেনকা মা তাড়া দিলেন—

"জলদি চলুন। আপনি বড় গেঁতো।"

প্রভু উঠলেন। মেনকা মা তাঁকে নিয়ে গেলেন সঙ্গে ক'রে। ছাতের যে কুঠুরিতে বাবা জগদীশনাথ, তার পাশের খোপে জায়গা হল প্রভুর। মেনকা মা আলো নিভিয়ে দরজা আটকে দিলেন।

এ কুঠুরিতে শুধু একখানা চেয়ার। তার ওপর গা এলিয়ে প্রভু কিশোর ঠাকুর গান ধরলেন গুণগুণ ক'রে।

কিন্তু গান এগুলো না। মনে আলোচনা শুরু হল—"টান বড় জোর। নেমন্তন্ন করেছে। এক সঙ্গে খাবে নিশ্চয়। ওর পাত থেকে দু-একটা জিনিস তুলে নোবো। বাধা দেবে ঠিক। আমিও অমনি রাগ দেখাবো। খাওয়া বন্ধ ক'রে হাত তুলে বসবো। উঠে যাবার ভয় দেখাবো। এত কাণ্ডের পর খোলাখুলি হার না-মেনে যাবে কোথা! যত খেলাই খেলুক না, মেয়ে মানুষ বৈতো নয়। দশ হাতে কাঁছা জোটে না।"

কল্পনার পট প্রসারিত হল অনাগত দিনের দিকে। মনের খেলা আরও সীমা বাঁধলো। প্রভু কিশোর ঠাকুর ভাবতে লাগলেন—"ওর হাতে টাকা আছে যথেষ্ট। আমিও জমিয়েছি মন্দ নয়। কিন্তু একসঙ্গে থাকলে পশার মাটি হবে। দূরে কোথাও পাহাড়ে দেশে ভাল একখানা বাড়ি চাই। মাসে এক হপ্তা ওর সঙ্গে থাকবো সেখানে। বাকী তিন হপ্তা যমুনা-ধামে। তা হোক। কুন্তলারা আছে। আরও কত আসবে।"

গরম বরদাস্ত হলেও মাথাটা বড় চিড়বিড় করছিল। প্রভু পরচুলা পাশে নামিয়ে রাখলেন। কণ্ডূয়ন শেষ ক'রে আবার চিন্তা—"কুন্তলাটা বড় গোঁয়ার। তবে মিষ্টি কথায় ভুলে যায়।"

ফের পিঠ চুলকোয়। কুন্তলা চ'লে গেল নেপথ্যে। পিঠের জ্বলুনিতে প্রভু চাপা গলায় ব'লে উঠলেন, "নাঃ, ব্রাউজের মধ্যেই ছারপোকা ঢুকেছে।"

ব্রাউজ ইত্যাদি পড়লো মেঝের ওপর। প্রভু সাড়িটা জড়ালেন কোমরে। তারপর চেয়ারে ব'সে পা ছুটো এগিয়ে দিলেন সামনের দিকে। দু-হাত ঝুললো দু-পাশে।

প্রভুর মাথায় আবার নানা কথা কিলবিল করতে থাকে—"কুন্তলা, রেবা, ধনানী এমনিতে খারাপ নয়। কিন্তু, নেহাৎ কচি সবাই। গাল টিপলে দুধ বেরোয়। ওদের সঙ্গে পোষায়? ভ্যান-ভ্যানানি, প্যান-প্যানানি লেগেই আছে।"

মেনকা মার চেহারাটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। প্রভুর মনে পড়ে সেই চুল টানার কাহিনী। কুন্তলা-রেবা-বনানী কখনও করেনি ওরকম। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চুলের মুঠি ধরে নাড়তে পারবে ওরা ? প্রভুর রোমাঞ্চ হয়। আবার মিহি সুরে গান ধরেন।

বাবা জগদীশনাথের ঘুম পাৎলা নয়। কিন্তু, সুখী মানুষ। দেওয়ালে বারবার মাথাটা ঘষড়ে যাচ্ছিল। ভ্যাপসা গরমে সেদ্ধ হওয়ার যোগাড়। অনবরত তন্দ্রা আসছে আর ভাঙছে। তারই মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখছেন খণ্ড খণ্ড। সাঁওতাল ধাত্রী সন্দেশ খাওয়াচ্ছে। তার জায়গায় মেনকা মা দেখা দিলেন সামনে। হাতে তাঁর ছোট একখানা লাঠি। চোখ নাচিয়ে বলছেন, "এই ভাল্লুক, ভাল ক'রে নাচতো।" বাবা জগদীশনাথ জোড় হাতে কবুল করছেন, "আমি যে নাচতে জানি না।" তাতে কান না-দিয়ে মেনকা মা ভয় দেখাচ্ছেন, "না-নাচলে খেতে দোবো না।"

পরের দৃশ্যে মেনকা মা ব'সে আছেন সোফায়। বাবা জগদীশনাথ শীর্ষাসনে। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। মাথাটা কিরকম জ্বালা করছে। তবুও মেনকা মা মস্করা চালাচ্ছেন, "এতো বাচ্ছা ছেলেও পারে।" জবাব দিতে গিয়ে বাবা জগদীশনাথের খাড়া পা-জোড়া ন'ড়ে যায়। স্বপ্নের মধ্যেই তিনি টের পান—প'ড়ে যাচ্ছেন।

চেয়ার সামনে এগিয়ে গেল। টুলটা ছিটকিয়ে বাবা জগদীশনাথ ডিগবাজি খেলেন। ঘুমের ঘোরে প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলেন। তন্দ্রা ছুটলো, কিন্তু অবস্থাটা বুঝতে সময় লাগলো।

মাথা জ্বলছে, ঘাড় টনটন করছে। বহু কষ্টে টুল সরিয়ে, চেয়ার ছাড়িয়ে বাবা জগদীশনাথ উঠে দাঁড়ালেন। মনে পড়লো সব। রাগ হল খুব। ক্ষোভে বকতে শুরু করলেন, "যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড। কখন আসবে, ঠিক নেই। বেলা কত হল, কে জানে।

ঘড়িটা দেখবো, তারও উপায় নেই।" টুলের চারপাশ হাতড়ালেন, । "নাঃ, কোথায় ছিটকে গ্যাছে। ভেঙেছে নিশ্চয়।"

বাবা জগদীশনাথ মাথায় হাত বোলালেন, ঘাড়ে ডান হাত দিয়ে আস্তে আস্তে মালিশ করলেন। কাপড় দিয়ে ঘাম মুছলেন, চেয়ারটা তুলে আবার দেওয়ালের গায়ে রাখলেন। মেঝের ওপর ঝুঁকে ব'সে ঘড়ির টিক-টিক শব্দ শোনার চেষ্টা করতে লাগলেন।

পার্টিশনের ওপাশ থেকে প্রভু কিশোর ঠাকুর আচমকা জোরদার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। চেয়ার, টুলের ঘড়ঘড়ানিও কানে গেল তাঁর। মেনকা মা নিশ্চয়ই নয়। আর কেউ পাশের কামরায় ঢুকেছে আন্দাজ ক'রে প্রভু ডুব দিলেন চিন্তায়—

"বাঁশীটা আলমারিতে রেখে দিল। মুখে যা-ই বলুক, পছন্দ না-হয়ে যায় কোথা! অমন লাগসই জিনিস।"

বাবা জগদীশনাথ আবার ঢুলতে আরম্ভ করলেন।

প্রভু কিশোর ঠাকুর আবার গান ধরলেন।

বাবা জগদীশনাথ স্বপ্ন দেখছেন, মেনকা মা গান শোনাচ্ছেন তাঁকে। দেওয়ালে মাথা ঠুকে গেল, কিন্তু, গান থামলো না। ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ঝিমুনির ঘোর কাটেনি তখনও। স্বরটা চেনা চেনা, মেনকা মার হতে পারে।

সব জড়তা উবে গেল নিমিষে। মনে তাঁর অভিমান,

"এ ঘরে ভ্যাপ্‌সা গরমে সেদ্ধ হচ্ছি আমি। প'ড়ে গেলাম। মাথা জ্বলছে। ঘাড়টা, কোমরটা টনটন করছে। আর, বাইরে ব'সে উনি গান ধরেছেন? এত মস্করা বরদাস্ত করা যায়। আমাকে কষ্ট দিয়েই খুশী।"

তর সইলো না। বাবা জগদীশনাথ সামনের দরজা ধ'রে টান মারলেন। খুললো না। বুঝতে পারলেন, গানের সুর ভেসে আসছে পাশের কুঠুরি থেকে। মনে পড়লো, সে দিকেও দরজা

আছে একটা। পার্টিশনে হাত চালিয়ে হদিশ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জোর এক ধাক্কা। খটাস ক'রে পাল্লা খুলে গেল।

তারপর একদম মুখোমুখী। কেউ কাউকে ঠাওর করতে পারলেন না।

প্রভু কিশোর ঠাকুর ভাবলেন, মেনকা মা বোধ হয় নতুন রহস্য করছেন। বললেন,

"কি? রান্না-বান্না হল?"

সঙ্গে সঙ্গে ক্রুর গর্জন,

"রান্না-বান্না? এখানেও তুমি? খাওয়ার সখ মিটিয়ে দিচ্ছি জন্মের মত।"

সর্বনাশ। এ যে বাবা জগদীশনাথের গলা। প্রভুর চিন্তাশক্তি লোপ পায়। সমস্ত পেশী-স্নায়ুতে যেন পক্ষাঘাত ধরে। প্রভু ব'সে থাকেন শুধু।

"কখন এসেছো? কেন এসেছো? কি ক'রে এলে এখানে, এই ঘরে? জবাব দাও।"

দাঁত কড়মড়িয়ে বাবা জগদীশনাথ কৈফিয়ৎ তলব করলেন।

প্রভু কিশোর ঠাকুরের মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি বেরুলো না।

হঠাৎ ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। বাইরে সুইচ টেপার আওয়াজ কানে যায়নি কারুর।

নিস্পন্দ প্রভু আঁৎকে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে—যেন ইলেক্‌ট্রিকের শক লেগেছে। সামনে তাঁর কি ভীষণ মূর্তি। চুল নেই, ভ্রূ নেই, চোখ ছুটো ঠিকরে বেরুচ্ছে, গা দিয়ে ঘাম পড়ছে দরদর ক'রে।

প্রভু কিশোর ঠাকুর কিছুই মাথায় আনতে পারেন না। বাবা জগদীশনাথ এখানে এসময় এমন ভয়ানক চেহারা নিয়ে হাজির। চোখ জ্বলছে, ঝাঁপিয়ে পড়লো ব'লে।

তবু সামলাতে হবে। একটু মাথা খেলিয়ে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন—

"কে ? বাবা জগদীশনাথ না ?"

"হুম্! তোমার যম! চিনতে পারছো না ? বাহারে সাজ! মুখে রঙ, পরণে সাড়ি! বাঃ!"

কৌতূহলের নাম-গন্ধ নেই। বাবা জগদীশনাথ শিকার-লোলুপ শ্বাপদের মত পা বাড়ালেন। এবার দফা নিকেশ! অন্তত কথা-বার্তায় আটকাতে হবে। তা নইলে এখনই টুঁটি চেপে ধরবে!

বিমর্ষ হাসি মিশিয়ে প্রভু প্রশ্ন করলেন—

"আরে ? আপনার ভুরু গেল কোথা ?"

"ন্যাকামি হচ্ছে ? জানো না ?"

"আপনার ভুরু, চুল। আমি তার খবর রাখবো কি ক'রে ?"

"তোমার জন্যেই আমার এ হাল হয়েছে।"

বাবা জগদীশনাথ আরও এগিয়ে নির্মম হুঙ্কার ছাড়লেন—

"ছটা আংটি, মুক্তোর কণ্ঠী, ভুরু, চুল—সব শোধ তুলবো সুদে আসলে!"

প্রভু একেবারে কুঁকড়িয়ে গেলেন। বুঝলেন, নিস্তার নেই। তাঁর গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের মধ্যে ষ্টিম-রোলার চলছিল। মেনকা মার উদ্দেশ্যটা তলিয়ে দেখবার অবকাশ ছিল না। বাইরে থেকে আলো জ্বালিয়ে ভেতরে আসার নামটি নেই। যমের মুখে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখবার মতলবই শুধু নয়। আরও কিছু আছে সঙ্গে। কিন্তু, জান বাঁচলে তবে তো নালিশ-ফরিয়াদ-ফয়সালা! সময় কাটাতে হবে! এক একটা সেকেণ্ডের দাম এখন লাখ টাকা। বাবা জগদীশনাথ ঝুঁকলেন খানিকটা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে বললেন,

"টুঁটি টিপে খতম করবো, চাপাটি বানাবো।"

প্রভু অমনি হাত জোড় ক'রে, কান্না জুড়ে দিলেন—

"দোহাই আপনার, উঃ-উঃ, আংটি-কণ্ঠী উঃ-উঃ, ভুরু-চুলের জন্যে আমি দায়ী নয়....উঃ-উঃ।"

প্রভুর চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়ছিল।

"নাকী কান্নায় ভোলাবে ভেবেছো? ওঠো-ও-ও—"

বাবা জগদীশনাথ বাঁ হাতে প্রভুর চুল ধ'রে মারলেন হ্যাঁচকা টান। এক লহমার জন্যে মনের পর্দায় ভেসে উঠলো কেশাকর্ষণরতা মেনকা মার ছবি। তারপরই চালভেদী চীৎকার—

"ওরে, বাবারে! মেরে ফেল্লেরে। বাঁচাও, বাঁচাও।"

বাবা জগদীশনাথ ডান হাতের থাবড়ায় মুখটা চাপলেন। আর্তনাদ পরিণত হল গোঙানিতে।

প্রভু কিশোর ঠাকুর থরথর ক'রে কাঁপছিলেন।

দাঁতে দাঁত দিয়ে বাবা জগদীশনাথ বললেন—

"ব্যাটা। তোকে আগে খতম করি এখানে। তারপর ওর সঙ্গে বোঝাপড়া।"

বোঝাপড়ায় কিন্তু দেরি হল না। বাইরের দরজাটা খুলে গেল। উত্তেজিত বাবা জগদীশনাথের খেয়াল ছিল না সে দিকে। প্রভু কিশোর ঠাকুর আশ্বস্ত হলেন খানিকটা।

মেনকা মা বাইরে দাঁড়িয়ে।

"কি? খাতির জমাচ্ছেন দুজনে?"

মেনকা মার গলা পেয়ে বাবা জগদীশনাথ মাথা ঘোরালেন। চার চোখ এক হল। মেনকা মার বাঁকা ঠোঁটে রহস্য পুঞ্জীভূত। হাসছেন না তিনি। ক্রোধ বা অনুশোচনারও নিশানা ছিল না তাঁর মুখে।

প্রভু কিশোর ঠাকুরের মুণ্ডু বাগিয়ে রেখেই বাবা জগদীশনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন—

"জবাব চাই! আমাকে জবাব দিতে হবে—এসবের মানে কি!"

"জবাব? সত্যিই জবাব না-দিলে চলবে না?"

"আলবৎ! একশোবার।"

"একশো পর্যন্ত ধৈর্য থাকবে না আপনার। আপনার মুখে শোনা সব কথা লিখে রেখেছি, সন-তারিখ মিলিয়ে। সখ মিটতে

একবারের বেশি তুবার দরকার করবে না। পুলিশ ডাকাচ্ছি। জবাব মিলবে থানায় গিয়ে।”

মেনকা মা হাত নাড়লেন পেছন ঘুরে। জোড়া কুকুর ডেকে উঠলো দরজার বাইরে।

বাবা জগদীশনাথের ভাব-পরিবর্তন শুরু হল। প্রভু কিশোর ঠাকুরের মুখটা ছাড়লেন, কিন্তু চুলের মুঠি হাতে রইল। প্রভু কান্না আরম্ভ করলেন—

“বাঁচান আমাকে। ডাকাত, খুনে! মেরে ফেলবে! উ-উ-উ-উ!”

বাবা জগদীশনাথের দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাইলেন মেনকা মা। বললেন,

“আশী বছরেও আপনার আক্কেল হবে না। থানায় লোক পাঠাচ্ছি। হাজতের দরকার এখন।”

“পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন?”

বাবা জগদীশনাথের প্রশ্নে তাচ্ছিল্যের মধ্যেও আতঙ্ক প্রকাশ পেল।

“আরে? ভয় দেখাবো কেন? পুলিশের সঙ্গে ঘর করা আপনার অভ্যেস আছে। পুলিশ আপনার কুটুম্ব। তবে কিনা, আমার এখানে এখন তুই বন্ধুর লড়াই বন্ধ করতে হ'বে।”

“আংটিগুলো? কণ্ঠীটা?”

“আবল-তাবল বকার অভ্যেস আপনার যাবে না। অত শোনবার সময় নেই আমার। ধরা-চূড়ো প'রে স'রে পড়ুন দেখি।”

“বটে? স'রে পড়বো?”

প্রভু কিশোর ঠাকুরের চুল ছেড়ে বাবা জগদীশনাথ মেনকা মার সামনাসামনি হলেন।

প্রভু ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারলেন না। কিন্তু, যমের হাত থেকে তখনকার মত রক্ষে পেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

বাবা জগদীশনাথ ঘন ঘন দম ফেলছিলেন।

মেনকা মা শুধোলেন,

"বড্ড অদ্ভুত লাগছে, কেমন? আমি কিন্তু তামাসা করছি না মোটে। আপনার বন্ধুটির সামনে সব বেফাঁস করতে চাই না।"

বাবা জগদীশনাথ নির্বাক রইলেন।

"সাজগোজ সেরে বিদেয় নিন এখুনি। বেশি সময় নষ্ট করতে পারবো না। ....যা-আ-ন!"

মেনকা মার কথায় পুরোদস্তুর দৃঢ়তার পরিচয় ছিল।

বেত্রাহত কুকুরের মত বাবা জগদীশনাথ গিয়ে ঢুকলেন পাশের ঘরে। সেখানে থেকে ভেসে এল চাপা গলার রুদ্ধ নালিশ—"এ বেইমানির বিচার করবেন ভগবান।"

মেনকা মা সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন দিলেন—

"ভগবান বেচারা আজকাল প্রভু জগীশনাথের ট্যাঁকে থাকেন।"

প্রভু কিশোর ঠাকুরও জের টানলেন,

"হেঁ, হেঁ, যেমন পাজি তেমনি............"

মেনকা মার দাবড়ানিতে প্রভুকে থামতে হল। নইলে বাবা জগদীশনাথের ওপর আর খানিকটা ঝাল ঝাড়তেন।

মুখ বন্ধ করলেও প্রভু কিন্তু ঘাবড়ালেন না। আবহাওয়া অনুকূল হয়ে আসছে মনে ক'রে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে।

"হায় ভগবান! আমার কপালে এই ছিল!"

বাবা জগদীশনাথের বুকফাটা আফশোষ শোনা গেল।

প্রভু অমনি মাঝের দরজাটা দেখিয়ে ইসারায় বন্ধ করতে বললেন। কিন্তু মুসড়ে গেলেন মেনকা মার ঝাঁঝালো তিরস্কারে—

"দরজা বন্ধ ক'রে খোস গল্প, কেমন? সখটা যে খু-উ-ব! পোষ মাসের আশা ছাড়েননি এখনও? আপনার মত ঝানু লোক আমি খুব কম দেখেছি। অভিনয় করেন চমৎকার। মাঝে মাঝে গলদ ধরা পড়লেও আপনার কেরামতি তাক লাগায়।"

ঢোঁক গিলে, পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে প্রভু হাঁটু গাড়লেন ঝুপ ক'রে।

"ও সবে আমাকে ভোলাতে পারবেন না।"

মেনকা মার কথা গায়ে না-মেখে প্রভু ঝুঁকে পড়লেন তাঁর পায়ের ওপর।

"কি? এবার পায়ে ধ'রে নিষ্কৃতি পেতে চান? ফটো কখানা যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছি। সময়ে-অসময়ে দেখবো, দেখাবো, বুঝলেন?"

"কি করবো আমি?"

প্রভু মেঝের ওপর মাথা রাখলেন।

"পগার পার হোন। দেরী করলেই বিপদ। আগে কুকুর, তারপর ফটো।"

"না, না। আমি যাব, যাচ্ছি। শুধু........শুধু সময় দিন একটু।"

স্খলিত-কণ্ঠে প্রভু কিশোর ঠাকুর বাঁ হাত দিয়ে পাশের কামরা দেখালেন।

"কোনও ওজর শুনবো না।"

প্রভু কেঁদে উঠলেন ভেউ ভেউ ক'রে—

"এখন বাইরে গেলে রক্ষে থাকবে না। জান যাবে। পেছন থেকে লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে।.......বাঁচবার মেয়াদ চাইছি, প্রাণ—প্রাণ-ভিক্ষে!"

আবেদনে সাড়া দিলেন না মেনকা মা।

বাবা জগদীশনাথ এলেন পাগড়ি-পাঞ্জাবি চাপিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মেনকা মার হুঁসিয়ারি—

"হায়, হায়! সব গোলমাল ক'রে ফেলেছেন দেখছি। চশমা পরুন। তা-নইলে রাস্তায় তাড়া খাবেন।"

বাবা জগদীশনাথ গজরালেন—

"অন্ধকারে না-পেলে কি করবো?"

"গিয়ে খুঁজুন। আলোটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি ওঘরের।"

বেরিয়ে সুইচ টিপলেন মেনকা মা।

চশমা লাগিয়ে বাবা জগদীশনাথ আবার ঢুকলেন। মেনকা মা দরজায় দাঁড়িয়ে।

"যাচ্ছি"—

বাবা জগদীশনাথের বিদায়-সম্ভাষণে মেনকা মা উত্তর দিলেন,

"আজ খাওয়া হল না। চুল গজালে আর একদিন হবে।"

বুক চিতিয়ে মাথা সোজা ক'রে দাঁড়ালেন বাবা জগদীশনাথ। বললেন—

"পরের বাড়ি ভিখ মেঙে খাই না, আমি। লোককে দিতে জানি।"

"হ্যাঁ। জমিদারি আদৎ যাবে কোথা।"

মাথা নিচু ক'রে বাবা জগদীশনাথ চ'লে গেলেন।

এবার প্রভুর পালা। মেনকা মার সিধে পরোয়ানা—

"সটাং রাস্তায়।"

মুখে হাত চাপা দিয়ে প্রভু তখনও অঝোরে কাঁদছিলেন।

"রাস্তায় গিয়ে গাড়ি নিন একখানা। যমুনা-ধাম খাঁ খাঁ করছে। সশরীরে অধিষ্ঠিত হ'ন গিয়ে সেখানে। জগদীশনাথ এতক্ষণে এগিয়ে গেছেন অনেকটা। কোনও ভয় নেই।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর চোখ মুছলেন, উবু হয়েই পরচুলা আঁটলেন। কাপড়-চোপড় ঠিক করতে তাঁর যেন হাত সরছিল না।

মেনকা মা শাসালেন—

"দেরী করলে ছাড়বো না। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে নামবো।"

ঘোমটা টেনে, ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে প্রভু বেরুলেন কুঠুরি থেকে।

"হাঁটি-হাঁটি পা-পা নয়। জোর কদমে।"

"জগদীশনাথ পা মাড়িয়ে দিয়েছে।"

"ফের ধাপ্পা? দেখবেন মজা?"

"না, না। বলছিলাম, টাকা পেলে ফটো ক'খানা দেবেন?"

"দিতে পারি। খুশী হয় নেবেন।"

"কত লাগবে?"

"ঠিক বিশ হাজার।"

"সর্বনাশ! অত পাব কোত্থেকে?"

"না-পান, নেবেন না।"

সিঁড়ির মাঝামাঝি পৌঁছে প্রভু দাঁড়ালেন একটু। মেনকা মা তাড়া লাগালেন—

"আবার কি হল?"

"কিচ্ছু না। ফটোর সঙ্গে নেগেটিভগুলো মিলবে তো।"

"নিশ্চয়। সেইজন্যেই তো বিশ হাজার।"

সদরের কাছে বীরু ঘুরঘুর করছিল। প্রভু মাথা নিচু ক'রে সদর পার হলেন।

চব্বিশ

বাবা জগদীশনাথের ডেরা একদম ভোল পাল্টায়। আলো জ্বলে দু-একটা। ভক্তেরা দোতলায় উঠতে পায় না কেউ। বিশ্বনাথ-বদ্রিনাথও ওপর-মুখো হয় খুব কম। লোক এলে তারা জানিয়ে দেয়, "বাবা সমাধিতে আছেন। কতদিন কাটবে, ঠিক নেই।" দুজনে পালা ক'রে দিনে রাতে বাবার কাছে খাবার পঁওছায়। একটু দুধ, না-হয় ঘোলের সরবৎ—এর বেশি কিছু তিনি মুখে দেন না।

বিশ্বনাথ-বদ্রিনাথ বোঝে, ব্যাপার ভয়ানক রকম গুরুতর। বাবা সব সময়ই মৌন। পড়ে থাকেন টান হয়ে। দু-চার বার ডাকলে মাথা নাড়েন, হাত নাড়েন। তাতে স'রে না-গেলে "হুঁ, হুঁ" করেন। চেলা দুজন তাই বাবার কাছে এগোয় খুব কম। বাবার প্রসঙ্গ নিয়ে নিজেদের মধ্যে নিরালায় আলোচনা করে তারা।

বিশ্বনাথ বলে,

"চুল-ভুরু সব যাবার পর থেকেই বাবা যেন আলাদা মানুষ।"

বদ্রিনাথ সায় দেয়,

"ওঁর মত খাইয়ে লোক! ধরতে গেলে, ঠায় উপোস চালাচ্ছেন আজকাল।"

বিশ্বনাথ মন্তব্য করে,

"কড়া ধাঁচের তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় এই রকম হয়েছে।"

বদ্রিনাথ শুধোয়,

"তবে উপায়?"

উপায় ঠাওরাতে পারে না তারা।

রোজ দুপুরে সময় ধ'রে কাঞ্চন-গৌরীবালা ডেরায় আসে। কেউ ওপরে যায় না।

একতলার একখানা ঘরে বিশ্বনাথ নিয়ে বসায় কাঞ্চনকে। গৌরীবালা ঢোকে বদ্রিনাথের সঙ্গে ছোট আর একখানা কামরায়।

বিমর্ষ কাঞ্চনকে বিশ্বনাথ নানা তত্ত্ব বোঝায়। তন্ময় কাঞ্চন চেয়ে থাকে তার দিকে। মাঝে মাঝে সে প্রশ্ন করে, "বুঝলে তো?"

কাঞ্চনের চমক ভাঙে। বলে, "একটু একটু মাথায় যাচ্ছে।"

গৌরীবালা দু-একবার বেরিয়ে আসে, ঘাড় তুলে দোতলার বারান্দায় নজর বুলিয়ে নেয়, আড় চোখে বিশ্বনাথ-কাঞ্চনকে দেখে।

বিশ্বনাথ রোজই শেষ পর্যন্ত সমাধির কথা পাড়ে।

কাঞ্চন একদিন জিজ্ঞেস করে,

"বাবার সমাধিটা কি রকমের জিনিস?"

বিশ্বনাথ ব্যাখ্যায় লেগে যায়—

"ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়। সমাধিতে বসলে বাবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। এক নাগাড়ে অনেক দিন চলে এরকম।"

"বাবা ব'সে আছেন তাহলে?"

"না, না। ব'সে থাকবেন কেন। তাঁর দেহে প্রাণটা শুধু ধুক্‌ধুক্ করছে। প'ড়ে আছেন হাত-পা ছড়িয়ে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপড় দিয়ে ঢাকা।"

"আচ্ছা, সমাধিতে কিরকম লাগে?"

"এই তো। এত সহজে কি ওসবের রহস্য বোঝা যায়? ভয়ানক গুহ্য ব্যাপার। ভাল রকমের সাধনা চাই, তবে শোনবার অধিকার হয়।"

"আমিও শুনতে পাব না?"

কাঞ্চন অধৈর্য হয়ে ওঠে।

বিশ্বনাথ প্রবোধ দেয় তাকে—

"এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আস্তে আস্তে জানতে পারবে।"

কাঞ্চন বলে—

"আপনার কোনওদিন সমাধি হয়েছে?"

বিশ্বনাথ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শোনায়—

"নিশ্চয়। কতবার।"

গৌরীবালাকে একটানা জ্ঞান দিতে দিতে একদিন বদ্রিনাথ পড়লো সিদ্ধাই নিয়ে। বকতে লাগলো অনর্গল—

"সিদ্ধাই থাকলে গোটা দুনিয়া চ'লে আসে হাতের মুঠোয়। যখন যা চাইবে, পাবে। সবাই বশ হবে। যেখানে খুশী যাবে হাওয়ার মত। শুধু মনে করলেই হল। বড় বড় সাধু-ফকিররা সিদ্ধাই নিয়ে দিনকে রাত করতে পারেন।"

গৌরীবালার চোখ কপালে উঠলো। বদ্রিনাথ একটু থামতেই বললো,

"বাবার সিদ্ধাই তো দেখিনি কখনও।"

"হুঁ, হুঁ। সিদ্ধাই কি সস্তা! বাবা অমনি যাকে তাকে দেখাবেন! যা করবার, গোপনে করেন।"

"সত্যি ?"

"সত্যি নাতো, কি মিথ্যে ?"

"ওঃ! কি আশ্চর্য! আমি আসছি এতদিন ধ'রে। অথচ, কিছুই চোখে পড়েনি, বুঝতে পারিনি। কাঞ্চনটা বোধ হয়......"

বদ্রিনাথ আশ্বস্ত করলো তাকে—

"রাখো ওর কথা। তামা-তুলসী-গঙ্গাজল ছুঁয়ে আমি বলতে পারি, বাবা ওকে কিছুই দেখাননি।"

"আপনি দেখেছেন ?"

"দেখিনি আবার!"

"আপনার সিদ্ধাই আছে ?"

"ঘ্যাঁ, তা......"

"আছে ?"

—গৌরীবালার প্রশ্নে বেশ গাঢ়তা প্রকাশ পায়।

বদ্রিনাথ পাল্টা জিজ্ঞেস করে—

"কি মনে হয়?"

"আছে বৈকি।"

"ঠিক ধরেছো।"

"দেখান না একটু।"

"সিদ্ধাই কি খেলার জিনিস! দেখালেই হল?"

গৌরীবালা ছাড়ে না। আব্দার ধরে—

"এই সামান্য একটু দেখান।"

"আরে! এরকম অবুঝ হলে চলে? যখন তখন সিদ্ধাই দেখালে তপস্যার জোর ক'মে যায়।"

"তাতে আর কি। দু-একদিনের চেষ্টায় আবার জোর বাড়িয়ে নেবেন।"

"অত সহজ নাকি?

"তা হোক।"

"তিথি-নক্ষত্র চাই তো!"

গৌরীবালা ক্ষান্ত হয় শেষতক।

পঁচিশ

বিশ্বনাথকে শেষ পর্যন্ত সমাধির ব্যাখ্যা শোনাতে হল—"সমাধিতে ব'সে সূক্ষ্ম দেহে যেখানে খুশী যাও, কোনও অসুবিধে নেই।"

কাঞ্চন ছাড়লো না, জানতে চাইলো, সে কোথায় কোথায় গিয়েছে।

বিশ্বনাথ উত্তর করলো,

"কাশী, গয়া, কামাখ্যা-কামরূপ।"

"কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না?"

বিশ্বনাথ বললো,

"যার সমাধি হয়, তাকে সঙ্গী করা চলে।"

"আমাকে সমাধির নিয়মটা শিখিয়ে দিন।"

"ভয়ানক কঠিন জিনিস। ভুল পথে চললে পাগল হয়ে যায় লোকে।"

কাঞ্চন তবুও অনুনয় করলো—

"শেখান না, লক্ষ্মীটি।"

"সে কি সহজ কথা! মাসের পর মাস কি কষ্ট, কত হাঙ্গামা!"

—বিব্রত বিশ্বনাথ প্রসঙ্গ এড়াতে চাইছিল। শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেল তালিমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

সিদ্ধাই নিয়ে বদ্রিনাথের অবস্থা কাহিল হয়ে দাঁড়ালো। সিদ্ধাই থাকলে লোহাকে সোনা করা যায় শুনে অবধি রোজই গৌরীবালার বাঁধা অনুরোধ—

"পাঁজিটা দেখুন না আবার।"

রোজই বদ্রিনাথ শোনাতো—

"দেখা আছে গো, দেখা আছে। এসব ব্যাপারের দিন-ক্ষণ কি সহজে মেলে? কালে ভদ্রে ঠিকমত তিথি-নক্ষত্রের যোগাযোগ হয়।"

"ও" ব'লে গৌরীবালা থামতো। চুপ ক'রে থাকতো একটু। তারপরই জিজ্ঞেস করতো—

"আচ্ছা, তপস্যায়ও কি দিন-ক্ষণ লাগে?"

"না, ততটা নয়।"

"তবে তপস্যার কায়দা বলে দিন।"

"ছেলের হাতের মোয়া নাকি? অত তাড়াহুড়োর কাজ নয়।"

গৌরীবালা নিরস্ত হত।

এই রকমই চলছিল। হঠাৎ নতুন কাণ্ড ঘটলো একদিন।

সদরের কপাট হাওয়ায় খুলছিল, বন্ধ হচ্ছিল। রাত ভোর হয়ে এসেছিল। ঘুম ভেঙে গেল বিশ্বনাথের। নিজে হাতে খিল লাগিয়েছিল সে। কে খুললো? বাবা?

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বিশ্বনাথ উঠলো ওপরে।

ঘর খালি। বাবা জগদীশনাথ নেই।

বিশ্বনাথ ডাকলো বদ্রিনাথকে। দুজনে মিলে সারা বাড়ি খুঁজলো। বাক্স, সিন্দুক, আলমারি—সব ঠিক আছে। বাবা নেই, আর নেই তাঁর স্নান করবার গেরুয়া লুঙ্গি-গামছা।

খোঁজাখুঁজির পর অপেক্ষা।

বিশ্বনাথ-বদ্রিনাথ ওপর-নিচে করে, রাস্তায় বেরিয়ে দেখে, ব'সে থাকে। কাঞ্চন আসে, গৌরীবালা হাজির হয়। ফিরেও যায় তারা। বাবার কিন্তু পাত্তা মেলে না।

বিশ্বনাথ বললো বদ্রিনাথকে,

"শোন, ভাই। আমাকে দাদা ডাকো। আমিও তোমাকে খুব স্নেহের চোখে দেখি।"

বদ্রিনাথ সায় দিল,

"তাতো বটেই।"

"বাবা আর ফিরবেন না।"

"কি ক'রে বুঝলেন?"

"শুধু লুঙ্গি আর গামছা নিয়ে গেছেন।"

"কোথায় গেলেন, জানেন?"

"বোধ হয় কৈলাশে।"

"আজকের দিনটা দেখা যাক।"

"দেখে আর কি করবে?"

"যদি রাত্তির নাগাদ ফেরেন।"

"চুল নেই, ভুরু নেই। রাস্তা দিয়ে আসবেন কি ক'রে?"

"কেন গাড়িতে চ'ড়ে?"

"না হে। একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে দিয়েছিলাম হপ্তা-খানেক আগে। দেখলে না, তার থেকে কিছুই নেন নি।"

বদ্রিনাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলো। বিশ্বনাথ বসলো গিয়ে বাবার বিছানায়। বদ্রিনাথ জায়গা নিল তার সামনে।

"আমরাই তো বাবার ওয়ারিশ। সব দায়িত্ব আমাদের"—

বিশ্বনাথের কথায় মাথা দোলালো বদ্রিনাথ।

"বাবার যা আছে, দুজনের মধ্যে ভাগ হবে"—

বদ্রিনাথ আবার মাথা নাড়লো।

ভাগাভাগিতে কোনও মন-কষাকষি, কোনও গণ্ডোগোল হল না। আসবাব-পত্র সমেত বাবা জগদীশনাথের ডেরা পড়লো বিশ্বনাথের বখরায়। বদ্রিনাথ নিলো শুধু থোক টাকা।

ছাব্বিশ

কিশোর ঠাকুর কদিন খুব মনমরা রইলেন। কুন্তলার নজর এড়ালো না। শেষ পর্যন্ত সে অনুযোগ তুললো।

কিশোর ঠাকুর তাকে বললেন,

"মেনকা মা নানা ভাবে নানা কায়দায় শত্রুতার চেষ্টা করছে।"

কুন্তলা খোঁচা দিল—

"কেন, তিনজনে তো বেশ মিলমিশ হয়েছিল। আমার রীতিমত ভয় ধ'রে গিয়েছিল।"

"তুমিও যেমন। ওকে দেখলে বরাবর আমার থুথু ফেলতে ইচ্ছে করে। এতদিনের চেষ্টায় আমার মাথা মুড়োতে পারেনি। এবার তাই পেছনে লাগছে।"

"ঝাঁটা মারি তার মুখে।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর মাথা নাড়তে নাড়তে মন্তব্য করলেন,

"তা যদি পারতে, বেঁচে যেতাম। কিন্তু, ওর মত বাঘা মেয়েছেলেকে কায়দা করতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। তোমাকে দিয়ে অতখানি সম্ভব নয়।"

কুন্তলা তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিল—

"কি করতে হবে, শুনি না। নিশ্চয় পারবো।"

প্রভু কিশোর ঠাকুর কুন্তলাকে তখনকার মত নিরস্ত করলেন। কথা রইল, ভেবে চিন্তে তিনি ঠিক করবেন রাস্তা।

রাস্তা ঠিকই ছিল। প্রভু তবু সময় নিলেন। এতে কুন্তলার মন তৈরী হবে।

হলও তাই। দুপুরের খাওয়া মিটতে না-মিটতে সে এসে তাড়া দিল।

প্রভু কায়দা-কানুন বাৎলালেন খুঁটিনাটি সমেত। মেনকা মার প্রধান চেলা বীরু নিচতলা আগলায়। মেয়ে দেখলেই সে কি রকম

করতে থাকে। একটু রাত হলে কুন্তলা আশ্রমে যাবে, মেনকা মার ঘর পর্যন্ত উঠবে, কিছু প্রণামী দিয়ে নেমে আসবে, নিচে থাকবে অনেকক্ষণ, বারবার বীরুর সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা চালাবে।

কুন্তলা শুধোলো,

"তারপর ?"

"তারপর একদিনে হোক, ছু-দিনে হোক, সে ধরা দেবে, বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চাইবে।"

"তার সঙ্গে বাড়িতে গেলে মা রাগ করবেন। মা এখানকার সবাইকে চেনেন। নতুন লোক দেখলেই পাঁচ-কথা জিজ্ঞেস করবেন। আমি মেনকা মার আশ্রমে যাচ্ছি শুনলে হয়তো একা বেরুনো বন্ধ ক'রে দেবেন।"

"হায়রে! সহজ জিনিসে গোলমাল পাকানো তোমার বড় বদ অভ্যেস। খানিকটা এগিয়ে বীরুকে ফিরে যেতে বলবে। সেই সময়টুকুর মধ্যেই হবে আসল কাজ। কদিন আর লাগবে।"

"কি রকম ?"

"প্রথম প্রথম শুধু বীরুর গুণ গাইবে। যদি বোঝো সে অনুগত হয়ে উঠেছে, তখন নিন্দে করবে মেনকা মার।"

"খুব গালাগাল দোবো ?"

"উঁহু। কথার পৃষ্ঠে কথা। যেমন, মেনকা মাকে দেখলেই বোঝা যায়, ভয়ানক চালাক, ভীষণ প্রকৃতি। নিশ্চয়ই কোনও দয়া-মায়ার ধার ধারে না। এর থেকে বীরু নিজে একটা আশ্রম খুললে ভাল হয়। এই রকম আর কি। বীরুর জবাবটা খুঁটিয়ে খেয়াল রাখবে। শুনে আমি পরে যা করবার শিখিয়ে দোবো।"

প্রভুর এত বড় কাজের দায়িত্ব পেয়ে কুন্তলা বেজায় খুশী হল। মনে মনে ভাল রকম মক্স ক'রে সে হাজির হল মেনকা মার আশ্রমে। বীরু তার ওপর চোখ রাখলো গোড়া থেকে। আশ্রমে তরুণীর আনাগোনা বিরল। নাম লেখানোর সময় বীরু দেখে নিজ

ভাল ক'রে। কুন্তলা ওপর ঘুরে নেমে আসতে তার দিকে চাইলো। তখন থেকে বীরুর নজর তাকে অনুসরণ করে চললো। চোখোচোখির সঙ্গে কুন্তলাও মুখে মৃদু হাসি ফোটাতে লাগলো।

এইভাবে রাত এগোয়। লোকের আনাগোনা বন্ধ হয়। নিচতলা একেবারে খালি। কুন্তলা এক-পায়ে, দু-পায়ে সদর পর্যন্ত গেল। বাগানে নামবার আগেই কানে এল ডাক। পেছন ফিরে দাঁড়ালো—

"শুনছেন ?"

"য়্যাঁ ?"

"একা ফিরতে পারবেন ?"

"কি আর করবো। বাড়ি থেকে চাকর আসবার কথা ছিল। এখনও তার দেখা নেই।"

"একটু দাঁড়ান, আমি যাচ্ছি।"

বীরু এসে কুন্তলার সঙ্গ ধরলো বাগানে। বাগানের পর রাস্তা।

কুন্তলা ফিসফিসিয়ে আলাপ চালায়। বীরু তার গা ঘেঁষে পা ফেলে।

"আপনাকে দেখেই কিরকম ভক্তি আসে।"

"ও"

"আপনার পায়ের কাছে ব'সে দুটো ধর্মের কথা শুনলে ধন্য হতাম।"

"বেশতো। আপনাদের বাড়িতে গিয়ে শোনাবো।"

"না, না। মা এসব দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। আমিই আসবো আবার।"

এর বেশি কথা হল না সেদিন। কুন্তলা বীরুকে ফিরিয়ে দিল। বললো,

"বাড়ির কাছাকাছি যাওয়ার দরকার নেই। পাড়ার কেউ

মার কানে তুললে চটবেন। চাকরকে মানা করা আছে, সে আশ্রমের নাম মুখে আনবে না।”

প্রথম কিস্তির খবরাখবর শুনে প্রভু কিশোর ঠাকুর কুন্তলার তারিফ করলেন। প্রভুর আদর শেষ হতে সে জানতে চাইলো কতদূর পর্যন্ত চালাতে হবে। অনেকক্ষণ ধ'রে প্রভু তাকে শেখালেন পড়ালেন।

ঘটনার টানে কুন্তলার বুদ্ধি খুলতে লাগলো, কাজও সহজ হয়ে এল। কিন্তু কয়েকবার কুন্তলাকে এগিয়ে দেওয়ার পর বীরু ধরা প'ড়ে গেল। মেনকা মা তাকে ডেকে পাননি। পরেশের মুখে শুনলেন, সে একটি মেয়েকে নিয়ে কদিন ধ'রে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফিরতেই মেনকা মার তলব। তারপর সওয়াল-জবাব—

“কোথায় যাওয়া হচ্ছে রোজ? কার সঙ্গে?”

“না, দূরে কোথাও না। নতুন ভক্ত। এত রাতে একা যাবে। তাই এগিয়ে দি-ই।”

“তাই নাকি? কিন্তু, আজ তো আমার ঘরে কোনও মেয়ে আসেনি।”

পরেশ ফোড়ন কাটলো—

“সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিল। খানিক দাঁড়িয়ে থেকে নেমে যায়।”

মেনকা মা সাফ হুকুম দিলেন, বীরু আর মেয়েটার সঙ্গ নিতে পারবে না।

পরদিন বীরুর কাছে সংক্ষেপে ঘটনা শুনে কুন্তলা একাই ফিরলো।

খবর নিয়ে মেনকা মা কড়া পরোয়ানা জারি করলেন, মেয়েটা যেন আর আশ্রমে না-ঢোকে। এলে বারণ ক'রে দিতে হবে।

বীরুর মাথা খারাপ হবার যোগাড়। জীবনে সবেমাত্র সে নতুন

আস্বাদ পেতে আরম্ভ করেছিল। মেনকা মা তাতে বাদ সাধলেন। অথচ নিজে যা খুশী চালিয়ে যাচ্ছেন।

সন্ধ্যে বেলায় পুরোনো এক ভক্তকে নাম-লেখানোর টেবিলে বসিয়ে বীরু বেরিয়ে পড়লো আশ্রম থেকে। রাস্তায় এগিয়ে মেয়েটাকে ধরতে হবে, সব বলতে হবে। তার সঙ্গে এর পর আর দেখা হবে না ভাবতেই বীরুর মনটা খাঁ খাঁ ক'রে উঠছিল। কুন্তলা তাকে দেখতে পেল দূর থেকে। বুঝলো একটা কিছু ঘটেছে। তার সঙ্গে উল্টো-মুখো হাঁটতে হাঁটতে ভাল ক'রে সব জেনে নিল। তারপর প্রভুর পরামর্শ মত মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লো—

"আপনার ঐ মেনকা মা তো আর জন্ম থেকে সন্ন্যাসিনী নন। ওঁর আগেকার কীর্তি-কলাপ জানলে দিতাম থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে।"

বীরু আগ্রহে প্রশ্ন করলো,

"কি রকম?"

"সিধে চড়াও হয়ে ভয় দেখাতাম, আমাদের পেছনে লাগলে, আমরাও ফাঁস ক'রে দোবো সব।"

"কিন্তু, ভয়ানক চালাক আর সেই রকম দাপট। আপনার কথায় চ'টে আমাকে হয়তো ঘাড় ধ'রে তাড়াবে।"

"তাড়াবে তো তাড়াবে। মার আমি একমাত্র মেয়ে। বাবা যথেষ্ট রেখে গিয়েছেন। তাঁকে বুঝিয়ে……"

কুন্তলা কথাটা শেষ করলো না।

যা শুনলো, বীরুর কাছে তা-ই যথেষ্ট। তবু সে ভীতু মানুষ। থাকা-খাওয়া নিয়ে ছোট বেলা থেকে চরম কষ্ট পেয়েছে। পুরোপুরি নিশ্চিন্তে আছে মাত্র বছর বার-চোদ্দ। তাই চুপ ক'রে গেল।

পরদিন আবার সেইখানে দেখা।

কুন্তলা জিজ্ঞেস করলো,

"ঠাণ্ডা হয়েছে?"

বীরু শুকনো উত্তর দিল,

"ঠাণ্ডা হবার লোক নয়। আজও একবার হুঁশিয়ার করেছে।"

কুন্তলা জুড়ে দিল—

"তাতো করবেই। আপনি যে রকম ভয়-তরাসে।"

কোনও মেয়ের কাছে নিভৃতে ভীরুতার অপবাদ শুনলে সেরা কাপুরুষ পর্যন্ত ক্ষণিকের মত সাহসী হয়ে যায়। বীরু তার ওপর আগের দিন থেকে ভাবছে। তাই ঘাড় সিধে ক'রে কুন্তলাকে বললো,

"ভীতু নই। ইচ্ছে করলেই মজা দেখাতে পারি।"

"কিচ্ছু পারেন না। শুধু আমার কাছে বড়াই করছেন।"

"বড়াই টড়াই নয়। শুনুন, তাহলে। ওর আসল নাম ধীরা মুখার্জী। বি-এ পাশ। আমার জানা তিনজনকে একেবারে পথে বসিয়ে সন্ন্যাসী সেজেছে।"

বীরু ধীরা মুখার্জীর পুরো কাহিনী আওড়ালো। আলাপ জ'মে উঠলো। শেষে কুন্তলা আশ্বাস দিল বীরুকে,

"যে কজনের পারেন, নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে আসবেন কালকে।"

"সবার তো হবে না। রায়বাহাদুরের শুধু নামটাই জানি।"

"আচ্ছা। রায়বাহাদুর যখন, খোঁজ করাতে পারবো।"

"কিন্তু ওর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পাল্লা দেওয়া শক্ত।'

"ঐ আশ্রমে আপনাকে বসিয়ে ছাড়বো। আমাকে কম ভাববেন না।"

বীরু পরদিন নাম-ঠিকানা এনে দিল সব। রাস্তায় ছাড়াছাড়ির সময় অনুনয় করলো,

"হুট করে গোলমাল বাধাবেন না। আপনার কোনও ক্ষতি ক'রে বসবে হয়তো।"

সাতাশ

কুন্তলার হাতে নাম-ঠিকানাগুলো পেয়ে প্রভু কিশোর ঠাকুর আনন্দে পঞ্চমুখ হলেন। আবেগের চোটে প্রতিশ্রুতিও দিলেন, সারা জীবন তিনি কুন্তলার গোলাম হয়ে থাকবেন।

কুন্তলা হেসে মন্তব্য করলো,

"নতুন গোলাম বেচারার কি হবে ?"

"তার সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎ নয়।"

"ভুল নাম-ঠিকানা লিখিয়েছিলাম আশ্রমে। রাস্তায় ঘুরে মরবে। বাড়ি খুঁজে পাবে না। বড্ড আঘাত লাগবে লোকটার।"

"তার জন্যে এত দরদ!"

"না, না। তা কেন হবে।"

"বেশ। তার কথা তবে একেবারে ভুলে যাও।"

দু'দিন পরে যমুনাধামে নোটিশ ঝুললো, প্রভু কিশোর ঠাকুর মথুরায় গিয়েছেন। শেষরাতে গোটা দুই সুটকেশ নিয়ে তিনি চাপলেন ট্যাক্সিতে। অনেক ঘুরে ট্যাক্সি দাঁড়ালো গিয়ে এক হোটেলের সামনে।

প্রভুর হোটেল-বাস আরম্ভ হল। হোটেলে তিনি দস্তুরমত সাহেব। ব্রেকফাষ্টের পর বেরিয়ে যান। লাঞ্চের সময় ফিরে বিকেল পর্যন্ত থাকেন। তারপর আবার একদফা বাইরে। ডিনারের মেয়াদ-বরাবর উপস্থিত হন। দিনে-রাতে খাওয়া সারেন ঘরে।

সবার আগে খোঁজ হল রাখাল মুখুজ্জের। ডাকাডাকিতে বেরিয়ে এল নীরেন। সাহেব-বেশী প্রভুকে দেখে সে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে রইলো। প্রভু তার ভয় ভেঙে দিলেন। বাবার খুব অসুখ, অনেক দিন ভুগছেন, উঠতে পারেন না শুনে প্রভু চ'লে গেলেন। পরের

বার এলেন এক বাক্স আঙুর আর এক টিন বিস্কুট নিয়ে। বললেন, "এটা বাবাকে দিয়ে এস।"

সূত্রপাতটা কাজে লাগলো ভাল রকম। প্রভু জানতে পারলেন অনেক খবর। নীরেনকে রেষ্টুরেণ্টে খাইয়ে, রাস্তায় ঘুরিয়ে হদিশ বেরুলো রায়বাহাদুরের। নীরেন তাঁর বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

রায়বাহাদুরের নাগাল পেতে সময় লাগলো। বাড়িতে একটি মাত্র বৃদ্ধ চাকর। দরজায় একজন দারোয়ান। তারা গোড়ায় প্রভুকে ফিরিয়ে দিল—সাহেবের তবিয়ৎ একদম খারাপ, তিনি কারুর সঙ্গে ভেট করেন না। কিন্তু তাঁর কাছে হাজির না-হলে চলবে না। কদিন ঘুরে চাকর-দারোয়ানের মন ভিজিয়ে প্রভু ওপরে ওঠার সুযোগ পেলেন। রায়বাহাদুর নিচে নামেন না।

একমাথা পাকা চুল, একমুখ পাকা দাড়ি নিয়ে রায়বাহাদুর শুয়ে ছিলেন। প্রভু আসতে উঠে বসলেন। অস্থির চাউনি। ডান হাত দিয়ে দাড়ি চুলকোতে লাগলেন অনবরত।

"এই এসেছিলাম আপনার কাছে—"

প্রভুর কথায় দু-হাত নেড়ে রায়বাহাদুর বললেন—

"দেখতে পাচ্ছি সেটা। চশমা লাগে না এখনও। কানও ঠিক আছে।·······নিজে থেকে আসা হয়েছে, না, কেউ পাঠিয়েছে?"

"নিজে থেকেই। একটু দরকারে।"

"দরকার? আমার কাছে দরকার কুলোনোর দিন ফুরিয়ে গিয়েছে।"

"সামান্য প্রয়োজন আমার।"

"ওরকম কাঁদুনি শোনবার ইচ্ছে নেই। সাহায্য, খয়রাত, চাঁদা মিলবে না। এসব বাদে আর কি থাকতে পারে?"

"ধীরা মুখার্জি·······"

প্রভু কথা শেষ করতে পারলেন না। বিছানার ওপর ঝাঁকিয়ে উঠলেন রায়বাহাদুর। তারপর তুমুল চেঁচানি—

"সেই শয়তানী! আগে আমায় বশ করেছে! শেষে আমার ছেলেকে! কুলাঙ্গারটা ওর সঙ্গে ভিড়ে আমাকে পথে বসাতে চেয়েছিল। কোর্টে দাঁড়িয়ে তার উকিল বলে কিনা আমি পাগল! আমার আজ এই অবস্থা ধীরা মুখার্জির জন্যে। হাতের কাছে পেলে তাকে দেখে নিতাম!"

"ধীরা মুখার্জি আমারও অনেক ক্ষতি করেছে। তার পেছনে অন্য লোক আছে, জানতাম। এখন বুঝতে পারছি, সে আপনারই গুণধর ছেলে।"

"মা মরা। অনেক কষ্টে মানুষ করেছি। এইরকম দাগা দেবে, স্বপ্নেও ভাবিনি।"

রায়বাহাদুরের গলাটা ভারী হয়ে এল, চোখ দুটো চকচক করছিল।

প্রভু তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন,

"এ দুনিয়ায় সবই সম্ভব। তবে, আমি যখন আপনার খোঁজ পেয়েছি, নিশ্চিন্ত থাকুন। ছেলে আর ধীরা, দুজনের কপালেই এবার চরম শিক্ষা—এখন হোক বা পরে হোক।"

"পারবেন? পারবেন আপনি ওদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে?"

খাট থেকে নেমে রায়বাহাদুর এসে দাঁড়ালেন প্রভুর সামনে।

প্রভু তাঁর ডান হাতখানা টেনে নিলেন দুহাতে। তারপর বললেন,

"অত উতলা হবেন না। আমি কাল আবার আসবো। সব শুনবো। ভেবে চিন্তে রাস্তা ঠিক করবো। ওদের দিন ঘনিয়ে এসেছে।"

কদিনের চেষ্টায়ও রায়বাহাদুরের মুখে একটানা ইতিবৃত্ত পাওয়া গেল না। ধীরার কাহিনী শোনাতে শোনাতে তিনি ভয়ানক

রকম উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, অসংলগ্ন যত কিছু টেনে আনতেন। প্রভু শুধু মোটমাট একটা ধারণা ক'রে নিতে পারলেন।

সকালে রায়বাহাদুরের বাড়ি যাওয়া ছাড়াও প্রভু দুপুরে, বিকেলে দেবনারায়ণ, পূর্ণবিকাশের খোঁজ চালাচ্ছিলেন।

দেবনারায়ণদের দোকানে একটানা কদিন ঘুরে লাভ হল না। নতুন মালিক শেষ পর্যন্ত তাঁকে অভদ্রভাবে ভাগিয়ে দিল।

প্রভু হাল ছাড়লেন না। দোকানের সামনে দিয়ে যাতায়াত আরম্ভ করলেন। যদি তাতে কোনও সন্ধান মেলে।

তাঁর আন্দাজ ঠিক হল। দোকানের একটি অতিবৃদ্ধ কর্মচারী একদিন রাস্তায় বেরিয়ে তাঁকে ইসারায় ডাকলো। প্রভু কাছে যেতে সে এক টুকরো কাগজ তাঁর হাতে দিয়ে বললো, "ছোট বাবুর ঠিকানা।" জবাবের অপেক্ষা না-ক'রেই লোকটি গিয়ে ঢুকলো দোকানে।

ঠিকানাটা বস্তির। অনেক ঘুরে, জিজ্ঞেস করতে করতে প্রভু খুঁজে পেলেন। খোলার বাড়ি। ঘরে তালা ঝুলছে। ডাকাডাকি শুনে সামনের ঘর থেকে একটি মেয়েছেলে খবর দিল, মা কাজে গিয়েছে, ছেলেও নেই। দুপুরে এলে দুজনের দেখা মিলবে।

দুপুরে গিয়ে প্রভু দেবনারায়ণকে পেলেন না, তার মা ভাত চাপিয়েছিলেন। মাথায় ঘোমটা টেনে বেরুলেন।

নমস্কার ক'রে প্রভু তাঁর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন।

মহিলাটি কাঁদলেন অনেক। রাজার হাতে পড়েছিলেন। এখন পরের বাড়ি ঝি-গিরি করছেন। ছেলে বাউণ্ডুলে। মার-প্যাঁচ বোঝে না। পাঁচজনে ওকে ঠকিয়েছে। প্রভু ধীরা মুখার্জির নাম করলেন। দেবনারায়ণের মা তাকে চিনতে পারলেন না।

প্রভু খাওয়া সেরে এসেছিলেন। তাই দেবনারায়ণের জন্যে

অপেক্ষা করতে চাইলেন। দেবুর মা দামী কার্পেটের আসন পেতে দিলেন ঘরে।

ব'সে ব'সে প্রভু দেখতে লাগলেন। দেওয়ালে ঝুলছে প্রবীণ এক ভদ্রলোকের ফটো। তার পাশে আর একখানা ফটো—মোটাসোটা এক কিশোর, বোকার মত মুখ-চোখ, বসার ঢঙ। ফটো দুখানা বেশ পুরোনো।

দুটো বড় ট্রাঙ্ক রয়েছে ঘরে, একটা কাঠের সিন্দুক। এক কোণে মাদুর দিয়ে মোড়া বিছানা। মাটির কলসী, এলুমিনিয়ামের গেলাস, কলাই-করা থালা—তৈজসে অতীত সমৃদ্ধির কোনও নিদর্শন নেই।

দেবনারায়ণ এল সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। মা অনুযোগ করলেন, "রোজ পিত্তি পড়িয়ে খাবি। যা, একটি বাবু ব'সে আছেন তোর জন্যে।"

"বাবু? দেখি, কে আবার" ব'লে দেবনারায়ণ ঘরে ঢুকলো।

অচেনা লোকের সাম্নে কোনওকালেই দেবনারায়ণ মুখ খুলতে পারে না। সে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো প্রভুর দিকে।

তার অবস্থা বুঝে প্রভুই শুরু করলেন,

"বিশেষ কাজে আপনার কাছে এসেছিলাম। তাতে আমার মত আপনারও লাভ আছে।"

মাটিতে উবু হয়ে ব'সে দেবনারায়ণ জিজ্ঞেস করলো,

"আমার ......আমার কাছে কাজ? কি কাজ? ম্যানেজার পাঠিয়েছে?"

"কেউ পাঠায়নি। নিজের গরজে এসেছি। ধীরা মুখার্জিকে চেনেন?"

প্রভুর প্রশ্ন এড়িয়ে দেবনারায়ণ বললো,

"চলুন, বাইরে গিয়ে আলাপ করি।"

বস্তি ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে তবে দেবনারায়ণ তার কথা আরম্ভ করলো।

ধীরা মুখার্জিকে সে ভাল রকম জানে। ভয়ানক মেয়ে। মানুষকে ঠকানোই তার পেশা। দেবনারায়ণ এর বেশি ভাঙলো না। বাকী যা শোনালো, সব তার নিজের কাহিনী। কাগজে সই নিয়ে ম্যানেজার খরচার টাকা দিত। তার থেকে বাড়ি-ঘর, বাইরের সম্পত্তি, দোকান—সব নিয়েছে জাল পাওনাদার দাঁড় করিয়ে।

সহানুভূতি দেখিয়ে প্রভু দেবনারায়ণকে রাত্তিরে খাওয়াব নেমন্তন্ন করলেন। ঠিকানা দিলেন হোটেলের।

সন্ধ্যের পর দেবনারায়ণ হেটেলে হাজির হল।

নিজের ঘরে দুজনের খাবার আনিয়ে প্রভু আবার ধীরার কথা পাড়লেন। দেবনারায়ণ গোড়ায় কিছুই ফাঁস করবে না। প্রভু অনেক বোঝালেন, অভয় দিলেন। নিজের নজির দেখালেন। ধীরা তাঁকেও রাস্তায় বসাতে চেষ্টা করেছে। যতটা সম্ভব খবরাখবর যোগাড় ক'রে মেয়েটাকে তিনি দেখে নিতে চান।

শেষ পর্যন্ত দেবনারায়ণেয় ভয় ভাঙলো। প্রভু তার কাছ থেকে জানতে পারলেন সব। ধীরা দফায় দফায় টাকা নিয়েছে, হীরের নেকলেস নিয়েছে, মাসোহারা নিয়েছে। তার বাবার অসুখ শুনে ধীরা গায়ে প'ড়ে ঘুমের ওষুধ আনিয়ে দিয়েছিল। মা-র অজান্তে, দেবনারায়ণ বাবাকে সে ওষুধ খাওয়ায়। চব্বিশ ঘণ্টা না-কাটতে বাবার মৃত্যু। তারপর বিপদে প'ড়ে সে সামান্য সাহায্য চাইতে গেছিল। ধীরা তাকে শেয়াল-কুকুরের মত বিদেয় করে।

দেবনারায়ণের পর পূর্ণবিকাশ। তাকে ধরতে হল গিয়ে ভোর বেলায়। সে এক ডাক্তারখানায় চাকরি করছে। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত ডিউটি। দুপুরে সস্তার হোটেলে খায়।

স্যুট-পরা প্রভুকে দেখে সে একদম তটস্থ। ধীরার নাম শুনেই সে কবুল করলো,

"কোনও অন্যায় করিনি আমি। মিথ্যে মিথ্যে আমাকে জড়াবে না। আমি সরল বিশ্বাসে কাজ করেছি।"

প্রভু বুঝলেন না তার এত আতঙ্ক কেন। কিন্তু তবু বললেন,

"সবই জানি আমি। আপনি নির্দোষ। কিন্তু, ঘটনাটা শুনতে চাই আপনার মুখে। মেলাতে হবে। আরও খোঁজ-খবর করবো। তারপর দেখে নেবো, ধীরা মুখুজ্জে কত ধুরন্ধর।"

পূর্ণবিকাশ এরপর সমস্ত ঘটনা শোনালো। শোনবার পর প্রভু শুধোলেন,

"প্রেসক্রিপসনটা কোথায় ?"

"ওর কাছে।"

"ওর বাবা তো এখন শয্যাশায়ী। দশ বছর আগেও তার বয়েস কম ছিল না। তার জন্যে ঘুমের ওষুধ আনার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনি নিরীহ মানুষ। এতটা তলিয়ে দেখেননি, বোধ হয়।"

বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে পূর্ণবিকাশ বললো,

"যাক, বাঁচালেন আপনি। কি ভয়ে ছিলাম এতদিন। সত্যিই তো। ওর বাবা-মা-ভাই-বোনের জন্যে কতবার কত ওষুধ এনে দিয়েছি। কিন্তু, ওর কথায় মনে হয়েছিল, দেবনারায়ণের বাবাকে আমিই মেরেছি।"

"তিনি যে ঘুমের ওষুধ খেয়ে মারা যান, তা প্রমাণ করবে কে ? মড়া পোড়ানোর আগে ডাক্তারের সার্টিফিকেট লাগে।"

"তা বটে! যাক, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বুকের বোঝা নামলো। এতদিন যখন তখন মনে হয়েছে, খুনের দায়ে পুলিশ এসে ধ'রে নিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত ফাঁসি, নইলে দ্বীপান্তর। কিছু না-হলেও খালাস পেয়ে কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।"

"কৃতজ্ঞ টৃতজ্ঞ নয়। ধীরার আরও খবর জোগাড় করতে হবে।

...উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। পারলে ওকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে।"

পূর্ণবিকাশ একটু হেঁসে মন্তব্য করলো,

"ধীরাকে ধরাবেন কোত্থেকে। আজ ক-বছর একদম উধাও।"

"তা হলেও নিস্তার পাবে না। আপনার সাধ্যমত সাহায্য করুন। দেখবেন, আমিই ওর মুখোস খুলে দোবো, বিষদাঁত ভেঙে দোবো চিরকালের মত।"

পূর্ণবিকাশ মনে জোর পেল। আগন্তুকের ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশ্বাসও আসছিল খানিকটা। ধীরাকে শিক্ষা দিতে পারলে সে খুশীই হত। তার জীবনটা একদম ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে। একটু ভেবে সে বললো,

"আমার যা জানা ছিল, শুনেছেন। আরও অনেক কিছু খবর পেতে পারেন ওর ছোট ভাইটার কাছ থেকে।"

প্রভু বাধা দিলেন—

"তাকে দিয়ে কাজ হবে না। দেখেছি তাকে। একদম হ্যালা-খ্যাপা।"

"বাড়িতে দেখেছেন তো ?"

"হুঁ।"

"সে হল নীরেন। রমেন তার ওপরে। ছেলেটা পড়াশুনোয় ভাল ছিল। ধীরা তাকে কলেজে ভর্তি হতে দেয়নি। সে তাই অভিমানে বিষ খায়। হাসপাতালে আমার কাছে অনেক দুঃখু করতো, কাঁদতো।"

"সে থাকে কোথায় ?"

"খবর রাখি না। তবে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে কাজ হতে পারে।"

প্রভু দেরী করতে চান না। বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা হল সঙ্গে সঙ্গে।

রমেন অনেক ঘুরে একটা ছাপাখানায় কাজ পেয়েছিল। ছোট প্রেস। নামে সে মালিকের বেয়ারা। কাজের বেলায় তাকে জল দেওয়া, চা-পান-বিড়ি-বিস্কুট আনা থেকে খাতা লেখা পর্যন্ত সব কাজ করতে হত। মাইনে মাসে আঠার টাকা।

রমেন প্রেসেই থাকতো। আশা ছিল, ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনো করবে, পয়সা জমাবে। তারপর কাজ ছেড়ে কলেজে ভর্তি হবে। কিন্তু, চাকরি সকাল থেকে রাত দশটা-এগারটা অবধি। খেত সস্তার হোটেলে। কুকার কিনেছিল একটা নিজে দু-বেলা ডাল-ভাত সেদ্ধ ক'রে নেবে ব'লে। তা আর সম্ভব হয়নি। মাসে দুটো টাকাও তার সঞ্চয় নয়। রাতে রোজ হিসেব কষে মনে মনে, আই-এ পড়ার খরচ পুরো হাতে আসতে আরও কতদিন লাগবে।

প্রেসে খবরের কাগজ আসতো। রাত্তিরে সেখানা যেত রমেনের জিম্মায়। কাগজের পাতায় সে খুঁটিয়ে পড়তো কর্মখালির যত বিজ্ঞাপন। কিন্তু, জুৎসই কোনও চাকরির সন্ধান পেত না।

এমনি ভাবে কাগজের পাতায় চোখ বোলাতে বোলাতে প্রভু কিশোর ঠাকুরের বিজ্ঞপ্তি নজরে এল। কার এত দায় যে, পয়সা খরচ ক'রে তার জন্যে বিজ্ঞাপন ছাপাবে! নিচে শুধু ঠিকানা। লোকটা কে, জানবার উপায় ছিল না।

প্রেসে শনি-রবিবারও কাজ চলতো। রমেন তাই পরদিন দুপুরে খেতে যাবার ছুটিতে ঠিকানা খুঁজতে বেরুলো। দেরিও হল না। হোটেলটা নামকরা। লোকে দেখিয়ে দিল।

প্রথম সাক্ষাতেই প্রভু তার মন ভেজালেন—

"ছেলে-মানুষ। দিদির জুলুমে পড়াশুনো করতে পারনি। আমি তোমাকে কলেজে ভর্তি করতে চাই।"

অযাচিত দাক্ষিণ্য মেনে নিতে না-পারলেও রমেনের জীবনে এরকম সহানুভূতি দেখাবার মত লোক এই প্রথম। অপরিচিত একজন তার এত খোঁজ রাখে, তার জন্যে এতটা ভাবে! পরের

পড়ায় তার চরম ঘেন্না ধ'রে গিয়েছে। সে কারুর কৃপাপ্রার্থী হবে না। শুধু চায় স্বাবলম্বনের সুযোগ। প্রভুকে বললো,

"সকালে রাত্তিরে টুইশনি বা অন্য কোনও কাজ ঠিক ক'রে দিলে আমি নিজেই পড়তে পারবো।'

প্রভু সায় দিলেন,

"বেশ, তাই হবে। তুমি ভাল ছেলে। যা সময় পাবে, তাতেই পড়া চালাতে পারবে।"

নিজের প্রশংসায় রমেনের অজ্ঞাত অনুভূতিতে সাড়া জাগলো, ক'মিনিটের পরিচয়ে সে প্রভুর অনুরক্ত হয়ে পড়লো।

কিন্তু বসা হল না। খাওয়ার সময় নেই। তখুনি প্রেসে না-ছুটলে ম্যানেজার খ্যাচ খ্যাচ করবে।

প্রভু রমেনকে আটকালেন না। হাতে কাগজে মোড়া বড় একখানা কেক দিয়ে বললেন, "দাদার উপহার। কাল ঠিক এই সময় এসো। দুজনে খাব একসঙ্গে।"

প্রভু এই ভাবে আস্তে আস্তে রমেনের পেট থেকে যতটা পারেন খবর আদায় ক'রে নিলেন। ধীরা মুখার্জি ওরফে মেনকা মার জোড়া কিস্তি জীবন-যাত্রার পুরোপুরি একটা ধারণা হয়ে গেল।

এর মধ্যে প্রভু হরেন্দ্রলালের সঙ্গেও দেখা করলেন। সে আমলই দেয়নি গোড়ায়। বারকত হাঁটাহাঁটির পর দু-চার কথা বললো। সুখের সংসার ছিল তাদের। বাপের মত বাপ। মাটির মানুষ। ধীরা তাদের ঘর জ্বালিয়েছে। বাবার প্রায় মাথা খারাপ। হরেন্দ্রলালের নামে যতগুলো মামলা রুজু করেছিলেন, তার একটাও টেকেনি। হয়তো নতুন কিছু ক'রে বসবেন। অফিসে তাঁর ঘর প'ড়ে রয়েছে। কয়েকজন পুরোনো কর্মচারী তাঁর কাছে গেছিল। তিনি ব'লে দিয়েছেন, হরেন্দ্রলাল মরলে তবে তিনি অফিসে ঢুকবেন।

মেনকা মার এত কাহিনী জানতে পেরে প্রভু মহাখুশী। এইবার সাপের বিষ খতম করা যাবে।

হোটেল-বাস ছেড়ে প্রভু আবার যমুনা-ধামে উপস্থিত হলেন। যাবার সময় দেবনারায়ণ, পূর্ণবিকাশ আর রমেনকে সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন, বিশেষ কাজে বাইরে ছুটতে হচ্ছে, ফিরেই খবর করবেন সবাইকে।

আটাশ

শীতের রাত। আশ্রমে ভীড় নেই। বীরু ব'সে ব'সে মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছিল। অমন মেয়েটা যেন উবে গেল। কে জানে, কি হয়েছে। জাল ঠিকানা লিখিয়েছিল গোড়াতেই। মাকে লুকিয়ে এসেছিল। ভয়ে ভয়ে চলতো রাস্তা দিয়ে। তাই আসল পরিচয় জানায়নি। কিন্তু ওকে অত খবর না-দিলে চলতো। ওরই বা দোষ কি। মেনকা মা পেছনে না-লাগলে ও নিশ্চয়ই বাড়ি দেখাতো। মেয়েটা সব সময় মা'র ভয়ে কাঁটা।

বীরুর চিন্তায় বাধা পড়ে। ঘোমটা টানা এক ভদ্রমহিলা ঢোকেন। বীরু দেখেই চিনতে পারে। সেই বৌটি। অনেকদিন পরে এল। বীরুর খেয়াল ছিল। একদিন সকালে এসে দুপুর নাগাদ গেছিল কি রকম হাঁপাতে হাঁপাতে, ছুটতে ছুটতে। মেনকা মা সেদিন পাগড়িওয়ালা হোঁৎকা লোকটাকে ছাড়া আর কাউকে দোতলায় উঠতে দেয়নি। ঠিক। রায় বাড়ির ছোট বৌ। তারপর আর আসেনি।

বীরু ন'ড়ে চ'ড়ে বসলো। রায় বাড়ির ছোট বৌ আগেকার মতই টুকরো কাগজ দিলেন। সেটা ওপরে পাঠিয়ে বীরু ঘোমটার ভেতর নজর চালাতে লাগলো।

মেনকা মা তখনই ডেকে পাঠালেন বৌটিকে। দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

মেনকা মা বেশি রকম অবাক হয়েছিলেন। প্রশ্ন করলেন,—

"কি মনে ক'রে? ফটোগুলো চাই? টাকা এনেছেন?"

ঘোমটা সরিয়ে দরজা এঁটে প্রভু বসলেন চেয়ারে।

"তাড়াতাড়ি করুন। খিদে লেগেছে।"

প্রভু বললেন,

"দাঁড়ান। অনেক কথা। সব শুনতে, সব শোনাতে বেশ সময় লাগবে।"

"তাই নাকি ? অত কথার ধার ধারি না।"

"ধার ধারতেই হবে মিস ধীরা মুখার্জি।"

মেনকা মার মুখ একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। কিন্তু সেটা চকিতের জন্যে। নিজের বেকায়দা ঝেড়ে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে। কোনও আগ্রহ দেখালে মনের ভার ধরা পড়তে পারে। তাই আলতো জিজ্ঞেস করলেন,

"ধীরা মুখার্জিকে চেনেন তাহলে ?

"না-চিনে র'ক্ষে আছে ? কত লোক চিনেছে—দেবনারায়ণ, পূর্ণবিকাশ, রায়বাহাদুর, হরেন্দ্রলাল, রমেন।"

"আর কেউ না ?"

"আর কারুর সন্ধান করিনি।"

"তাহলে বাহবা দিতে হয়। কিন্তু, কওটা কি জেনেছেন ?

"বাদ কিছু নেই।"

"কি করতে চান এরপর ?"

"আমার ফটো, সব কখানা নেগেটিভ, আর, ফাউ কিছু পেলে সমস্ত ভুলে যেতে রাজি আছি।"

"ফাউটা কিরকম ?"

"জগদীশনাথের কাছ থেকে যা হাতিয়েছেন, তার ভাগ।"

"বসুন।"

প্রভু কিশোর ঠাকুরকে বসিয়ে রেখে মেনকা মা উঠে আলমারি খুললেন। প্রভু আড়চোখে দেখছিলেন। বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে আলমারির ভেতর নাড়াচাড়া ক'রে মেনকা মা নিয়ে এলেন মোটা খাম একখানা। তার সঙ্গে কাগজের আধখোলা মোড়কে তিনটে আংটি।

প্রভুর কোলের ওপর সেগুলো ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,

"নিয়ে যান।"

"তা হলে চুক্তি রইল, আপনি আমার ক্ষতি করবেন না, অ আপনার কোনও লোকসান-বদনামের চেষ্টায় থাকবো না।'

প্রভুর প্রস্তাবে হেসে উঠলেন মেনকা মা—

"চুক্তি? চুক্তির কোনও দাম নেই, দরকারও নেই। আ যথেষ্ট হাঁপিয়ে উঠেছি। আশ্রমের একঘেয়েমি আমার মোটেই ভা লাগছে না। তাছাড়া, আপনার মত লোকের সঙ্গে চুক্তি? আপনা আমি একবিন্দুও বিশ্বাস করিনা। ফটো-টটো ফেলে দিলাম জ্বালাতন এড়াবার জন্যে। মনে করবেন না, আমি আতঙ্কে হার মানছি।' ধীরা মুখার্জি ভয়-ডরের সম্পর্ক রাখতো না, মেনকা মা-ও তাই।"

"না, না। অতটা মনে করবো কেন?"

"বেশ, তাহলে আপনি এখন বিদেয় নিন।"

ঘোমটা টেনে প্রভু সিঁড়ি ধরলেন, সদর পেরুলেন। উঠি-উ ক'রেও তাঁকে যেতে দেখে বীরু চেয়ার ছাড়তে পারলো না। (জানে, সঙ্গে সঙ্গে পরেশ মেনকা মার কাছে লাগাবে হয়তো।

মনের আফশোষ মনে রেখে সে চেয়ারের ওপর পা মুড়ে বসলে ওটা তার আরামী কায়দা।

কিন্তু, আরাম করা হল না। খবর এল সঙ্গে সঙ্গে। মেনকা মা তলব করেছেন।

ঘরে ঢুকতেই আদেশ,

"দরজাটা বন্ধ কর।"

বীরু দরজায় ছিটকিনি আঁটলো। বুক কাঁপছিল তার। বুঝলো, কপালে বড় রকমের কিছু আছে। কে জানে। রায়বাড়ির ছো বৌ নিশ্চয় কান ভাঙিয়েছে। বাবা, ঘোমটার ভেতর এত প্যাঁ বীরু তৈরী হয় মনে মনে, কি জবাবদিহি করবে।

"শোন বীরেন মাষ্টার।"

এই মরেছে। এই ভাবে তো তাকে কখনও ডাকেনি। শঙ্কায় ীরুর সব গুলিয়ে যায়, গলা শুকিয়ে আসে।

"তোমাকে এখানে খাইয়ে পরিয়ে জামাই-আদরে রেখেছি। মার বিশ্বাসঘাতক! তার চমৎকার প্রতিদান দিয়েছো।"

বীরুর গলা দিয়ে ঘড়ঘ'ড়ে আওয়াজ বেরুলো একটা। তার চাখে চোখ রেখে মেনকা মা বললেন,

"ধানাই পানাই শুনতে চাই না। তুমি কিশোর ঠাকুরকে নিয়ে দবনারায়ণ, পূর্ণবিকাশ, রমেন টমেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে ়িয়েছো।"

"আমি? কিশোর ঠাকুর? দেবনারায়ণ?"

বীরুর কথা আটকিয়ে গেল। একেবারে হাঁউ-মাউ ক'রে াদতে কাঁদতে দু-হাতে মুখ ঢেকে সে ব'সে পড়লো মেঝের ওপর।

"ওসব ঢঙ রাখো।"

"আমি নাক-খত্তা দিচ্ছি ধীরা। সত্যি কথা বলছি। আমি কছু জানি না এ সবের।"

"তুমি জান না! সব তোমার কাজ।"

বীরু মেঝের ওপর নাক ঘসতে ঘসতে এসে থামলো মেনকা মার া বরাবর।

"ঢের হয়েছে, ওঠো।"

বীরু হাঁটু গেড়ে বসলো।

"তোমাকে আমি যথেষ্ট বিশ্বাস করতাম।"

বীরু দাঁড়ালো। তারপর মাথা নিচু ক'রে গিয়ে দরজায় হাত াগালো।

"যাচ্ছো কোথা?"

পেছন ফিরে বীরু অস্পষ্ট জবাব দিল—

"আশ্রম ছেড়ে এখনই বেরুবো।"

"কোন চুলোয়?"

"রাস্তায়।"

"পেটের জ্বালায় মরবে। বিদেয় নেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু, বীরেনকুমার! তোমাকে আমি এতদিন আপনার জন বলে মনে করেছি। এখন দেখছি, আমার মত লোকও মানুষ চিনতে ভুল করে।"

"ধীরা, তুমি থাকতে হুকুম দিলে থাকবো, তাড়িয়ে দিলে যাব। তবু জেনে রাখ, আমি এ পর্যন্ত তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। অন্য জায়গায় গিয়ে যদি না-খেয়ে মরি, তবু তোমার কোনও ক্ষতি করবো না।"

"যাও।"

মেনকা মার পদ্ধতি-প্রকৃতির সঙ্গে বীরুর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এতবড় ঘটনার পর সংক্ষিপ্ত "যাও" শুনে সে বুঝলো এবারকার মত ভাঙা কপাল জোড়া লেগেছে।